নজরুল-চরিতমানস

NAZRUL-CHARIT MANAS

Dr. Sushil Kumar Gupta, M. Sc., M. A., D. Phil.

Price : Rupees Ten only

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, এম. এসসি., এম. এ., ডি. ফিল.

পরিবেশক

ভারতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬৭

প্রকাশক
আবদুল হক খাঁ
নবযুগ প্রকাশনী
২১ বি, নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-১৭

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

পাকিস্তানের পরিবেশক
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা-বাজার, ঢাকা

দাম : দশ টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অশোক গুহ

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

সুশীলকুমার গুপ্তর অন্যান্য বই

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ

রৌদ্র জ্যোৎস্না (কাব্যগ্রন্থ)

আলোর আকাশ (কাব্যগ্রন্থ)

ভূমিকা

নজরুল ইস্‌লামের জীবন যেমন বিচিত্র, তাঁর প্রতিভাও তেমনি বহুমুখী। আধুনিক বাংলা কাব্য ও সংগীতের ইতিহাসে নজরুল নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ অধ্যায়ের যোজনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সবচেয়ে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ তাঁরই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীতে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে নজরুল সর্বপ্রধান কবি। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে অতি-আধুনিক বাংলা কাব্যকে রবীন্দ্রকাব্য থেকে স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব গতিপথ খুঁজে নিতে সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। এই যুগে পরাধীন, সমস্যাপীড়িত ও দ্বন্দ্বজর্জরিত বাংলা দেশের স্বাধীনতাস্পৃহা, বিদ্রোহ, নৈরাশ্য ইত্যাদি নানাবিধ ভাবতরঙ্গ সবচেয়ে সার্থক-ভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর কাব্যে। নজরুল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণকবি। শুধু তাই নয়। বর্তমান যুগে গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও তিনি একটি অতিমহৎ আসনের অধিকারী। এ ক্ষেত্রেও জনপ্রিয়তার বিচারে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। এ ছাড়াও নজরুল-প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে, বিদেশী কাব্যের অনুবাদে ও সাংবাদিকতায়। এমন কি গায়ক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও অভিনেতারূপে তাঁর পরিচিতি অনেকেরই অজানা নয়। বর্তমানযুগে এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক ও সংগীতকর্মীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি।

নজরুল ইস্‌লাম এখনো জীবিত থাকলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই এদেশে অগস্ট বিপ্লবের সময় (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) এক দুরারোগ্য রোগে তাঁর লেখনী চিরতরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে অগস্ট আন্দোলনের আরম্ভ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই নজরুল-প্রতিভার যা কিছু বিশেষ সৃষ্টি। এই যুগে বাংলা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম ও সেই সঙ্গে তার সাহিত্য, সংগীত, শিল্প ইত্যাদি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথ অতিক্রম করেছে। সেই দিক দিয়ে বাংলার তদানীন্তন সংস্কৃতি-জীবনের সঙ্গে নজরুল কি পরিমাণে জড়িত ছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁর অবদান কতখানি—এ জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজবার কাল যে উপস্থিত হয়েছে এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে বোধ হয় না। নজরুলের জীবন ও সেই সঙ্গে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র পরিচয় এবং সর্বশেষে তাঁর সৃষ্টির উৎকর্ষবিচারের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের রচনা।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সংগীতের বিষয়ে তত্ত্বমূলক ও তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনায় বর্তমানে কেউ কেউ অগ্রসর হয়েছেন—এ অতি আনন্দ ও আশার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে পরিমাণে একদেশদর্শী ও ভাবপ্রবণ সেই পরিমাণে তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নজরুল-সাহিত্যের পঠনপাঠন খুবই হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহের স্রোতেও যেন ভাঁটার টান পড়েছিল। গত দুই তিন বছরের মধ্যে এ অবস্থার প্রত্যাশিত শুভপরিবর্তন শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই নজরুল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীদের কতকগুলি তথ্যপূর্ণ রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর বিষয়ে একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এই সব গ্রন্থ থেকে বর্তমান গ্রন্থ 'নজরুল-চরিতমানস'-এর বিশেষ চরিত্রটি যে কোন নিষ্ঠাবান ও সহৃদয় পাঠকের চোখে পড়বে বলে আশা করি।

যে কোন স্রষ্টার যুগ ও জীবন তাঁর সৃষ্টির পিছনে সর্বদা ক্রিয়াশীল। তাই প্রথমে নজরুলের যুগ ও জীবনের পরিচয় দেবার পর তাঁর সৃষ্টির ব্যাখ্যা ও সর্বশেষে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন প্রতিভার উৎকর্ষবিচারের ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালের গণ্ডি অতিক্রম করে পূর্বসূরীদের কাছে তার ঋণ ও উত্তরসূরীদের উপর তার প্রভাবের পরীক্ষা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই কারণেই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে 'নজরুলের উত্তরাধিকার', 'বাংলার সংস্কৃতিজীবনে নজরুলের অবদান' ও 'নজরুলের উত্তরসাধক' এই তিনটি অধ্যায় গ্রথিত।

নজরুলের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনাটিকে যথাসাধ্য জীবন্ত করে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট স্বর ও সুরটিকে পাঠকের মনে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণভাবে পঠনপাঠনের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধির মানসে দেশীবিদেশী সাহিত্য ও সংগীত, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য ও সংগীত থেকে নজরুলের সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে তুলনীয় সমভাবব্যঞ্জক যে সব উদ্ধৃতি চয়ন করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে এই সব উদ্ধৃতির রচনাকারদের দ্বারা নজরুল প্রভাবিত। ইংরেজী সাহিত্যের কোন বিশেষ প্রভাব নজরুলের উপর পড়ে নি, কেননা এই সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়ের কোন প্রমাণ নেই। এই সব উদ্ধৃতি প্রধানত ভাবের সমধর্মিতাকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই সংকলিত। প্রভাবের কথা যেখানে, সেখানে যথাবিধি তার উল্লেখ করা হয়েছে।

নজরুলের জীবন ও প্রতিভার আলোচনা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্য ও সংগীত সম্পর্কে ইতিহাস-রচনার এক অপরিহার্য অঙ্গ। কেউ কেউ একথা হৃদয়ঙ্গম করে যে এই আলোচনায় এগিয়েএসেছেন তাতে বিদগ্ধ সমাজের মনে যথেষ্ট আশ্বাস ও আশার সঞ্চার হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আলোচনার কাজ ইতোমধ্যেই বিশেষ দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নজরুলের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ পাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তৎসম্পাদিত 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু' এবং তৎপরিচালিত 'লাঙল' পত্রিকার বহু কপিই পাওয়া যায় না। নজরুলের কয়েকটি গ্রন্থে কোন প্রকাশকাল লেখা নেই। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য থেকে প্রকাশকাল নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন স্থলে পুরো তথ্য হস্তগত না হওয়ায় কিছু কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিগুলির বানান, বিরামচিহ্ন ইত্যাদিকে যথাসম্ভব মূলানুসারী করা হয়েছে। নজরুলের অধিকাংশ কাব্য বা সংগীত গ্রন্থের প্রতিসংস্করণে কবিতা বা সংগীতসংকলনের বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত অদলবদল তাঁর কাব্য বা সংগীত গ্রন্থের প্রকৃত চরিত্র বোঝবার পক্ষে এক বিরক্তিকর বিঘ্ন। এই গ্রন্থে যথাসম্ভব নজরুলের গ্রন্থসমূহের প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়। এক গ্রন্থ থেকে অপর গ্রন্থে গৃহীত হবার সময় কোন কোন কবিতা বা গানেরও নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে এই সব কবিতা বা গানের প্রথম প্রকাশের রূপ যথাসাধ্য বজায় রাখা হয়েছে।

নজরুলের কতকগুলি গ্রন্থ দেখার সুযোগ দেবার জন্যে আমি মুসলিম ইনস্টিটিউট, দিলখোশ লাইব্রেরী, বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, নজরুল-পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে আমার পরমভক্তিভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, এম. এ., ডি. লিট. (লণ্ডন), ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত. এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ.ডি., ডক্টর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি., শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য, এম.এ., ডক্টর শ্রীযুক্ত সাধনকুমার ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল., শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য, এম. এ. প্রভৃতির কাছ থেকে আমি নানাভাবে প্রেরণা, সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থের সূত্রেও আমি এঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থের নামকরণ করে দেবার জন্যে শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত অমল দত্তর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত অশোক গুহর উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে আমি এই গ্রন্থরচনায় বর্তমানে কিছুতেই হাত দিতাম না। এই গ্রন্থের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে নানা আলাপআলোচনা করে আমি বিশেষ লাভবান হয়েছি। নজরুলের বিশেষ বন্ধু জনাব আয়নুল হক খাঁ সাগ্রহে ও সোৎসাহে এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার নেওয়াতে আমি তাঁর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছ থেকে আমি নজরুল সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি। বস্তুত তাঁর বিলক্ষণ উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতা না পেলেও 'নজরুল-চরিতমানস' এখন এভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হত না। গ্রন্থটি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অবিনাশ সাহার নানাবিধ সহৃদয় ও অন্তরঙ্গ পরামর্শে ও সাহায্যে আমার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। তাঁকেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

নজরুলের অন্যতম প্রধান বন্ধু জনাব আফজাল্‌-উল হক্‌ প্রচুর উৎসাহ সহকারে এই গ্রন্থের অনেক অংশ, বিশেষ করে 'নজরুল-জীবন' অধ্যায় পাঠ করে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নানা তথ্য যাচাই করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

শ্রীশক্তিপ্রসাদ নিয়োগী, শ্রীপীযূষ চৌধুরী, শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীপ্রশান্তকুমার রায়, শ্রীধনঞ্জয় দাশ প্রভৃতি বন্ধুরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য দান করেছেন। বিশেষ করে শ্রীধনঞ্জয় দাশের সঙ্গে নজরুল সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা এই গ্রন্থ-পরিকল্পনায় আমার কাজে লেগেছে। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীযুক্ত মাখনলাল চৌধুরী নজরুলের কুমিল্লা-জীবনের বিষয়ে কয়েকটি তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের স্বীকৃতি রইল।

প্রুফ-সংশোধন ইত্যাদি মুদ্রণের নানা ব্যাপারে শ্রীতুলসী দাসের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সাহায্যকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

নির্ঘণ্ট-প্রণয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে শ্রীমতী মীরা গুপ্ত, শ্রীমতী সুনন্দা গুপ্ত ও শ্রীমতী সুজাতা গুপ্তর কাছ থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ সাল
(৩০শে মে, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ)
কলকাতা

সুশীলকুমার গুপ্ত

সূচীপত্র

নজরুল-চরিতমানস

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

নজরুল-যুগ

॥ ১ ॥

বিংশ শতাব্দী সঙ্কটের কাল। তার প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতবর্ষে নানা সমস্যা ও সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এই সমস্যাগুলি বহুল পরিমাণে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি—বিশেষ করে ইউরোপের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবিত। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে দীর্ঘ যোগাযোগের কথা ছেড়ে দিলেও বিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতির ফলে এদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নানা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রে তখন আবদ্ধ। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে সভ্যতার যে সমস্যা ও সঙ্কট মূর্ত হয়ে ওঠে তার মৃত্যু-করাল ছায়া মানুষের অন্তর্জীবনেও পরিস্ফুট হয়েছিল। বিশ্ব-ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় যে, এই সমস্যা ও সঙ্কটের অশুভ অঙ্কুর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শিল্প-বিপ্লবের মহালগ্নেই।

ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। এই বিপ্লবের ধারা ক্রমে ইংলণ্ডের সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার রূপ অনেকখানি বদলে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ উপনিবেশ বাংলা তথা ভারতবর্ষের তটেও এই বিপ্লব-তরঙ্গ এসে পৌছোয়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পেয়ে এই সময় থেকেই মানুষ সর্বশক্তিমান হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আর সেই স্বপ্নকে রূপায়িত করে তোলেন জার্মানীর মহামনীষী গ্যেটে। তাঁর ফাউস্ট শক্তিমুগ্ধ ফলিতবিজ্ঞানের মুনাফায় স্ফীত ধনবাদের কাছে আত্মবিক্রয় করে দিতে নারাজ—ব্যক্তি-সর্বস্ব সে হয়ে উঠতে চায় না—সে চায় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সামাজিক সত্তায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিলোপ-সাধন। কিন্তু ফাউস্টের সে মহাবাণী সেদিন ছাপিয়ে উঠল ধনবাদের জয়জয়কার। তবুও একেবারে লুপ্ত হল না সে-বাণী—ধনিক সমাজের শ্রমিক শোষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারিত হতে

লাগল আর প্রোলেটারিয়েট শ্রেণীও জন্মলাভ করলে। বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের সূচনাও দেখা গেল। আবার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পাশাপাশি ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত আধুনিক জাতীয়তাবাদেরও প্রসার ঘটল। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষেও বিদেশী শিল্প-বাণিজ্য এবং শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে ইউরোপীয় ভাবধারার নববন্যা বয়ে গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণকর মূর্তিটাই মানুষের কাছে বেশী করে প্রতিভাত হত। কিন্তু মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের মারণকৌশল দেখে মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠল। শৌর্যবীর্যের লীলাক্ষেত্র ও শুভকর পরিবর্তনের কারক বলে যে যুদ্ধকে প্রথমে কীর্তিত করা হয়েছিল তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখে মানবসমাজ তখন আতঙ্কগ্রস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আকাঙ্ক্ষিত নবজীবনের কোন ইঙ্গিতই দেখা গেল না। কোটি কোটি প্রাণের মূল্যে যা কেনা হল তার অকিঞ্চিৎকরতা ও অসারতায় মানুষ প্রমাদ গুনলে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, মহামারী, নৈতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি নানা অভিশাপ। মহাযুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হল তার দুরবস্থা তো বর্ণনার বাইরে। কিন্তু যে দল জয়লাভ করলে তার ভাগ্যেও উল্লেখযোগ্য কিছু মিলল না। দেশে দেশে শ্রমিক-বিক্ষোভের অগ্নি ধূমায়িত হতে লাগল। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে শ্রমিক আন্দোলনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হল। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমশক্তির আত্মচেতনা-মুখরিত জয়ধ্বনি শোনা গেল। ইংলণ্ডের মত দেশেও সাধারণ ধর্মঘটের ঘণ্টা বাজল।

গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করবার জন্যে এবং ধনিক সভ্যতার স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উগ্র-জাতীয়তাবাদের নিশান হাতে জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশে ডিক্টেটরদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। তাদের ঘৃণ্য, কঠোর ও নির্মম শাসনদণ্ডের তাড়নায় গণতন্ত্রের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের সীমা রইল না। যুদ্ধের ফলে এমন কিছু পাওয়া গেল না যা কিনা মানবসমাজ দৃঢ়প্রত্যয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে। শ্রেণীর গণ্ডী ভেঙে পড়তে লাগল, পরিবারের ভিত্তি টলে উঠল, সমাজের কাঠামো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। জীবিকার প্রশ্নই জীবনের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল।

জীবনের বাইরেই শুধু ফাটল ধরল না, তার ভিতরেও ভাঙনের স্রোত প্রবেশ করলে। দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের নীতিবোধ ক্রমেই অসাড় হয়ে পড়তে

লাগল। নানা মানসিক ব্যাধি শারীরিক রোগের মত বেড়েই চলল। এইসব মানসিক ব্যাধির উৎস খুঁজতে গিয়ে ফ্রয়েড চেতনলোকের নীচে এক *অচেতন-লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। অবদমিত যৌনপ্রবৃত্তি সমাজ ও জীবনে যেসব বিসর্পিল পথে আত্মপ্রকাশ করে তাদের বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটিত* হল। ফ্রয়েড, য়ুঙ্গ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় মনোবিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তর দেখা দিলে। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহৃত হতে লাগল। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং নৈতিক পীড়নে যে সব বিষয় নিষিদ্ধ বলে অস্পৃশ্য ছিল, সাহিত্য ও শিল্পের দুঃসাহসী কর্মীরা তাদের জাতে তুলতে আরম্ভ করলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বোঝা গেল যে, পৃথিবীতে প্রাণের মূল্য কমে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে জীবনের চেয়ে মৃত্যুর আয়োজনই বড় হয়ে উঠেছে। এই সময় মানবিকতা লাঞ্ছিত হতে লাগল। সভ্যতার দোহাই পেড়ে বর্বরতার চূড়ান্ত অভিনয় চলতে থাকল। মানবিকতা নয়, অমানবিকতাই তখন ধর্ম, তারই আওতায় সাহিত্য সংগীত শিল্প প্রভৃতি তাদের ঐতিহ্য-বিচ্যুত চোরাগলির মধ্যে অসহায় অবস্থায় ঘুরপাক খেতে লাগল। সংশয়, অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতার রাহু গ্রাস করলে যুগমানসকে। চিরন্তনতার চেয়ে বড় হয়ে উঠল সাময়িকতা। উন্নাসিকতা ও নৈরাশ্যের অতলে ডুবে গেল সত্যকার জীবন-জিজ্ঞাসা। একদিকে দেখা গেল নৈরাশ্যের মহাশূন্যতা—জীবন অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেল—ফাঁকা, ফাঁপা মানুষে ভরে উঠল পৃথিবী—অন্যদিকে এক নূতন মূল্যমান মিলে গেল জীবনের। সে-মূল্যমান বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহাসম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সঙ্কটে আকীর্ণ পৃথিবী সৃষ্টি করলেও সঙ্কট-হরণের বীজ উপ্ত করে দিয়ে গেল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের নব-বন্যার প্লাবনে ভেসে গিয়েছিল; আবার তার সমস্যা ও সঙ্কটেরও সে ভাগীদার হল। পৃথিবীব্যাপী সমস্যা ও সঙ্কট স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করলে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হতে লাগল। এইসব পরিবর্তন তার সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুললে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হল। তারই সঙ্গে সঙ্গে বহে এল বৈপ্লবিক ভাবধারা, মৃতসমুদ্রে দেখা দিলে দুকূলপ্লাবী জোয়ার। ধর্মে নবসংস্কারকের দল আবির্ভূত হল। ধর্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-

সংস্কারও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ল। আবার ফরাসী বিপ্লবের মহান উদ্দীপনাও এদেশের মাটিতে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত করে দিলে। জাতির স্বাধীনতার কামনা নানা-'সভা'য় রূপ পরিগ্রহ করলে। তারপরে একদিন ভারতের জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেসের জন্ম হল। তার প্রথম অধিবেশন বসল বোম্বাই শহরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ আবেদন-নিবেদন রূপে সরকারের কাছে পেশ করে প্রতিকারের প্রচেষ্টা। ভারতীয় কয়েকজন মুসলমান নেতা এ সভায় যোগ দিলেও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে পাওয়া গেল না। সদ্য রাজ-ক্ষমতা-বিচ্যুত সম্প্রদায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়েছিল বলেই নব জাতীয়তাবোধের বোধনে যোগ দিতে ছুটে এল না। সার্ সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় হিন্দুদের অংশীদার করবার জন্যে ব্রতী হলেন, কিন্তু রাজনীতির পথে চলা নিষিদ্ধ করে দিলেন। জাতীয় মহাসভার জন্মের এগার বৎসর পরে যেদিন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগের জন্ম হল, সেদিনও নব জাতীয়তাবোধের বদলে ধর্মের বন্ধন দৃঢ় করবার নীতিই বলবৎ রইল। কিন্তু তার প্রথম অধিবেশনেও হাসান ইমাম এবং মাজারুল হক্-এর ন্যায় জাতীয়তাবাদী নেতাদের দেখা গেল। পরে শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীগ রাজনীতিক ক্ষেত্রে এসেও উদিত হল। স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগের মঞ্চ থেকে শোনা গেল। তারপরে ব্রিটেন ও তুরস্কের যুদ্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব মুসলিমদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠল এবং কংগ্রেসে লীগে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের মাধ্যমে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হল।

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পালার ভিতরেও বিরোধের রূপ প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছিল। এই বিরোধ কংগ্রেসে একদল চরমপন্থীকে কেন্দ্র করেই বেড়ে উঠতে লাগল। এদের নেতা হলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক ও বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। এই লাল-বাল-পালের মিলনে চরমপন্থীদল সংঘবদ্ধ হল, আবার আবেদন-নিবেদনের নীতি আঁকড়ে রইল প্রাচীন দল, নরমপন্থী বলেই তারা আখ্যা পেল।

এরই মধ্যে বিশ্বের ইতিহাসে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। পাশ্চাত্ত্যের প্রচণ্ড শক্তি জার-শাসিত রাশিয়া এশিয়ার ক্ষুদ্র শক্তি জাপানের কাছে পরাজিত হল। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের এই অভাবনীয় পরাজয় চরমপন্থীদের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর চরম আঘাত

হানবার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে সন্ত্রাসবাদীদের ভিতরে। কিন্তু তখনও তা সুস্পষ্ট আকার নিতে পারে নি। তাই আকার পেল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। কংগ্রেসের চরমপন্থীরা বালগঙ্গাধর তিলকের ব্যবহৃত 'স্বরাজ' কথাটির প্রতিধ্বনি তুললে, স্বরাজ ভারতের জন্মগত অধিকার এই দাবি জানান হল। স্বরাজ, স্বদেশী এবং বয়কট বা বর্জন হল তাদের কর্মসূচী। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতি ভয়ংকর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলে এবং তারই ফলে বহু চরমপন্থী যুবক সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ধাবিত হল। অবশেষে ক্রম-বর্ধমান গণ-আন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ রদ হল, কার্জনী শাসনে যা ছিল ধ্রুব, তাই-ই অধ্রুবতে পর্যবসিত হল।

তারপরে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহাঝড়। সে-ঝড় দূরে থাকলেও তার দক্ষিণা ভারতকে দিতে হল। ভারতের ছিল স্বাধীনতা লাভের আশা, সে ভেবেছিল যুদ্ধশেষে তার পরমপ্রাপ্তি ঘটবে। তারই সাহায্যে, তার মানুষ আর সম্পদের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটল বটে, কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের ভাগ্যে মিলল এক সংস্কার আইন। এই সংস্কার আইন গণসমর্থন লাভ করলে না, কংগ্রেসও একে বাতিল করে দিলে। মহাত্মা গান্ধী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন দেশবাসীকে। সরকারী খেতাব, চাকুরি, আইন-আদালত আর গোলাম তৈরির কারখানা স্কুলগুলি বর্জনের কর্মপন্থা অনুসৃত হতে লাগল। স্বরাজ প্রাপ্তি হল কংগ্রেসের লক্ষ্য। এক ইংরেজ লেখকের কথায়, 'গান্ধীজী এইভাবে জাতীয় আন্দোলনকে বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের রূপ দান করলেন। ব্রিটিশ শাসক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কুখ্যাত রাউলট আইনের ফলে দেশজোড়া চণ্ডনীতির তাণ্ডব শুরু হল। এই তাণ্ডবে জালিয়ানওয়ালাবাগে সহস্র সহস্র নিরস্ত্র নরনারী ও'ডায়ারী শাসনে জেনারেল ডায়ারের হাতে প্রাণ হারালে।

তারপর গান্ধীজীর আহ্বানে এক অভূতপূর্ব গণবিপ্লবের অভ্যুত্থান হল। হিন্দু-মুসলমান সে-আহ্বানে মিলিত হল, লীগে কংগ্রেসে বিরোধ রইল না। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ ধর্ম-আন্দোলন যুক্ত হয়ে দেশজোড়া মুক্তিসংগ্রামের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে দিলে। শ্রমিক আন্দোলনকেও জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তন হল।

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি একদিন (১৯২২) স্তব্ধ হয়ে গেল। মোহ-ভঙ্গের পালা চলল, এরই মধ্যে সাইমন কমিশন বর্জনে আবার তাদের সাময়িক মিলন সম্ভব হল।

আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেলেও কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হয়ে গেল না, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ চালাতে লাগল। একদা মুসলমান নেতা হসরৎ মোহানি যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন, সে-প্রস্তাব সেদিন কংগ্রেসের অনুমোদন না পেলেও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সে-প্রস্তাব কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গৃহীত হল। কলকাতা ও লাহোর অধিবেশনে পুনরায় প্রস্তাবটি সমর্থন লাভ করলে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ ভারতে আবার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী বহন করে নিয়ে এল। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য শুরু হয়ে গেল আইন-অমান্যের মুক্তি-সংগ্রাম। এই সংগ্রামকে কঠোর হস্তে দমনের প্রচেষ্টা করতে লাগল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সহস্র সহস্র দেশবাসী কারারুদ্ধ হল। কিন্তু নির্যাতন-নিপীড়নেও সাম্রাজ্যবাদ-শিবিরের ত্রাস ঢাকা পড়ল না। তাই আপোস-মীমাংসার চেষ্টাও চলল। গোল টেবিলের চক্রবাত্যা বয়ে গেল। কংগ্রেসহীন প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠক বসল, কিন্তু তৃতীয় বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করলে। ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হল, কিন্তু কংগ্রেস তা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলে না। এদিকে কংগ্রেসী আন্দোলনের আশাভঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করলে।

বিপ্লবী আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়েছিল পলাশীর বিপর্যয়ের একশত বৎসরের মধ্যেই। বিদেশী শাসকের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে দিকে দিকে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। এ-প্রচেষ্টায় হৃতরাজ্য রাজা, জমিদার থেকে ফকির এবং কৃষকশ্রেণী পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল। স্বার্থের সংগ্রামে, ধর্মের জেহাদে আরম্ভ হলেও শেষে বিদেশীর অধীনতাপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামেই তা পর্যবসিত হয়েছিল। এই মুক্তিসংগ্রামের শরিকরূপেই আমরা পেয়েছিলাম ওয়াহাবী-ফরূরাজীদের, নীল বিদ্রোহীদের। ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের কঠোর হস্তে দমন করলেও তাদের ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে যায় নি। সেই ঐতিহ্যের ধারায় স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশে আবার সন্ত্রাস-বাদের ব্যাপক প্রসার দেখা দিলে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শ এবং বিবেকানন্দের বাণী দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তুললে। যুগান্তর

এবং অনুশীলন দল রাজশক্তির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। তাদের প্রেরণা যোগালে আবেসিনিয়ার যুদ্ধ (১৮৯৬), জাপানের অভ্যুদয় ও তার কাছে রুশিয়ার পরাজয় (১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে), আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, রুশিয়ার নিহিলিজম (nihilism), কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের নবজাগরণ, চীনের বক্সার বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনাবলী।

সিডিশন কমিটির ভাষায় 'অশান্তি,' 'বিশৃঙ্খলা' হলেও ঐতিহাসিক পরিভাষায় বিপ্লবের পদধ্বনি দিকে দিকে শোনা গেল, শাসকের বিরুদ্ধে পিস্তল গর্জন করে উঠল, বোমা বিস্ফোরিত হল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের মহাসমরের দামামা বেজে উঠলে বিপ্লবীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। তারপর অহিংস অসহযোগের আহ্বানে তারাও এসে যোগ দিলে। বরদৌলিতে (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) আন্দোলন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদের পথে আবার ছুটে চলল। দেশব্যাপী সাড়া জাগল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এই অধ্যায়েরই এক স্মরণীয় ঘটনা। ত্রিশের কোঠার শেষ দিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল, বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগতে তাঁরা অনুভব করলেন যে সন্ত্রাসবাদে দেশের স্থায়ী কল্যাণ অর্জন কোনরূপেই সম্ভবপর নয়।

মুসলিম জনগণ এই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন নি বলে অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু একথা সত্য নয়। কিছু কিছু প্রগতিবাদী মুসলমান এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, আবার বহুসংখ্যক বাইরে থেকেও একে সাহায্য করেছিল এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে হিন্দু পুনরুত্থানের যে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ছিল, সেই সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করতে ত্রুটি করে নি। কিন্তু তবু কংগ্রেসে যেমন মুসলমান নেতারা ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। আবদুল্লা রসুলের নাম তো বিস্মৃত হবার নয়। ভ্যালেণ্টাইন চিরল-এর কথায় নবযুগের নব্যমুসলমানগণ নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের চরম পন্থাতেও হিন্দুদের ভাগীদার হতে তখন প্রস্তুত। এই বিপ্লবের উন্মুখতাই যে একদিন নরম পন্থার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে—এই সতর্কবাণীও তখন শোনা গিয়েছিল।

বিপ্লববাদ বা সন্ত্রাসবাদ যেমন একদিকে আলোড়ন এনে দিলে, তেমনি অন্যদিকে শ্রমিক শক্তির জাগরণ রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলে। এই শ্রমিকশক্তির অভ্যুদয় হয়েছিল বহুপূর্বে; বোম্বাইয়ের

লোখাণ্ডের 'দীনবন্ধু' ও বাংলার শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা তাতে শ্রমিকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ম কারখানায় কারখানায় নানা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এরই মধ্যে রুশ-বিপ্লবে শ্রমিকশক্তির বিজয়ে সাম্যবাদী নবভাববন্যা বহে এল, শ্রমিক-শক্তির সামগ্রিক সংহতির জন্ম প্রতিষ্ঠিত হল নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। সাম্রাজ্যবাদের ছোট তরফ মালিক-শোষকের বিরুদ্ধে শ্রমিকশক্তির সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল, বড় তরফও প্রমাদ গুনলে।

শ্রমিক শক্তির এই নব উদ্দীপনার তরঙ্গ রোধ করবার জন্যে প্রচেষ্টার অন্ত রইল না। এরই মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল (তার গঠনতন্ত্র রচিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে), তাকে বেআইনীও করে দেওয়া হল; কিন্তু শ্রমিকশক্তির এই উদ্দীপনা দাবির আকারে দেশব্যাপী ধর্মঘটে রূপ পেতে লাগল। রাজনীতিক্ষেত্রে এক নবদিগন্ত দেখা দিলে।

যুগের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস সমগ্রভাবে দেখলে মোটামুটি কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এদেশের মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষক সমাজ নিজেদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। প্রথম দিকে মহাযুদ্ধের আগে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার এবং যুদ্ধোত্তর কালে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রসারে জনসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির শাসন-কাঠামোর ভিতরে জনসমাজের অভাব অভিযোগ দূর করার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ। তার উপর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দারুণ ডিপ্রেশনের প্রভাবে এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ধর্মঘট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জনমতের বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ায় নৈতিক ও মানসিক জগতেও নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়। বহুকালের নিষিদ্ধ ও অবদমিত যৌনভাব ও ধারণা শিল্প সাহিত্য সংগীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্ভীকভাবে রূপায়িত হতে লাগল। ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রে একটা নৈতিক দোটানার ভাব দেখা দিলে। ভাববাদের সঙ্গে বাস্তববাদের এই দ্বন্দ্বে সাংস্কৃতিক জীবনে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হল। জীবন সম্পর্কে এক গভীর অতৃপ্তি ও হতাশার ছায়া সর্বত্র তখন পরিস্ফুট। পরিবার, শ্রেণী ও সমাজের অভ্যন্তরে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হতে লাগল। এদেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী ভাব ও চিন্তাধারার সংঘর্ষে জাতীয় জীবনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যে পটভূমি—এই পটভূমিতেই নজরুল ইস্‌লামের আবির্ভাব, তিনি লালিত-পালিত হন এরই পরিবেশে এবং তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ এবং বিকাশও এই যুগেই ঘটে। তাই এই যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে ও কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য-বিচারে যুগমানস তো অনস্বীকার্য মানদণ্ড। এই মানদণ্ডেই তাঁকে বিচার করতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে তাঁর রচনা।

এ দেশের তথা পৃথিবীর উপর্যুক্ত পটভূমিকায় নজরুল ইস্‌লামের আবির্ভাব ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের বিভিন্ন আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কতকগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্তও ছিলেন। তাঁকে একাধিকবার রাজ-রোষের কবলে পড়তে হয়েছিল। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগণ্য নেতৃবৃন্দ, যেমন লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি কবিতা গান প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। তবে দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে নজরুলের সক্রিয় সংযোগ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তিনি মুখ্যত কবি ও সংগীতকার। রোমাণ্টিক ভাবকল্পনা সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কবিমানসকে উদ্বুদ্ধ করত। তাই মুক্তিসংগ্রামের ভাবপ্রবণ আদর্শই তাঁকে আকর্ষণ করত বেশী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নজরুল এসেছিলেন দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। কংগ্রেস ছিল প্রধানত ধনিকশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট। গান্ধীজী শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কিছু পরিমাণে সফল হলেও কংগ্রেস তখনও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে নি। তাই জনসমাজের এক অংশ সন্ত্রাসবাদকে আশ্রয় করে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করতে অগ্রসর হয়। নজরুলের ভাবপ্রবণ কবিচিত্ত সহজেই এই সন্ত্রাসবাদকে বরণ করে নেয়। বিদেশী বিপ্লববাদী আন্দোলনের ইতিহাসও তাঁর কবিসত্তার মর্মমূলে ঢেউ সঞ্চার করে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে নজরুলের কবিমানসকে অন্তরঙ্গভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। গোপীনাথ সাহা, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন, যতীন দাস প্রভৃতি শহীদগণের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ তাঁর কবিকল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আন্দোলনের দ্বারাও নজরুল প্রভাবিত হন। সেটি ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বহুদিন দুজনে একত্রে বাস করেন, দুজনে একসঙ্গে সংবাদপত্র চালান। বহু সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কাজেও দুজনে যুক্ত হন একযোগে। নজরুলের প্রতিভা বিকাশের পথে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের অবদান কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

যুদ্ধোত্তর কালের নৈরাশ্য বেদনা ও অস্থিরতা নজরুলের সাহিত্য ও সংগীতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয় ও ভাঙনের ছবিও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়। কৃষক ও শ্রমিক সমাজের অভ্যুদয়ে নবযুগের যে পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল তার প্রতিধ্বনিও বেজে উঠেছে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতের মর্মস্থলে। নজরুল তাঁর কবিতা ও গানে কৃষক ও শ্রমিক জাগরণের আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; তিনি অগ্নিময়ী ভাষায় তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিবৃত করে নূতন যুগের ভাষ্য রচনা করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাংলাদেশের সমস্যা ও সঙ্কট অনেকখানি নজরুল-সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। জনসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা-নৈরাশ্যের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিলেন বলেই দেশ তাঁকে জাতীয় চারণ কবির মর্যাদা দিয়েছে। নজরুলের সাহিত্য ও সংগীতে জনজাগরণ অনন্যসাধারণ উদ্দীপনা ও উজ্জ্বলতায় কীর্তিত। এর কারণ দেশের কৃষক, মজুর ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তিনি নিজে যুদ্ধে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং যুদ্ধোত্তর বাংলার নানা সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে দেশের জনসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপও খুব কাছের থেকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতিতে তিনি নাতিদীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তাই যুদ্ধোত্তর বাংলার ভিতর ও বাইরের রূপ নজরুল-সৃষ্টির মধ্যে স্মরণীয়ভাবে প্রতিভাত হয়েছে। আর তা হয়েছে বলেই তাঁর সৃষ্টি আজ জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য। নজরুল যে সে-যুগের সবচেয়ে সক্রিয় প্রাণবন্ত ও যুগধর্মী কবি ও সংগীতকর্মী এবিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

॥ ২ ॥

নজরুল-প্রতিভা যে যুগের ভিতরে উদিত ও অস্তমিত হয় সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের স্বল্পকাল পরেই নজরুলের কবিকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সর্বগত প্রতিভার পাশাপাশি বিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৭৬-১৯৩৮) তখন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ শক্তিরূপে বিরাজমান। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন নজরুল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন যে কবিবৃন্দ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৪৩) এবং মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'অভ্রআবীর' (১৯১৫) প্রভৃতি পুস্তক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র (১৯২৩) কবিতাগুলি ১৯১০ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে রচিত হয়েছিল। মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী'র (১৯২১) কবিতাবলী লেখা হয়েছিল পূর্ববর্তী দশবছরের মধ্যেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০), স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮) প্রভৃতি কবিগণ রবীন্দ্র-রশ্মির প্রখর উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও বাংলা সংস্কৃতির গগনে দীপ্যমান ছিলেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে নজরুল-প্রতিভার কোন বিশেষ সাযুজ্য ছিল না। এমন কি শরৎ-প্রতিভার সঙ্গে নজরুল-প্রতিভার কোন অন্তরঙ্গতা নেই। রবীন্দ্র-প্রভাবের গভীরতা ও প্রখরতা বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নজরুল-মানসের ভাবধারা ও প্রকাশরীতির অন্তরঙ্গ সহৃদয়তা আবিষ্কার করা যায়। এঁদের মধ্যে মোহিতলালের সঙ্গেই নজরুলের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল।

রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের সূক্ষ্ম দার্শনিকতা ও অরূপের লীলারহস্য নয়, এর মানবিক প্রেম, প্রকৃতিপ্রণয় এবং বিশেষ করে বন্দেমন্ত্রের ঋষিরূপই নজরুল-প্রতিভাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ নিরোধ-আন্দোলনের সময় বঙ্গ-আত্মার জীবন্ত বাণীমূর্তি ধ'রে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসেছিলেন। এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গের দারুণ দুর্যোগের দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের ভিতর দিয়ে আত্মবিস্মৃত জাতিকে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন, 'মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে'র সন্ধান দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক অরবিন্দকে নমস্কার জানিয়েছেন এই মহান কবিপুরুষ। তিনি স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, আবার দেশের সামনে ধনঞ্জয় বৈরাগীর আদর্শ তুলে ধরেছেন। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীত বিদ্রোহপ্রবণ নজরুল-চিত্তকে প্রচুর পরিমাণে প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই।

বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের যুগে বাংলা সাহিত্যে ও গানে জাতীয়তার স্ফূর্তি হয়েছিল বিশেষ ভাবেই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) তাঁর নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর ঐতিহাসিক নাটক, গান ও কবিতায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) তাঁর ঐতিহাসিক নাটকাবলীতে জাতীয়তাবাদকে উজ্জ্বলভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রচার করেন। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের ভিতর দিয়ে জাতীয়তার মর্যাদা উপলব্ধিতে সহায়তা করেন 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস'-লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত এবং 'সিরাজদ্দৌলা'-লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষ (সম্পাদক, 'বন্দেমাতরম্') ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক, 'যুগান্তর') ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সম্পাদক, 'সন্ধ্যা') প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। গানে অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন ও যামিনীকুমার ভট্টাচার্য এবং যাত্রায় মুকুন্দ দাস স্মরণীয়। এই জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য নজরুল-প্রতিভার উপর সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই লক্ষণীয়ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম মহাসাম্যের গান গেয়েছেন, শ্রমিক-শক্তির বন্দনা করেছেন, ভারতবর্ষ ও বাংলার প্রাচীন প্রদীপ্ত ঐতিহ্যের কীর্তিগাথা শুনিয়েছেন। তিনিই প্রথম লিখেছিলেন শ্রমিক ধর্মঘটের উপর কবিতা। নজরুলের পূর্বসূরীদের মধ্যে

সত্যেন্দ্রনাথের কাছেই নজরুল বোধহয় সবচেয়ে বেশী ঋণী। 'প্রগতি' পত্রিকায় সম্পাদককে লেখা চিঠির একস্থলে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

"কাজী নজরুলের অনুকরণ কোরতে গিয়ে অনেকে নিজের শক্তিকে অপমান করেন, যেমন কাজী সত্যেন দত্তকে আদর্শ কোরতে গিয়ে নিজেকেও অবমাননা করেছেন, আদর্শকেও করেছেন।"[১]

ধূর্জটিপ্রসাদের এই উক্তি সর্বতোভাবে গ্রহণীয় না হলেও এ কথা ঠিক যে, ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রথমযুগে নজরুল অনেকক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছিলেন। এই অনুসরণ যে সর্বক্ষেত্রে অসার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। প্রগতিমূলক চিন্তাধারা সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অনেক কবিতায় প্রথম নিয়ে এলেও সেই চিন্তাধারার উৎস যতটা ভাবকল্পনায় ততটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল না। নজরুলের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যচিন্তা ও বক্তব্যকে সত্যেন্দ্রনাথের চাইতে অনেকক্ষেত্রে বহুগুণে তীব্র ও গভীর করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, অনেক কবিকেই কাব্যরচনার প্রাথমিক যুগে তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক সহৃদয়ভাবাপন্ন কোন শক্তিশালী কবির রচনাকে মডেল করে অগ্রসর হতে হয়, যত দিন না কবি নিজস্ব বাণীভঙ্গি খুঁজে পান। আধুনিককালে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থে প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ও মোহিতলালকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সৃষ্টির পিছনে 'ঝরা পালকে'র যুগের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার কি কোন মূল্যই নেই?

একথা ঠিক যে, সত্যেন্দ্রনাথের যদি কেউ সার্থক উত্তরাধিকারী থেকে থাকেন, তবে সর্বদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি কাজী নজরুল। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের উপরও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যেন্দ্র-নাথের চারণ-কবির ভূমিকাটি একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করতে পারেন নি। সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্রোহের সুরকে নজরুলই জাতির মর্মমূলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের বাস্তবতা নজরুল-সাহিত্যে আরও প্রখর ও দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরশমাণর স্পর্শে। বাংলা ভাষায় ঘরোয়া শব্দের প্রচলন করে ও আরবী-ফারসী শব্দকে প্রবেশাধিকার দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর যে উত্তরসূরীদের অজস্র ঋণজালে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে নজরুল ইস্‌লাম অন্যতম।

---

১ প্রগতি (সম্পাদক অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু): পৌষ ১৩৩৪

যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের কবিধর্মের ঐক্য কোন কোন ক্ষেত্রে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। অবশ্য এস্থলে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই কবিধর্মের প্রাথমিক দীক্ষা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে ভাব ও ভঙ্গিতে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের একাত্মতা অনুভব করা যায়, যদিও নজরুল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও আবেগে অধিকতর দীপ্ত ও স্বাভাবিক। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন,

"সত্যেন্দ্রনাথ এমনই করিয়া যে ছন্দে সাম্যের গান গাহিলেন, যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দে একহাতে শোষণ ও অন্যহাতে তোষণের ভণ্ডামিকে বিদ্রূপের শরবর্ষণে নির্মম আঘাত করিলেন, কিছুপরে কাজী নজরুল ইস্‌লাম সেই একই সুরে একই ছন্দে সাম্যের গান গাহিয়াছেন।"[১]

কিন্তু যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাবপরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, নজরুল তাকে বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বমুখর ক্ষেত্রে মুক্তি দিলেন। এর প্রধান কারণ এই যে, যতীন্দ্রনাথের চাইতে নজরুল দেশের মুক্তিসংগ্রাম ও প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(প্রেমধারণার ক্ষেত্রে মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের নৈকট্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।/ মোহিতলালের মানবিক প্রেম আধ্যাত্মিকতার আবরণ ত্যাগ করে দেহাত্মবাদের মহিমা কীর্তন করেছে। নজরুলের মানবিক প্রেম অনেকস্থলে স্বভাবসুন্দর দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। মোহিতলালের গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহ ও মানুষের সহজ বিশ্বাসের প্রতি অনাস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের কাব্যে তরঙ্গ তুলেছে। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের মত নজরুলও রুদ্রদেবতা মহাদেবকে বিদ্রোহের নায়ক বলে বন্দনা করেছেন।

আগেই বলেছি—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই নজরুলকে অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে আলাদা করে এক বিশেষ গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে নজরুল জীবনে এমন কয়েকজন লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁদের অনেকে শুধুমাত্র সাহিত্যিকই ছিলেন না, বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের আপোসহীন যোদ্ধা হিসেবেও তাঁরা সুপরিচিত। আবার কেউ বা স্বাধীনতাযুদ্ধের সৈনিক হয়েও দুর্লভ সাহিত্যপ্রীতির অধিকারী ছিলেন।

১ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রথম পর্যায় : কলিকাতা ১৯৫৫ : পৃ ২৪০

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নজরুলের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। তাঁদের প্রথম লেখার ইতিহাস সম্পর্কে শৈলজানন্দ লিখেছেন,

"গ্রামে ছিল মাইনর স্কুল। সেখানকার পড়া সাঙ্গ করে' রাণীগঞ্জ শহরে গিয়ে এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

গল্প লেখার কথা তখনও ভাবি নি।

শুধু একটি কবিতা লিখেছিলাম মনে পড়ে। একদিন কড়িকাঠের ফোকর থেকে একটি চড়ুই পাখির বাচ্চা পড়ে গিয়েছিল নীচে। পাখিটি তখনও উড়তে শেখে নি। অসহায়ের মত তাকাচ্ছিল ওপরের দিকে আর চিঁচিঁ করে ডাকছিল তার মাকে।

মা-পাখিটার সে কি ব্যাকুলতা! ঠোঁট দিয়ে তাকে তুলেও নিয়ে যেতে পারে না, অথচ বাচ্চাটা কাঁদছে পড়ে পড়ে।

মই আনিয়ে বাচ্চাটিকে তুলে দিয়েছিলাম তার মায়ের কাছে। তুলে দিয়ে সেদিনই রাত্রে একটি কবিতা লিখেছিলাম।

আর নজরুল লিখেছিল একটি কথিকা। সেই আমাদের প্রথম লেখা।

কিন্তু কিছুতেই আমরা ঠিক করতে পারলাম না—কার লেখাটা ভাল। নজরুল বলে, আমারটা ভাল। আমি বলি নজরুলেরটা।

আর-কাউকে দেখাতেও পারি না। লজ্জা করে। ব্যাপারটা অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

কিন্তু লেখার একটা নেশা আছে। সুযোগ সুবিধা পেলেই কবিতা লিখি। আর নজরুল লেখে গল্প, লেখে কথিকা।

আমারও মাঝে মাঝে গল্প লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সময় পাই না। দিদিমার মুখে শোনা মহাভারত আর রামায়ণের গল্প আমার মনের ওপর জেঁকে বসে আছে। লিখতে হলে ওইরকম গল্পই লিখতে হয়। গল্প যে ছোট হতে পারে, ছোট গল্প যে লেখা চলে—সে ধারণাও তখন আমার নেই। নজরুলের গল্পগুলো গল্প বলে মনে হয় না। ওকে বলি, তুমি কবিতা লেখো। নজরুল কিছুতেই লেখে না।"[১]

প্রথম রচনার এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, শৈলজানন্দ ও নজরুল পরস্পরকে সাহিত্য-জীবনের দুর্গম যাত্রাপথে প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। শৈলজানন্দের ধারণা মিথ্যে হয় নি। নজরুল পরে কবিতা লিখেছিলেন

---

১ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : লেখার ভূমিকা (সাহিত্য সংখ্যা দেশ ১৩৬৫) : পৃঃ ১১৫

এবং কবিতা লিখে বাংলার বোধহয় সবচেয়ে লোককান্ত কবি হয়ে ছিলেন তাঁর সময়ে। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রেরণা ও উৎসাহের মূল্য যে অসাধারণ এ কথা প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিকই জানেন। পরবর্তীকালে শৈলজানন্দ হয়েছিলেন গল্পকার। বাংলা সাহিত্যে কয়লাকুঠির গল্প লিখে তিনি অবহেলিত বঞ্চিত ও সর্বহারা জনসমাজের প্রথম প্রতিনিধিত্বের গৌরব অর্জন করেছিলেন। মূক পাখির যে বেদনা তাঁকে প্রথম কবিতা লেখার প্রেরণা দিয়েছিল, সেই বেদনাই বৃহত্তররূপে তাঁর হৃদয়কে গজদন্ত মিনারচূড়া থেকে নামিয়ে এনেছিল ধূলিধূসর রুক্ষ বন্ধুর জীবনের পথে। আর নজরুল নিপীড়িত পরাধীন আর্ত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা প্রকাশের জন্যে জাতীয় চারণ-কবির স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভে যাঁর সাহচর্য লাভ করে লাভবান হয়েছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ শুধু একজন জনগণবন্ধু ও লোকমান্য শ্রমিকনেতাই নন, তাঁর মত সাহিত্যপ্রাণ দরদী বন্ধু সত্যই দুর্লভ। এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বৈপ্লবিক আদর্শে প্রেরণা গ্রহণ করে নজরুল অগ্নিবীণা হাতে বাংলা কাব্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হয়েছিলেন জাতীয় চারণের বেশে।

নজরুল ইস্‌লাম মহাযুদ্ধের সময় করাচীর সেনানিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের সৈনিক ছিলেন। পরে তিনি এই পল্টনের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কথা মত ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির অফিসে এসে ওঠেন। তখন এই সমিতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা' নামে একটি ত্রৈমাসিক কাগজ বার হত। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই সমিতির সহকারী ও একমাত্র সব-সময়ের কর্মী ছিলেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'র প্রকাশ সম্পর্কে সমস্ত কাজই মুজফ্‌ফর সাহেবকেই করতে হত। তিনি সম্পাদনার কিছু কাজও করতেন। এই পত্রিকার সূত্রেই তাঁর সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ। করাচীর সেনানিবাস থেকে নজরুল তাঁর যেসব কবিতা ও গল্প পাঠাতেন, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। কলকাতায় এসে সাহিত্য-সমিতির অফিসে ওঠার পর থেকেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তা কোনকালেই ক্ষুণ্ণ হয় নি।

'মোসলেম ভারত'ই নজরুলের কবিখ্যাতি লাভের পক্ষে প্রচুর সাহায্য করেছিল। এ পত্রের সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক। কিন্তু আসলে তাঁর ছেলে আফজাল্-উল হক্‌ই পত্রিকাখানির সমস্ত কাজ সম্পাদন করতেন। এই কাগজের কার্যালয় ছিল মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। আফজাল্-উল হক্ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং এইটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পাদকীয় অফিস। দুইটি পত্রিকার অফিস একই বাড়ীতে হওয়াতে সাহিত্যিক আড্ডাটি বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। এই আড্ডায় প্রায় অধিকাংশ মুসলিম লেখক ছাড়াও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রলাল রায়, কান্তি ঘোষ, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্যিকেরাও আসতেন। বলাবাহুল্য এই আড্ডা জমিয়ে রাখতেন নজরুল তাঁর গান, কবিতা, অজস্র হাসি ও প্রাণপ্রাচুর্য দিয়ে। এই সব প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সংস্পর্শ তাঁর প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছিল নিশ্চয়ই।

মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে নজরুল কিছুকাল ৮এ, টার্নার স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে ছিলেন। ৬, টার্নার স্ট্রীট থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও তাঁর যুগ্মসম্পাদনায় 'নবযুগ' সান্ধ্য দৈনিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এর পরেও কিছুকাল নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে বাসের সুযোগ লাভ করেছিলেন। জীবনে নজরুল মুজফ্‌ফর সাহেবের কাছ থেকে যে সাহায্য পান তা তাঁর সাহিত্য-জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ।

একথা সকলেই জানেন যে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী বাংলা সাহিত্য শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নিত্যস্মরণীয় স্থানের অধিকারী। ঠাকুর-বাড়ীকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে জাতীয় জাগরণের জোয়ার এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে শিক্ষিত সমাজের মনে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার তরঙ্গ উঠেছিল তার মূলেও ঠাকুর-পরিবারের দান বড় কম ছিল না। বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্প সংগীত ও সাহিত্যের নবজাগরণে ঠাকুর-পরিবারভুক্ত একাধিক লোকোত্তর প্রতিভার ঋণ অপরিশোধনীয়। নজরুলের সঙ্গে এই পরিবারের নিবিড় সৌহার্দ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,

"জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন-তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বল্‌তে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর-বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বল্‌ত, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনি ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলে যে সে তা পারে। তাই একদিন সকালবেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল—কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না। শুনেছি অনেক কথাবার্তার পর কবি নাকি বলেছিলেন—'নজরুল, তুমি নাকি তরোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ী কামাচ্ছ—ক্ষুরই ও-কার্যের জন্যে প্রশস্ত—একথা পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন'।"[১]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে কবির প্রতি তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন।

সাহিত্যিক ও সাংগীতিক আড্ডা যে সাহিত্যিক ও সংগীতকারের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করে একথা অনস্বীকার্য। পূর্বেই বলেছি—সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলকে প্রভাবিত করেছিলেন। এই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হত "গজেনদা'র (গজেন ঘোষ) আড্ডা"য়। নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন,

"সে-সময় কলকাতায় সাহিত্যসেবীদের দুটি আড্ডা ছিল বড় রকমের। সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমান কৈলাস বসু স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসের তেতালায় ছিল "ভারতীর আড্ডা" আর দ্বিতীয়টি ছিল ৩৮নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে "গজেনদা'র আড্ডা"। ভারতীর আড্ডার সকালবেলাকার আড্ডাধারীরা অনেকেই, যথা:— কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি—জমায়েৎ হ'তেন সন্ধ্যার সময় গজেনদা'র আড্ডায়। নজরুল এই আড্ডায় এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তখন তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত বেশী ছিল না। মাত্র একটি স্বরচিত গান তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত—"পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা।""[২]

১ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: আমাদের নজরুল (কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১: পৃ ৩৮)

২ নলিনীকান্ত সরকার: নজরুল (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১: পৃ ২৭)

নজরুলের এই গানটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২৭ সালের (১৯২১) মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব নজরুলের উপর কি প্রগাঢ়ভাবে পড়েছিল তার প্রমাণ নজরুলের 'চিত্তনামা' নামক কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩২ সালের (১৯২৫) ২রা আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বিয়োগব্যথায় উদ্বেল হয়ে নজরুল এই 'চিত্তনামা' গ্রন্থে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তি তর্পণ করে ধন্য হন। 'নারায়ণে' নজরুলের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

'বিজলী'-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে নজরুলের যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল। নজরুল 'বিজলী' অফিসে ও ওল্ডক্লাবে প্রায়ই যেতেন ও কবিতা গান ইত্যাদি শুনিয়ে আসর জমিয়ে রাখতেন। নজরুলের অন্যতম গুণমুগ্ধ ভক্ত ও সুহৃদ্ ব্রজবিহারী বর্মনের কথায়,

" 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুলের গান কিছু কিছু নলিনদার (শ্রীযুত নলিনীকান্ত সরকার) মুখে শুনেছি 'বিজলী' আপিসে আর ওল্ড ক্লাবে। '২২ সালের এক সন্ধ্যায় ওল্ড ক্লাবের এক বৈঠকে কবির মুখে তাঁর স্বরচিত গান শোনার সুযোগ পেলাম। প্রথমে তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, তারপর গাইলেন স্বরচিত 'কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙে ফেল, কর্‌রে লোপাট' "[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রজবাবু নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'দুর্দিনের যাত্রী' ইত্যাদি অনেকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক। আর্য পাবলিশিং হাউস থেকেও তখন নজরুলের কতকগুলি বই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের দোকানটি ছিল একটি আড্ডার স্থান। এর আড্ডাতেও নজরুল প্রায়ই আসতেন। ব্রজবাবুর লেখা থেকে জানা যায়—

"'২২ সালের দিকে ১নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ওপর আর্য পাবলিশিং হাউস স্থানান্তরিত হয়। সন্ধ্যার পর মার্কেটের বিরাট বারান্দায় আসর বসে। কবি নজরুল প্রায়ই এখানে আসতেন। কোনদিন 'বিদ্রোহী,' কোনদিন 'কামাল পাশা' আবৃত্তি করতেন, কোনদিন বা হারমোনিয়াম সংযোগে চলত গান। কতবার এই আবৃত্তি শুনেছি, কতবার শুনেছি তাঁর গান কিন্তু আশা যেন মিটত না।"[২]

১ ব্রজবিহারী বর্মন : আমার দেখা নজরুল (ফসল, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৬৫ : পৃঃ ২৬৮)

২ ঐ

এই যুগে যে তিনটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে আধুনিকতা অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে-তিনটি 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'। এই তিনটি পত্রিকার সঙ্গেই নজরুলের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে বিশেষ করে 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার অনেকেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের নেতৃস্থানীয়। 'কল্লোলে'র সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ। এর প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩০সাল (১৯২৩)। 'কালি-কলমে'র প্রথম বর্ষের সম্পাদক—মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় বর্ষের সম্পাদক—মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তৃতীয় বর্ষ থেকে কেবল মুরলীধরই সম্পাদনা করতেন। 'কালি-কলমে'র প্রথম আত্ম-প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল (১৯২৬)। 'প্রগতি' মাসিকপত্র বেরত বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রস্থল ঢাকা থেকে। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু। 'প্রগতি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের (১৯২৭) আষাঢ় মাসে। নজরুলের অনেক বিখ্যাত রচনা এই তিনটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 'কল্লোল'ই তখনকার যুগে নূতন ভাবধারার সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছিল। 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই উত্তরবিশের যুগকে বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-যুগ বলে অভিহিত করা হয়। তখনকার প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী', 'উত্তরা', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি থেকে 'কল্লোলে'র একটি বিশিষ্ট চরিত্র ছিল। এই চরিত্র সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর অনমুকরণীয় ভাষায় লিখেছেন,

" "কল্লোল"কে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ "কল্লোলের" বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে—আরামরমণীয় পথ—যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু "কল্লোলের" পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।

কেননা তার সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্ততার সাধনা। যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি। যা আছে তার চেয়েও আরো কিছু আছে, বা যা হয়েছে তা এখনো পুরোপুরি হয়নি তারই নিশ্চিত আবিষ্কার।" ১

"কল্লোলে"র আদর্শের সঙ্গে নজরুলের হৃদয়ের মিল ছিল অনেক ক্ষেত্রেই। তাই "কল্লোলে"র সঙ্গে সহজেই তাঁর একাত্মতা ও সহৃদয়তা স্থাপিত হয়েছিল। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক অচিন্ত্যকুমারের কথায়,

"নজরুলের বিদ্রোহ; প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম। তারপরে স্বাদ পাব তার দারিদ্র্যজয়ী মুক্তপ্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম! সবই সেই কল্লোল-যুগের লক্ষণ।"২

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ ছিল প্রধানত রবীন্দ্র-রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে। সাহিত্যিক ভাব ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে সংস্কার ও পরিবর্তন মূলত এই লক্ষ্যাভিসারীই। তার বাস্তববাদ অনেকক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতিবাদ হিসেবেই রচিত। তাছাড়া 'কল্লোলে'র প্রগতি-বাদে ইউরোপীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মোহ-বিচ্যুতি এবং তারই অনুসঙ্গী যৌন ধারণার অনুপান যথেষ্টই ছিল। এ প্রগতিবাদ বিরোধ এনেছিল বটে, কিন্তু তাকে বিপ্লবের পথে চালিত করতে পারে নি। নজরুল এই গোষ্ঠীর একজন হয়েও নিজের প্রতিভাকে এই বিরোধেই সীমিত না রেখে তাকে এক মহত্তর সংগ্রাম-চেতনার ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন। অগ্নিযুগের অন্যতম পুরুষ ও স্বাধীনতাযজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংস্পর্শে নজরুল বিপ্লববাদের যে প্রকৃতি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের সর্বহারা মজুরদের মুক্তি-আন্দোলনের নেতা মুজফ্‌ফর আহমদের সাহচর্য ও বন্ধুত্বে তাঁর কাছে মুক্তিযুদ্ধের যে মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, তা নজরুল-কাব্যে একটি বিশেষ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের এই বিশিষ্ট চরিত্রই নজরুল-সাহিত্যকে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়ে কাব্যসরস্বতীর বিস্তৃততর প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই কারণে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কোন কোন সাহিত্যিকের

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, তৃতীয় প্রকাশ, কলিকাতা আষাঢ় ১৩৬০ সাল (১৯৫৩) : পৃ ৮২

২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : পৃ ৫৩-৪

তুলনায় অপরিণত সাহিত্যের স্রষ্টা হয়েও তিনি সবচেয়ে লোকবল্লভ কবি হতে পেরেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।

"There is a great surge of life within this poet which bears away all his faults, however numerous. Moreover, he is the only writer of modern Bengal who has specially succeeded in touching the mass mind. The poetry of Nazrul has been one of the contributing factors of that awakening of the masses that we now see about us. From that point of view his historical importance is very great indeed."[১]

১ Kazi Abdul Wadud : Creative Bengal : Calcutta 1950 : Page 12

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুল-জীবন

॥ ১ ॥

বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে) মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইস্‌লাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহ্‌মদ ও পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ্‌। তাঁর মাতার নাম জাহেদা খাতুন ও মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। কাজী ফকির আহ্‌মদ সাহেবের দু'টি বিবাহ এবং মোট সাতটি পুত্র ও দু'টি কন্যা। সহোদর ভাইবোন বলতে নজরুলেরা তিন ভাই ও একটি বোন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠভ্রাতা কাজী আলী হোসেন ও ভগিনী উম্মে কুলসুম। কাজী ফকির আহ্‌মদের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর চার পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ার পর নজরুলের জন্ম, তাই তাঁর নাম রাখা হয় 'দুখু মিঞা'।

নজরুলের পূর্বপুরুষেরা পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট শাহ্‌আলমের সময় তাঁরা বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত চুরুলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। চুরুলিয়া অতীতকালে রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী ছিল। মোগল রাজত্বকালে এখানে যে একটি বিচারালয় ছিল তার কাজীরা আয়মা সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কাজী নজরুল এই কাজীদেরই বংশধর। তাঁর বাড়ীর পূর্বদিকে ছিল রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর দক্ষিণে পীরপুকুর। এই পুকুরের পূর্বপাড়ে পীরপুকুরের প্রতিষ্ঠাতা সাধক হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজার এবং পশ্চিমপাড়ে একটি ছোট সুন্দর মসজিদ। নজরুলের পিতা ও পিতামহ আজীবন এই মাজারশরীফ ও মসজিদের সেবা করে পরিবারের ভরণপোষণ করে যান। মুসলমানধর্মের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও নজরুলের পিতা অন্য কোন ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না। ধর্মের ক্ষেত্রে পিতার এই উদারতা নজরুল উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছিলেন। তাছাড়া পারসী ও বাংলা কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগও তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে।

নজরুলের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তিনি কোন শাসন নিষেধের বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। নজরুলের পিতৃবিয়োগ হয় ১৩১৪ সালের (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) ৭ই চৈত্র। পরিবারের মধ্যে পিতাই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন বলে তাঁর মৃত্যুর পর কাজী পরিবার চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়। দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থান হওয়াই সুকঠিন হয়ে ওঠে। অতি কষ্টে কাজী পরিবারের দিন গুজরান হতে থাকে।

পরিবারের দারিদ্র্যের চাপে নজরুলের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা হয় নি। তিনি গ্রামের মক্তবে পড়াশুনো আরম্ভ করেন। তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও মেধা ছিল। তাঁর জ্ঞানপিপাসা শুধু বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকত না। যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ ও সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তাঁর চালচলনে গভীর ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে লোকে তাঁকে 'তারা খ্যাপা' বলে ডাকত।

দশ বৎসর বয়সে [১৩১৬ সাল (১৯০৯)] নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেই সংসারের চাপে মক্তবেই এক বৎসর শিক্ষকতা করেন। এই সময়ে অর্থোপার্জনের জন্যে শিক্ষকতা ছাড়াও আশেপাশের গ্রামে মোল্লাগিরি এবং হাজী পাহলোয়ানের মাজারশরীফের খাদেমগিরি ও মসজিদের এমামতিও করতেন। কাজী বজলে করিম নামে নজরুলের এক পিতৃব্য ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফারসী কাব্যচর্চা করতেন। পিতৃব্যের সাহচর্য, প্রেরণা ও উৎসাহে ফারসী-উর্দু-মিশ্রিত মুসলমানী বাংলায় নজরুল কাব্যচর্চায় উৎসাহী হন। একটি রচনার নমুনাই যথেষ্ট—

"মেরা দিল বেতাব কিয়া
তেরে আব্রুয়ে কামান
জলা যাতা হ্যায়
ইশ্‌ক্ মে জান পেরেশান,
হেরে তোমার ধনি,
চন্দ্র কলঙ্কিনী

মরি কী যে বদনের শোভা
মাতোয়ারা প্রাণ।
বুলবুল করতে এসেছে
তাই মধু পান।"

সেই তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। পূর্বেই বলেছি যে, খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে সংসারের ভরণপোষণ করতে হত। পশ্চিমবঙ্গে 'লেটোনাচ' নামে যে একপ্রকারের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে তাকে যাত্রাগান ও কবির লড়াই-এর একটা মিশ্রিত সংস্করণ বলা চলে। এতে গ্রাম্যকবির রচিত কাব্যে গ্রাম্য অভিনেতারা অভিনয়ে অবতীর্ণ হন। এই ব্যবস্থায় দুই দলের মধ্যে যে পক্ষ জয়ী হয় তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা হয়।

সেই সময় 'লেটোনাচে'র দলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে যিনি বিবেচিত হতেন, তাঁকে 'গোদা কবি' আখ্যা দেওয়া হত। নজরুলের কাব্যপ্রতিভার প্রতিশ্রুতি দেখে সেই 'গোদা কবি' নজরুলের বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চধারণা পোষণ করতেন। তিনি নজরুলকে ডাকতেন 'ব্যাঙাচি' বলে। একটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি নজরুলের সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমার 'ব্যাঙাচি' বড় হয়ে সাপ হবে।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই মিথ্যা হয় নি। আনওয়ারুল ইস্‌লাম নজরুলের বাল্যকাল সম্পর্কে জানিয়েছেন,

"বাড়ীর অবস্থা ভালো ছিল না তাই নজরুল এই সব 'লেটো'র দলে গান এবং নাটক রচনা করে দিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। তাঁর বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর মাত্র অথচ এ সময়ের রচনা তাঁর এত ভালো হতে লাগল যে তিনি ক্রমে ক্রমে নিমসা, চুরুলিয়া এবং রাখাকুড়া এই তিনটি 'লেটোনাচে'র দলে নাটক রচনার ভার পেলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদ বধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন।"[১]

আনওয়ারুল যাকে নাটক বলে অভিহিত করেছেন তাকে ঠিক নাটক না বলে পালাগান বলাই বিধেয়। নজরুল কর্তৃক এই সময়ে 'শকুনি বধ', 'মেঘনাদ বধ', 'চাষার সং', 'রাজপুত্র' ইত্যাদি কয়েকটি পালাগান রচিত হয়। এখানে তিনটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

১ আনওয়ারুল ইস্‌লাম : নজরুলের বাল্যজীবন (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ : পৃ ৩৪-৫)

'শকুনি বধে'র একটি গান—

"শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডাকাণ্ড
হয়েছিল উন্মাদ!
অজা হয়ে কোন সাহসেতে
বাধ সাধিস মহাবলী বাঘের সাথে,
ভেক হয়ে ফণীর সাথে বাধ
তুমি বাধ!
শূকর মত্ত করীবরে—যুদ্ধে কি
কখনো পারে
খঞ্জে লম্ফে মহাবীরে একি পরমাদ!
নজরুল ইস্‌লাম বলে সাবাস্—
ধোপার মুটের গাধা তাজীঘোড়া
জিনিতে আশ
সাবাস্ তোরে সাবাস্ সাবাস্
ধিক তোরে উন্মাদ।"[১]

'চাষার সং'-এ আছে—

"চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামলে,
কলেমায় জমিতে মই দিলে,
চিন্তা কি হে এই ভবেতে!
লা-ইলাহা ইল্লিলাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।
নয়টি নালা আছে তাহার,
ওজুর পানি নিয়াত ইহার

১ সওগাত, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬২ সাল : পৃ ১৮

ফলে পানি নানাপ্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।
যদি ভাল হয়েছে জমি,
হজ-জাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইস্‌লামেতে।"[১]

'রাজপুত্র' পালাগানে পড়ি—

"চল ওহে মন্ত্রীসুত স্বরাজ্যে ফিরে
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখি নাই দেশ-দেশান্তরে।
অসংখ্য গ্রাম নগরাদি,
দুর্গগুহা পর্বত আদি কত নদনদী,
দেখিলাম কিন্তু নিরবধি স্বদেশ জাগিছে অন্তরে।"[২]

নজরুলের কবি-প্রতিভার অঙ্কুর দেখা যায় এই সব রচনার মধ্যে।

এই সময় তিনি ইংরেজী-বাংলা-মেশানো কমিক গান লেখাতেও শক্তির পরিচয় দেন:

"রব না কৈলাসপুরে
    আই এ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন
    আহা মরি, কি লাইট্‌নিং॥
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
    কামন ডিয়ার গুড্‌মর্ণিং।
বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হেণ্ড শেক করে,
বসায় তারে রেসপেক্ট করে,
    হোল্ডিং আউট এ মিটিং॥

১ আজাদ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল
২ আজাদ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল

তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতূহলে
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইস্‌লাম ইজ টেলিং ॥"

লেটোর দলে পালাগান রচনায় ব্যস্ত থাকলেও নজরুলের দুরন্তপনা একটুও কমল না। গ্রামবাসীরা ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গ্রামের কয়েক-জন মাতব্বর ব্যক্তি তাঁকে রাণীগঞ্জের কাছে শিয়াড়শোল রাজস্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। নজরুল কিছুকাল বর্ধমান জেলার মাথরুণ হাইস্কুলেও পড়েছিলেন। তখন এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন সুখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই সময় (১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে) নজরুল ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়তেন। সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার আগে কি কিছু পরেই নজরুল এই স্কুল ত্যাগ করেন।

স্কুলের ছক-বাঁধা জীবনের বদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে নজরুল অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাধীনতা-প্রয়াসী মন ধরাবাঁধা জীবনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল। তাই তিনি একদিন কাউকে কিছু না বলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলেন। তারপর তিনি রাণীগঞ্জে রেলওয়ের এক গার্ডসাহেবের খপ্পরে পড়ে কিছুদিন তাঁর বাবুর্চী হয়ে থাকলেন। সেখানে এক ফ্যাসাদ পাকিয়ে উঠতেই পালিয়ে আসানসোলে চলে এসে তিনি আবদুল ওয়াহেদের এক রুটির দোকানে কাজ নিলেন। খুব ভোরে উঠে রুটির ময়দা মাখতে হয়, আর সমস্ত দিন ধরে রুটি বেচতে হয়। রাত্রিবেলা স্বল্পক্ষণের জন্যে শুধু অবসর মেলে। মাইনে ঠিক হল মাসে মাত্র পাঁচ টাকা। তিনি তবুও ভেঙে পড়লেন না। যথাসাধ্য ভালভাবে কাজ করতে লাগলেন। রাত্রিতে যে সামান্য সময়ের জন্যে ছুটি পেতেন তা তিনি বই পড়ে কাটিয়েদিতেন।

এখানে কাজ করার সময় নজরুল তাঁর যন্ত্রসংগীতনৈপুণ্যের জন্যে কাজী রফিজউদ্দীন আহমদ নামে আসানসোলের এক দারোগার নজরে পড়েন। দারোগা সাহেবের বাড়ী মৈমনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর-সিমলা গ্রামে। নজরুলের চোখেমুখে বুদ্ধি ও প্রতিভার ছাপ দেখে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি তাঁকে নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে ত্রিশাল-বাজারের নিকটবর্তী দরিরামপুর হাই স্কুলে ক্লাস সেভনে ভর্তি করে দেন। কিন্তু স্কুলের রুটিন-বাঁধা জীবন তাঁকে একেবারেই আকৃষ্ট করত না। তিনি স্কুলে যাবার নাম ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সারা দুপুর স্কুলের

অদূরে ঠুনিভাঙা বিলের তীরে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে থাকতেন অথবা বাঁশী বাজাতেন। কাজীরসিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুল প্রায় পাঁচ মাইলের পথ। নজরুল রোজ হেঁটে স্কুলে যেতেন। গ্রামের ছেলেরা তাঁকে খুবই জ্বালাতন করত। তাদের দৌরাত্ম্যের চিত্র আছে নজরুলের 'শিউলিমালা' গল্প-গ্রন্থের 'অগ্নিগিরি' গল্পে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার পরই তিনি কাউকে কিছু না বলে মৈমনসিংহ ত্যাগ করেন। স্কুলের পড়া নিয়মিত করার অভ্যাস না থাকলেও তিনি অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

কিছুকাল ঘোরাঘুরি করে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি নিজের ইচ্ছাতেই রাণীগঞ্জ এসে আবার ভর্তি হলেন শিয়াড়শোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে। নজরুল রায়-সাহেব এম. চ্যাটার্জির পুষ্পোদ্যানের পাশে মাটির দেয়াল-ঘেরা একটি ছোট ঘরে আর চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে থাকতেন। নজরুল ক্লাসের ভাল ছাত্র ছিলেন বলে তাঁর স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এর আহার ছিল ফ্রি, তদুপরি রাজবাড়ী থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন। এই সাত টাকায় চা-জলখাবার ও জামাকাপড় হত। কোন কোন মাসে এ থেকে কিছু বাঁচিয়ে তিনি তাঁর ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচ বাবদ দিতেন। এই স্কুলে তিনি তিন বছর টিকে ছিলেন। এই স্কুলে পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুত্ব হয়। এই সম্পর্কে শৈলজানন্দ বলেছেন,

"পাশাপাশি দুই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি আমরা। আমি রাণীগঞ্জে, নজরুল শিয়াড়শোল রাজার ইস্কুলে। মাইল দু'য়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দু'জনে, আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা—আশ্চর্য হচ্ছ—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দুজনে। সেই টানে মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্ণাবর্ণ নেই—সৃষ্টির টান—সাহিত্যের টান। দুইজনে রোজ একসঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনদিন বা ইস্কুল পালাই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরি, ধরি ই-আই আরের লাইন, কোনদিন বা চলে যাই শিশু-শালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম লড়াই লেগেছে।"[১]

শৈলজানন্দ তাঁদের শিয়াড়শোল স্কুল জীবনের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'কাজি নজরুল ইস্‌লাম' নামক রচনায়। রচনাটি ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশে'র সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্কুলজীবন থেকেই

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : পৃ ৪০

নজরুলের বাউণ্ডুলে খেয়ালী ছন্নছাড়া জীবনের আভাস পাওয়া যায়। রচনাটির একজায়গায় শৈলজানন্দ লিখেছেন,

"নজরুলের টাকাপয়সা থাকতো বিছানার তলায়। টাকাপয়সা বলতে শিয়াড়শোল রাজবাড়ী থেকে পাওয়া মাসিক সাতটি টাকা। ইস্কুলে বেতন দিতে হ'তো না, বোর্ডিং-এর খরচ দিতে হ'তো না, সাতটি টাকা পেতো সে নিজের খরচের জন্যে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বিছানার তলাতেই থাকতো, সেইখান থেকেই খরচ হ'তে হ'তে একদিন শেষ হয়ে যেতো। সাত টাকার বেশির ভাগ নিতো…বিস্কুটওলা। তারপর চলতো ধার। সে ধার শোধ করতাম হয় আমি, নয় আমাদের আর এক সহপাঠী বন্ধু ছিল শৈলেন ঘোষ। নেটিভ ক্রিশ্চান। সে দিত। একবার একটা ভারী মজা হয়েছিল। মাসের প্রথমেই রাজবাড়ি থেকে সাতটি টাকা নজরুল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বোর্ডিং-এ এসে দেখে তার ছোট ভাই আলি হোসেন এসেছে গ্রাম থেকে। সচ্ছল সংসার নয়। দারিদ্র্যের জ্বালা লেগেই আছে। দুঃখকষ্টের কথা পাছে বেশি শুনতে হয়, তাই তাড়াতাড়ি সাতটি টাকাই আলি হোসেনের হাতে দিয়ে তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।"[১]

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, যিনি দারিদ্র্যের কথাও সহ্য করতে পারতেন না, তাঁকেই আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। জীবনে যখন ভাল আয় করেছেন, তখনও অসংযত ব্যয়ের জন্যে তাঁর সচ্ছলতা আসে নি।

নজরুলের 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' শীর্ষক গল্পে রাণীগঞ্জের শিয়াড়শোল রাজস্কুলের কথা আছে। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' 'সওগাত' মাসিক পত্রিকার ১ম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন এম. নাসিরউদ্দীন। এই গল্পটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প। পরে গল্পটি নজরুলের 'রিক্তের-বেদন' গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গল্পটির একজায়গায় নজরুল লিখেছেন,

"ইতিমধ্যে বর্ধমান 'নিউ স্কুল' উঠে যাওয়ায়, তাছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রাণীগঞ্জে এসে পড়তে লাগলাম। আমাদের ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলের হেডমাষ্টারির পদ পেয়েছিলেন।"[২]

১ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : কাজি নজরুল ইসলাম (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৪ : পৃ ১১৪)

২ নজরুল ইস্লাম : রিক্তের বেদন তৃতীয় সংস্করণ : কলিকাতা ১৯২৮ : পৃ ৪৪-৫

শিয়াড়শোল স্কুলে নজরুলের পড়ার সময় পারসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন কলকাতার খিদিরপুরের বাসিন্দা হাফিজ নুরুন্নবী। তিনি অত্যন্ত সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং কাব্যমণ্ডিত উর্দু গদ্য লিখতেন। নুরুন্নবী সাহেব নজরুলের মধ্যে সাহিত্যশক্তির স্বাক্ষর দেখে তাঁকে সংস্কৃত ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ভাষা পারসী নেওয়ালেন। নুরুন্নবী সাহেবের সাহচর্য ও শিক্ষায় নজরুলের মনে পারসী ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

নজরুল শিয়াড়শোল স্কুল থেকেই প্রি-টেস্ট দেন। তখন শহরে গ্রামে চলছে সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়। এর পরের ঘটনা সম্পর্কে শৈলজানন্দ লিখেছেন,

"দুই বন্ধু খেপে উঠলাম। পরীক্ষা দিয়েই দু'জনে চুপি চুপি পালিয়ে গেলাম আসানসোলে। সেখান থেকে এস-ডি-ওর চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা। আসানসোলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—তার কাছে কিছু বাহাদুরি করতে গিয়েছিলাম কিনা মনে নেই—সে-ই বাড়ি ফিরে সব ভণ্ডুল করে দিলে। উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি রেজিমেণ্টে ঢোকার সব ঠিক ঠাক। ডাক্তার বললে, তোমার দৈর্ঘ-প্রস্থ আরেকবার মাপতে হবে। দ্বিতীয়বারের মাপজোকে নামঞ্জুর হয়ে গেলাম। কেন যে নামঞ্জুর হলাম জানলেন শুধু ভগবান আর সেই রায়সাহেব দাদামশায়। নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে সাথীহারা হয়ে ফিরে এলাম গৃহকোণে—"[১]

১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে) নজরুল ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের (49th **Bengali Regiment**) সৈনিক রূপে প্রথমে লাহোর হয়ে যান নৌশেরাতে। সেখানে তিনমাস ট্রেনিং গ্রহণ করে তিনি করাচী সেনানিবাসে চলে যান। এইখান থেকে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়।

১ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : পৃ ৪০

॥ ২ ॥

নজরুলের সৈনিক জীবন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথমে নজরুল করাচীর সেনানিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনের সৈনিক ছিলেন। পরে এই পল্টনের কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হন। তাঁর রণাঙ্গনের চিত্ত-চাঞ্চল্যকর বিবরণ-সংবলিত লেখা পড়ে অনেকের ধারণা হয় যে, তিনি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, নজরুল করাচীর বাইরে যান নি। ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের হেড কোয়ার্টার ছিল করাচী শহরের পূর্ব উপকণ্ঠে বর্তমান আবিসিনিয়া লাইনে, যা সে সময়ে গনজা লাইন নামে অভিহিত হত। নজরুল হাবিলদার ছিলেন এই কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল অফিসেই। প্রথমে নজরুল বাঙালী ডবল কোম্পানীতে নাম লিখিয়ে সৈনিক-শিক্ষা গ্রহণের জন্যে পেশোয়ারের কাছে নৌশেরাতে গিয়েছিলেন। পরে ডবল কোম্পানী বড় হয়ে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে পরিণত হলে হেড কোয়ার্টার হয় করাচী। সেনানিবাসে নজরুলকে সৈনিক-জীবনের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হত। তবুও নজরুল অবসরকালে সাহিত্যচর্চা করতেন। পূর্বেই বলেছি যে, নজরুল শিয়াড়শোল স্কুলে হাফিজ নুরুন্নবীর কাছে পারসী শিখেছিলেন। পল্টনে পারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব ছিলেন। তাঁর কাছে নজরুল বিখ্যাত পারস্য কবিদের কাব্যপাঠের সুযোগ পান। নজরুল তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' নামে অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন,

"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।"

নজরুল স্কুলজীবনেই শিক্ষকের কাছে পারসী ভাষা শিখেছিলেন।

তবে বিখ্যাত পারসী কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠ ও অনুবাদ করার মত যথাযথভাবে ভাষাকে তিনি রপ্ত করেছিলেন এই মৌলবী সাহেবের কাছে। এই সময় তিনি হাফিজের কাব্যের (রুবাইয়াতের) বঙ্গানুবাদেও হাত দেন। পরে এই অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'রিক্তের-বেদন' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি করাচীতে থাকাকালীন 'আরবসাগরের বিজনবেলায়' বসে লেখা। এই গ্রন্থের ৮টি গল্পের নাম—'রিক্তের-বেদন,' 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী,' 'মেহের-নেগার,' 'সাঁজের তারা,' 'রাক্ষুসী,' 'সালেক,' 'স্বামীহারা' ও 'দুরন্ত পথিক'।

'মেহের-নেগার,' 'স্বামীহারা' ইত্যাদি গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় যে, নজরুল ইতোমধ্যেই রবীন্দ্র-কাব্যসংগীত অন্তরঙ্গভাবে পাঠ করেছিলেন। 'সালেক' গল্পটির মধ্যে হাফিজের একটি গজলের ভাবই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পটির উপসংহারে আছে—

"কাজী সাহেব প্রাণের বাকী সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে' ভাঙা গলায় বল্‌লেন, "কে ? ওগো পথের সাথী ! তুমি কে ?"

অনেকক্ষণ কিছুই শোনা গেল না। নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে' গেল আর্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, "তু—মি—কে ?"

খেয়াপার হ'তে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কয়ে গেল, "মাতাল হাফিজ!" "[১]

এইসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, নজরুল খুব ঘনিষ্ঠভাবেই হাফিজের কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামক গল্পে তাঁর নিজের জীবনের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। গল্পটির প্রারম্ভে লেখা আছে—

"[বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে : নীচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।—]"[২]

এই গল্পটি ১৩২৬ সালের (১৯১৯) জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সওগাত' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। করাচীতে থাকাকালীন নজরুল গল্প-গান-কবিতা লিখে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পাঠাতেন। ১৩২৬ সালের

১ নজরুল ইস্‌লাম : রিক্তের বেদন : পৃ ১১৮

২ ঐ : পৃ ৩১

আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' তাঁর হাসির কবিতা 'সমাধি' এবং ভাদ্র সংখ্যায় 'স্বামীহারা' গল্প প্রকাশিত হয়। 'সমাধি' শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতাটি থেকে বোঝা যায় যে নজরুল করাচী থেকে যে সব গাথা, কবিতা ইত্যাদি পাঠাতেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই সম্পাদকের ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে স্থান লাভ করত। ঐ বৎসরের কার্তিকের 'সওগাতে' তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বৎসরের ভাদ্রমাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তুর্কনারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে যে নানা অসহিষ্ণু উক্তি করা হয় তাদের প্রতিবাদস্বরূপ নজরুল এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই সময় তাঁর লেখাগুলির নীচে প্রায়ই লেখা থাকত, হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র নীচে শুধু কাজী নজরুল ইস্‌লাম লেখা ছিল। 'সওগাত' তখন একটি উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্ররূপে গণ্য হত। 'সওগাতে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল— অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সাল। পল্টন থেকে ফিরে এসেও নজরুল 'সওগাতে' নিয়মিত লিখতেন।

১৩২৬ সালের (১৯১৯) শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় নজরুলের 'মুক্তি' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দে লেখা। কবিতাটির নীচে লেখা ছিল,

"ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিতরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও "হাত-বাঁধা ফকিরের মজার শরিফ" বলিয়া কথিত হয়।"

রচয়িতা হিসেবে লেখা ছিল, কাজী নজরুল ইস্‌লাম (হাবিলদার, বঙ্গবাহিনী; করাচী)। এইটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

১৩২৬ সালেরই (১৯১৯) কার্তিক ও মাঘ সংখ্যায় যথাক্রমে 'হেনা' ও 'ব্যথার দান' শীর্ষক দুটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই সময় 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (পরে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্) এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্। সাহিত্য সমিতির অফিস ছিল কলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীর দোতলার সামনের দিককার অংশে। মোজাম্মেল হক্ সাহেব শুধু সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকই ছিলেন না, তিনি সাহিত্য সমিতিরও

সম্পাদক ছিলেন। শ্রমিক নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ছিলেন সাহিত্য সমিতির সহকারী সম্পাদক ও একমাত্র সবসময়ের কর্মী। সাহিত্য-পত্রিকার সব কাজই তাঁকে করতে হত এবং তিনি কাগজের কিছু কিছু সম্পাদনাও করতেন।

সাহিত্য-পত্রিকার কল্যাণেই নজরুলের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পরিচয় ঘটে। এই সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন,

" "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা"য় ছাপানোর জন্যে নজরুল যখন প্রথম লেখা পাঠিয়েছিল (১৯১৮ সন) তখন হতেই তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি শুরু হয়। আমি তার "ব্যথার দান" গল্পটির একটি শব্দের পরিবর্তন করেছিলেম। এইসূত্রে তার সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রের পরিচয় চিঠি-পত্রের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমার পরিবর্তন নজরুলের খুব পসন্দ হয়েছিল।... আমাদের অদেখা বন্ধুত্ব হলেও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। নজরুল ক্রমশ তার ব্যক্তিগত ব্যাপারও আমায় লেখা শুরু করেছিল।"[১]

'ব্যথার দান' গল্পটি করাচীর সেনা-নিবাসেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল। সেটি ছাপা হয় ১৩২৬ সালের (১৯২০) মাঘ মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়। গল্পটি রচিত হওয়ার পূর্বেই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রুশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতে 'ব্যথার দান' গল্পটিতে নজরুলের উপর রুশবিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যবান স্বাক্ষর আছে। তিনি লিখেছেন,

" "ব্যথার দান" একটি ভালবাসার গল্প। এই গল্পের ভিতর দিয়েই ব্রিটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, বিশ বছরের যুবক নজরুল ইস্‌লাম যে রুশবিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।"[২]

গল্পটির ঘটনাস্থান গোলেস্তান, চমন্ ও বোস্তান। গল্পের নায়ক দারার মা মৃত্যুকালে নায়িকা বেদৌরাকে তার হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন যেন সে বেদৌরাকে কোন অবস্থাতেই না ছাড়ে। দারা ও বেদৌরাও পরস্পরকে গভীর-ভাবে ভালবাসত। কিন্তু একদিন বেদৌরার এক ভণ্ড মামা জোর ক'রে দারার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বেদৌরা কিছুকাল পরে তার ভণ্ড

---

১ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ : কবি নজরুল ইস্‌লাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা [বিংশ শতাব্দী : আশ্বিন ১৮৮০ শক (১৯৫৮) : পৃ ৩০৯-১০]

২ ঐ (বিংশ শতাব্দী : পৌষ ১৮৮০ : পৃ ৭৩৯-৭৪০)

মায়ার জাল ছিন্ন ক'রে চলে এল বটে, কিন্তু সে গিয়ে পড়ল সয়ফুল-মুল্ক নামক এক শয়তানের কবলে। কিছুদিনের মধ্যেই সয়ফুল-মুল্ক বুঝতে পারলে যে বেদৌরার হৃদয়ে তার কোন স্থানই নেই। দারাই বেদৌরার হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে আছে। তখন সে অনুতপ্ত হ'য়ে বেদৌরার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে আর স্থিরপ্রতিজ্ঞ হল যে সে কোন মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করে দেবে। সয়ফুল-মুল্ক তার আত্মকথায় বলছে,

"যা ভাবলুম, তা' আর হ'ল কই! ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হ'য়েছে। এরা মনে ক'রছে, এদের এই মহান্ নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তিসঞ্চয় ক'রছে। আমায় আদর ক'রে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত হ'য়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে এবং আমিও সেই মহান্ ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক পেলাম।"[১]

এইখানে দারার সঙ্গে সয়ফুল-মুল্কের দেখা হল। সয়ফুল-মুল্কের কাছে দারা তার যুদ্ধে আসার কারণ বিবৃত করলে।

"কিন্তু সহসা একি দেখলুম? দারা কোথা থেকে এখানে এল? সেদিন তাকে অনেক ক'রে জিজ্ঞেস করায় সে বললে,—"এর চেয়ে ভাল কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।"[২]

শত্রুদের বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার পুরস্কারস্বরূপ দারার পদোন্নতি হল। সৈন্যদলও শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলে। কিন্তু দারা হয়ে গেল অন্ধ ও বধির।

দারার বিদায়-সংবর্ধনার যে বর্ণনা সয়ফুল-মুল্ক দিয়েছে তা বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী।

"আজ অন্ধ সেনানী দারার বিদায়ের দিন! অন্ধ বধির আহত দারা যখন আমার কাঁধে ভর ক'রে সৈনিকদের সামনে দাঁড়াল, তখন সমস্ত মুক্তি-সেবক সেনার নয়ন দিয়ে হু-হু ক'রে অশ্রুর বন্যা ছুটছে! আমাদের কঠোর সৈনিকদের কান্না যে কত মর্মন্তুদ, তা' বোঝাবার ভাষা নেই। মুক্তি-সেবক-

১ নজরুল ইসলাম: ব্যথার দান সপ্তম সংস্করণ: কলকাতা ১৯৫৩: পৃ ২১-২

২ ঐ: পৃ ২২

সৈন্যাধ্যক্ষ বললেন,—তাঁর স্বর বারংবার অশ্রুজড়িত হয়ে যাচ্ছিল,—"ভাই হারাবী! আমাদের মধ্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস,' 'মিলিটারী ক্রস' প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় না, কেননা আমরা নিজে নিজেই তো আমাদের কাজকে পুরস্কৃত ক'রতে পারিনা। আমাদের বীরত্বের, ত্যাগের পুরস্কার বিশ্ববাসীর কল্যাণ; কিন্তু যারা তোমার মত এইরকম বীরত্ব আর পবিত্র নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখায়, আমরা শুধু তাদেরই বীর বলি!"[১]

মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, " "ব্যথার দান" গল্পটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় ছাপানোর সময়ে আমি "লাল ফৌজ" কথাটা গল্প হতে কেটে দিয়ে তার জায়গায় "মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল" কথা বসিয়ে দিয়েছিলেম। আমাদের দেশের পুলিস তখন ভারতীয়দের (গল্প হলেও) লাল ফৌজে যোগ দেওয়া কিছুতেই হজম করতে পারত না…… আমি যে "লাল ফৌজ" কথাটি কেটে দিয়েছিলেম তার জন্যে খুশী হ'য়ে নজরুল আমায় ধন্যবাদ জানিয়েছিল।"[২]

মুজফ্ফর সাহেবের ধারণা—দৈনিক কাগজ ইত্যাদির মারফত রুশদেশে বিপ্লব এবং লালফৌজ গঠিত হওয়ার খবর নিশ্চয়ই করাচী সেনানিবাসে পৌঁছিয়েছিল। ট্রান্সককেসাসে ভারতীয় সৈন্যদের লালফৌজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অসম্মত হওয়ার এবং কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্যের লালফৌজে যোগ দেওয়ার সংবাদও নজরুল-প্রমুখ করাচীস্থ সৈন্যেরা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। নবেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলেই নজরুল তাঁর নায়কদের লালফৌজে যোগদান করিয়েছিলেন। মুজফ্ফর সাহেব এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলছেন,

"আমার যতটা জানা আছে নজরুলের আগে বাঙলা দেশের, সম্ভবত ভারতবর্ষেরও, কোনও কবি ও সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের পরের সোবিয়েৎ ভূমির কথা তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেন নি। এমন আন্তর্জাতিকতার পরিচয়ও বিপ্লবের এক বছরের ভিতরে অন্য কোন কবি ও সাহিত্যিক দেন নি। নজরুলের কবিতার ভিতর দিয়ে যে সাম্যবাদী সুর ফুটে উঠেছে তার সূত্রপাত নিশ্চয় করাচীর সেনা-নিবাসে হয়েছিল।"[৩]

১ নজরুল ইস্লাম : ব্যথার দান : পৃ ২৪-৫
২ বিংশ শতাব্দী, পৌষ ১৮৮০ শক : পৃ ৭৪০-১
৩ বিংশ শতাব্দী, পৌষ ১৮৮০ শক : পৃ ৭৪২

মুজফ্‌ফর সাহেব শুধু 'ব্যথার দান' গল্পটির প্রসঙ্গ নিয়ে নজরুলের উপর রুশপ্রভাবের কথা উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে নজরুল 'লালফৌজ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং 'লালফৌজে'র মহৎ আদর্শের কথা তুলে ধরেছিলেন, তবুও একথা বোধহয় বলা ঠিক নয় যে, নজরুল সচেতনভাবে রুশবিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বা তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুক্তিসেবক সৈন্যদলের কার্যকলাপকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা নিতান্তই কাব্যজনোচিত এবং নজরুলের নায়কদের জীবনে বা চরিত্রে একমাত্র ব্যক্তিগত প্রেমের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য ছাড়া 'লালফৌজে'র যোদ্ধাদের মত কোন সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সজ্ঞান বিদ্রোহ নেই। তাদের যুদ্ধ নেহাতই আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক ভাবালুতাময়। আসলে 'ব্যথার দান' একটি প্রেমের বিদগ্ধ গল্প। নায়কদের মুক্তিসেবক দলে যোগদানের ঘটনা গল্পের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রায় প্রেরণাহীনভাবে ক্ষীণসূত্রে গ্রথিত। এমনও হতে পারে যে নজরুল বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী অর্থে 'লাল' কথাটিকে 'ফৌজে'র আগে ব্যবহার করেছিলেন। 'লাল নিশান,' 'লাল পল্টন' ইত্যাদি কথা ব্যবহারের সময় তিনি বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে 'লাল' কথাটিকে গ্রহণ করতেন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রায় সমকালীন 'হেনা' গল্পটির উল্লেখ করতে হয়। 'ব্যথার দানে'র মত 'হেনা'-ও একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্প। 'ব্যথার দানে' যদি ব্রিটিশবিরোধী সজ্ঞান মনোভাব থেকে 'লাল ফৌজে'র কীর্তি কীর্তন করা হত তাহলে 'হেনা'র নায়ক কি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলতে পারত ?

"তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। সে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি আমার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ আহুতি দেওয়া, তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না।

আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।"[১]

মনে হয়—দুএকটি শব্দের ব্যবহার বা কোন ভাবাদর্শের কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে কোন কবিমানসের বিচার করতে গেলে ভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। এসব ক্ষেত্রে ঘটনার আকস্মিক মিল ঘটাও বিচিত্র নয়।

নজরুল যে এই সময় 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠ কেরছিলেন, তার প্রমাণ 'ব্যথার দান' গল্পটিতে আছে। বেদৌরাকে তার

১ নজরুল ইস্‌লাম : ব্যথার দান : পৃ ৫২

ভণ্ডমামা যখন দাদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তখন সে দাদার কোন কথা বিশ্বাস করলে না। দাদা স্মৃতিকথায় বলছে,

"আমার কান্না দেখে সে বললে যে, ইরানের পাগলা কবিদের দিওয়ান পড়ে আমিও পাগল হয়ে গিয়েছি।"[১]

শুধু 'সিরাজ বুলবুল-এর দিওয়ান' নয় 'সাধক শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রুমীর গজল'-এর উল্লেখও গল্পটিতে পাওয়া যায়।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে এই সময় থেকেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলের প্রতিভাকে চিনতে পেরে তার বিকাশের পথে সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। দুজনের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

এই যুগে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্র বলে বিবেচিত হত। নজরুল 'সবুজপত্রে'র জন্যে করাচী থেকে 'আশায়' শিরোনামে হাফিজ থেকে ছপংক্তি পদ্যানুবাদ পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি অত্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-ঘেঁষা বলে প্রমথ চৌধুরী সেটিকে ছাপতে রাজী হন নি। তখন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 'সবুজপত্রে' কাজ করতেন। তিনি কবিতাটিকে 'প্রবাসী'র চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। চারুবাবু ১৩২৬ সালের (১৯১৯) পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিতাটি পত্রস্থ করেন। সেই সময় থেকেই চিঠিপত্রের মারফত নজরুলের সঙ্গে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবিড় প্রীতি-সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯১৯ সালের শেষভাগে অর্থাৎ বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার মাস কয়েক আগে নজরুল ছুটি পেয়ে আসানসোল মহকুমার অধীন জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই তিনি একবার কলকাতায় এসে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের এই প্রথম দেখা। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলকে পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর সোজা কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্য সমিতির অফিসে উঠতে পরামর্শ দেন। সেই সময় নজরুলের বয়স ২২ বছরের কাছাকাছি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পরামর্শমত ১৯২০ সালের প্রারম্ভে বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল তাঁর জিনিসপত্তর নিয়ে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে ওঠেন।

এইবার তাঁর জীবনে আর এক নতুন পর্বের উন্মোচন হল।

---

[১] নজরুল ইস্‌লাম : ব্যথার দান : পৃ ৯

॥ ৩ ॥

নজরুল যেদিন সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে ওঠেন, তার কিছুদিন পরে এই সমিতির একটি ঘর ভাড়া নেন আফজাল্‌-উল হক্‌ সাহেব। নজরুল যেদিন সমিতির অফিসে এসে পৌঁছিলেন, সেইদিনই রাত্রিবেলা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতি বন্ধুদের অনুরোধে একটি হিন্দুস্থানী গান, 'পিয়া বিনা মোর জিয়া না মানে বদরী ছাইরে' গেয়ে শোনান। নজরুল সাধারণত রবীন্দ্রনাথের গানই গাইতেন, কিন্তু এই দিনই প্রথম হিন্দুস্থানী গান করেন। নজরুল সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গলায় এক অপূর্ব দরদ ও প্রাণময়তা ছিল।

কলকাতায় দুদিন অবস্থানের পর নজরুল ইস্‌লাম একবার সাত আটদিনের জন্যে চুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। সেই সময় চুরুলিয়ার বাড়ীতে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছিল যার জন্যে নজরুল আর কখনও বাড়ী যেতে চান নি। চুরুলিয়া থেকে কলকাতায় ফেরার পথে নজরুল বর্ধমানে নেমে সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে সাব রেজিস্ট্রারের চাকরির জন্যে একটি দরখাস্ত দিয়ে আসেন। এরপর কলকাতায় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসের ঠিকানায় ইণ্টারভিউ লেটার আসে। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতি বন্ধুদের পরামর্শে নজরুল ইণ্টারভিউতে উপস্থিত হন নি। বন্ধুরা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি পেলে তাঁকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে এবং তাতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা।

নজরুল সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠলে সমিতির অফিসটিতে একটি চাঞ্চল্যকর জীবনের সূত্রপাত ঘটে। বাঙালী পল্টনের সৈনিকেরা প্রায়ই এই অফিসে যাতায়াত করতেন। এই সময় নজরুল গায়ক হিসেবে খুব তাড়াতাড়ি খ্যাতি লাভ করতে আরম্ভ করেন। হিন্দু মুসলমানের মেসগুলি ছাড়াও হিন্দু পরিবার থেকেও নজরুলের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। এই সময় দৈনিক 'মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন। শামসুদ্দীন তাঁর 'নজরুলের সঙ্গে আমার পরিচয়'[১] রচনায় বলছেন যে তাঁর চেষ্টাতেই

[১] নজরুল-পরিচিতি : পৃ ৯-১১

নজরুল এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন। নজরুল অফিসের নিয়মকানুন মেনে চলতেন না বলে কাজের খুবই ক্ষতি হত। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান। নজরুল তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধের কয়েকটি শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করে 'মোহাম্মদী'তে ছাপাতে নজরুল ক্ষুব্ধ হয়ে আর অফিস-মুখো হন নি।

নজরুল যখন কলকাতায় এলেন তখন নূর লাইব্রেরীর মালিক মঈনউদ্দীন হোসায়েন কলকাতায় ছিলেন না। তিনি তখন বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে তাঁর দেশের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্‌মদ নজরুলের কলকাতায় আসার কথা তাঁকে জানালে মঈনউদ্দীন হোসায়েন তাঁকে ৩৫টি টাকা পাঠিয়ে দেন। তাঁর আশা ছিল যে একদিন তিনি নজরুলের বইয়ের প্রকাশক হবেন। পূর্বে নজরুল কোথাও এত টাকা পান নি।

করাচী থেকে কলকাতায় আসার কয়েকদিন পরে নজরুলের সঙ্গে 'মোসলেম ভারতে' লেখা দেওয়া নিয়ে আফজাল্-উল হক্ সাহেবের কথাবার্তা হয়। সেই সময় প্রথম সংখ্যার কপি প্রেসে যাচ্ছিল। নজরুল করাচী-থাকাকালীন রচিত একটি পত্রোপন্যাস প্রকাশের ইচ্ছা করেন। পত্রোপন্যাসের নাম ঠিক হয় 'বাঁধনহারা'। উপন্যাসটি 'মোসলেম ভারত'-এর প্রথম সংখ্যা [১৩২৭ সাল (১৯২০) বৈশাখ] থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই 'মোসলেম ভারতে'ই নজরুলের প্রথম দিককার অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাগুলি পত্রস্থ হয়েছিল। 'মোসলেম ভারতে'র প্রথম বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নজরুলের 'বোধন'ও 'শাত্-ইল আরব' আত্মপ্রকাশ করে। আষাঢ় সংখ্যায় 'বাদল প্রাতের শরাব' এবং শ্রাবণ সংখ্যায় 'খেয়াপারের তরণী' পত্রস্থ হয়েছিল। শ্রাবণ সংখ্যাতে 'বাদল বারিষণে' শীর্ষক একটি রূপক গল্পও প্রকাশ লাভ করে। ভাদ্র সংখ্যায় 'কোরবাণী', আশ্বিন সংখ্যায় 'মোহর্‌রম', কার্তিক সংখ্যায় একটি গান ('বন্ধু আমার ! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন-পুরে ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?'), অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্দহম' ও 'দিওয়ান্-ই-হাফিজে'র গজলের অনুবাদ, ফাল্গুন সংখ্যায় 'মরমী' ও 'স্নেহভীতু' শীর্ষক দুটি গান এবং চৈত্র সংখ্যায় একটি গান ('আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই সকাল সাঁঝে') মুদ্রিত হওয়ায় নজরুলের কবিখ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বছরের এই রকম বিস্তৃত সূচীপত্র দেখে বোঝা যায় যে নজরুল 'মোসলেম

ভারতে'র সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল-পাশা' ('মোসলেম ভারত', কার্তিক, ১৩২৮) কবিতাদুটি লিখেই নজরুল সবচেয়ে বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী' [২২শে পৌষ, ১৩২৮; (৬ই জানুয়ারী, ১৯২২)] থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ১৩২৮ সালের (১৯২১) কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। ব্যাপারটি এই।

২২শে পৌষ, ১৩২৮ সালের 'বিজলী' প্রকাশের সময় ঐ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' ছাপা হচ্ছিল। ঐ সংখ্যা বিজলী'তে কার্তিকসংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'র একটি সমালোচনায় লেখা হয়—"এই সংখ্যায় 'মোসলেম -ভারত' থেকে কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।" কিন্তু 'মোসলেম-ভারত' প্রকাশিত হবার আগেই 'বিজলী' আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির অনুকরণে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। বিদ্রোহী নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও হয়েছে প্রচুর। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাসের 'ব্যাঙ' (সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি', ৪ঠা, অক্টোবর, ১৯২৪) ও গোলাম মোস্তাফার 'নিয়ন্ত্রিত' ('সওগাত', মাঘ, ১৩২৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান ঐতিহ্য ও গৌরব নিয়ে লেখা 'শাত্-ইল আরব'ও নজরুলের একটি বিখ্যাত কবিতা। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে লেখা প্রথম কবিতা 'একি রণবাজা বাজে ঝন্ ঝন্' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকার ১৩২৭ সালের (১৯২০) আষাঢ় সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এত লোকপ্রিয় হয়েছিল যে, 'মোসলেম ভারত' ছাড়াও 'প্রবাসী' (মাঘ, ১৩২৮) প্রমুখ বহু বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় কবিতাটির পুনর্মুদ্রণ হয়।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মিস্টার এ, কে, ফজলুল হক্ সাহেব 'নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্যদৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ২২ নং টার্নার স্ট্রীটে ছিল 'নবযুগ'-এর ছাপাখানা এবং ৬ নং টার্নার স্ট্রীটের নীচের তলার দুখানা ঘরে 'নবযুগ'-এর অফিস। পত্রিকাটির যুগ্মসম্পাদনায় ছিলেন মুজফ্ফর আহ্‌মদ ও নজরুল ইস্‌লাম।

বিশেষ করে নজরুলের লেখার গুণেই 'নবযুগ' অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ফজলুল হক্ সাহেবের খোঁড়া মেসিনে ছাপিয়ে এর চাহিদা মেটানো যেত না।

'নবযুগ' বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল, তেমনি সকলের সামনে কৃষকমজুরদের দাবি ঘোষণা করতেও পরাঙ্মুখ হয় নি। এর ফলস্বরূপ 'নবযুগে'র জামিনের এক হাজার টাকা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। আবার দুহাজার টাকা জমা দিয়ে কাগজ বার করা হল। এই সময় নজরুল বিশেষ করে সাহিত্যিক বন্ধুদের চাপে 'নবযুগ'-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে দেওঘর চলে যান। দেওঘর যাবার আগে নজরুল 'বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন-পুরে' গানটি রচনা করে গেয়ে গেলেন। তাঁর গানটি শুনে মোহিতলাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। 'নবযুগে' নজরুল যে সব মর্মস্পর্শী ও প্রাণময় প্রবন্ধ ('ধর্মঘট', 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রভৃতি) লেখেন তাদের কয়েকটি সংকলিত হয়ে 'যুগবাণী' নামে একটি পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করে। পুস্তকটি ১৩২৯ সালের (১৯২২) কার্তিক মাসে গ্রন্থকার কর্তৃক ৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে রাজদ্রোহমূলকভাব লক্ষ্য করে সরকার এর প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করে দেন।

'নবযুগ'-এ যোগ দেওয়ার পরে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রথমে মার্কুইস লেনের একটি বাড়ীর দোতলায় একটি ঘরে থাকতেন এবং পরে ৮-এ, টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠে যান। টার্নার স্ট্রীটের বাড়ীতে অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তির সমাগম হত। মোহিতলাল তখন লেবুতলার একটি হাইস্কুলের হেড মাস্টার। তিনি ছুটির পরে প্রায়ই এই বাড়ীতে পদার্পণ করতেন। অনেক বিখ্যাত কবিতা নজরুল রচনা করেছিলেন এই বাড়ীতে বসেই।

'নবযুগে'র কাজ ছেড়ে দিয়ে নজরুল দেওঘরে গিয়ে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ওখানে গিয়ে নজরুলকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

॥ ৪ ॥

দেওঘর থেকে কলকাতায় ফেরার পরে নজরুল মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে আফজাল্-উল হক্ সাহেবের সঙ্গে থাকতেন। এই সময় 'ভিশ্তি বাদশাহ্,' 'বাবর' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা আলী আকবর খান নামে এক ব্যক্তি নজরুলকে তাঁর বাড়ী যেতে অনুরোধ করেন। আলী আকবরের বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধীন দৌলতপুর গ্রামে। আলী আকবর খান সাহিত্য সমিতির অফিসে নজরুলের আসার আগে থেকেই বাস করছিলেন। তিনি প্রথমে বিভিন্ন জেলার ছোট ছোট ভৌগোলিক বিবরণ লিখে প্রকাশ করতেন। পরে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে তিনি অন্য বই লেখা আরম্ভ করেন। নজরুল এই সব বইয়ের জন্যে 'লিচুচোর' ইত্যাদি কয়েকটি ছোটদের কবিতা লিখে দিয়ে ছিলেন। যাই হোক, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বারণ সত্ত্বেও একদিন নজরুল আলী আকবর খানের সঙ্গে তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দৌলতপুর যাবার পথে আলী আকবর সাহেব নজরুলকে নিয়ে কয়েকদিন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাসায় যান। ইন্দ্রকুমারের পুত্র বীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে এই বাড়ীতে আলী আকবর সাহেবের আসা যাওয়া ছিল। এই পরিবারে বীরেন্দ্রকুমারের মা, বাবা ও স্ত্রী ছাড়া তাঁর দুটি বোন ও একটি ছেলে ছিল। বীরেন্দ্রকুমারের মায়ের নাম বিরজা-সুন্দরী দেবী। এঁরা ছাড়াও ছিলেন বীরেন্দ্রকুমারের বিধবা জ্যেঠিমা গিরিবালা দেবী তাঁর একমাত্র সন্তান প্রমীলাকে (ডাক নাম দুলি) নিয়ে। এঁদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হলেও, সাহিত্য ও সংগীতের একটি সুস্থ ও প্রাণময় আবহাওয়া এই পরিবারটিতে বিরাজ করত। নজরুল সহজেই পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন এবং বিরজাসুন্দরী দেবীকে মা বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন। অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে নজরুল কয়েকদিন কুমিল্লায় অতিবাহিত করে গেলেন।

এর পর নজরুল সোজা গেলেন আলী আকবরের বাড়ীতে। এখানেও

নজরুল যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করলেন। আলী আকবর খানের এক বিধবা দিদি সংসারের সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তিনি নজরুলকে মায়ের মত স্নেহে আদরযত্ন করতে লাগলেন। আলী আকবর খানের আর একটি বিধবা বোন সেই পাড়াতেই থাকতেন। তাঁর একটি পুত্র ও বিবাহযোগ্যা একটি কন্যা ছিল। নজরুলের থাকাকালীন তিনি এই বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। সেই বিবাহযোগ্যা মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পরে উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মলাভ করে। অবশেষে উভয়ের বিবাহ স্থির হয় এবং কলকাতার বন্ধুরা এই বিয়ের খবর জানতে পারেন। এ বিয়েতে বন্ধুদের মোটেই মত ছিল না।

এই সময় নজরুল আলী আকবর খানের আচরণে এবং বাগ্‌দত্তা মেয়েটির কোন কোন ব্যবহারে অপমানিত বোধ করেন। ইতোমধ্যে বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়ে বিরজাসুন্দরী দেবী তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র সেনগুপ্তকে নিয়ে দৌলতপুরে গিয়ে বিয়েবাড়ীতে উপস্থিত হন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল তাঁর অপমানের কথা খুলে বললে তিনি তাঁকে এ বিবাহ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু অতিথিঅভ্যাগত এসে যাওয়ায় নজরুল বিয়ের মজলিসে বসতে বাধ্য হন এবং আকৃদও (বিবাহ-বন্ধন) হয়ে যায়। তারপরই নজরুল বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে নৌকা করে দৌলতপুর ত্যাগ করেন এবং যথাকালে কুমিল্লায় কান্দিরপাড়ে পৌছোন। এইখানে গোমতী তীরের আনন্দময় স্মৃতি নজরুলের 'চৈতী হাওয়া,' 'পূজারিণী' প্রভৃতি কবিতায় রূপ পেয়েছে।

পরবর্তীকালে নজরুল তাঁর প্রথম প্রণয়িনীকে যে প্রাণস্পর্শী পত্র লেখেন তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করলে ব্যর্থপ্রেমের আঘাতে উদ্দীপ্ত কবিমানসকে বোঝা সহজ হবে।

"কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পেয়েছি সেদিন নববর্ষার নবঘনসিক্ত প্রভাতে। মেঘমেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা' তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে রেবানদীর তীরে মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ়

আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে এনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে।

আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা' দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাই নি। তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না, আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।......

নিত্যশুভার্থী

নজরুল ইস্‌লাম" ১

এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম বিবাহের মর্মন্তুদ ঘটনা নজরুলের সৃষ্টিপ্রতিভাকে উদ্বোধিত করেছিল।

কুমিল্লা থেকে নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে পত্র লিখলে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা যাতায়াতের খরচ বাবদ সংগ্রহ করে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়ীতে যান। কুমিল্লায় দুদিন থেকে নজরুলকে নিয়ে তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন ১৯২১ সালের জুন বা জুলাই মাস (১৩২৮ সালের আষাঢ় মাস) হবে।

এই সময় দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। দৌলতপুরের ঘটনায় প্রচণ্ড আঘাতে নজরুলের মর্মবাণী দীপক রাগে বেজে উঠেছিল। এর ফলস্বরূপ নজরুল কতকগুলি বহ্নিদীপ্ত কবিতা লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কুমিল্লা থেকে কলকাতায় ফিরে নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে ৩/৪-সি, তালতলা লেনের বাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। এই বাড়ীতে নজরুলের কবিজীবনের একটি স্মরণীয় পর্বের উন্মোচন হয়। এই বাড়ীর নীচের তলার দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরটিতে বসে দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে তিনি সারারাত জেগে তাঁর সুখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিলেন। এই সময় মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের মন কষাকষি চলছিল, কিন্তু একবারে ছাড়াছাড়ি হয় নি। এ বিষয়ে পরে বলা হবে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল উভয়েই এই সময় চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে যখন ব্রিটেনের যুবরাজ ভারতে আসেন, তখন নজরুল একবার কুমিল্লায় যান।

---

১ শামসুন্ নাহার মাহমুদ : নজরুলকে যেমন দেখেছি : কলকাতা ১৯৫৮ : পৃ ১৮-৯

১৯২২ সালের প্রথমে নজরুল আর একবার কুমিল্লায় গিয়ে বেশ কিছুকাল থেকে আসেন। এইসময় বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর ভগিনী প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের প্রণয়ের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। 'বিজয়িনী' কবিতাটি এই সময়ে রচিত। এর মধ্যে নজরুলের প্রেমজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। এই কবিতাটি নজরুলের 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া' এই উভয় কাব্যগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। 'ছায়ানট' উৎসর্গীকৃত হয়েছে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কুতুবুদ্দীন আহ্মদ সাহেবের নামে। কুমিল্লায় অবস্থান কালে নজরুল কলকাতার দৈনিক 'সেবকে'র নিকট থেকে একটি পত্র পান। এই পত্রে নজরুলকে কলকাতায় এসে উল্লিখিত কাগজে লিখতে অনুরোধ করা হয়। এই পত্রের সম্পাদক মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তখন জেলে। নজরুল কলকাতায় এসে দৈনিক 'সেবকে' লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় হাফিজ মস্উদ আহ্মদ নামে একজন ভদ্রলোক মাত্র আড়াই শত টাকা যোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নজরুলকে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করেন। নজরুল সবদিক ভালভাবে না ভেবেচিন্তেই ভদ্রলোকের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। কাগজের নাম স্থির হয় 'ধূমকেতু'।

১৩২৯ সালের (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই অগস্ট) শ্রাবণ মাসে হপ্তায় দুবার দেখা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'ধূমকেতু' আত্মপ্রকাশ করে। কাগজের সারথি, কাজী নজরুল ইস্লাম ও ম্যানেজার, শান্তিপদ সিংহ। ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে আফজাল্-উল হক্ সাহেবের ঘরে অফিস স্থাপিত হয়। প্রিণ্টার-পাবলিশার হন আফজাল্-উল হক্ সাহেব। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর 'ধূমকেতু'র অফিস ৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ীর দোতালায় উঠে যায়। 'ধূমকেতু' ক্রাউন ফোলিও (১৫" × ১০") সাইজের আটপৃষ্ঠার কাগজ। প্রতি সংখ্যার দাম এক আনা এবং বার্ষিক চাঁদা পাঁচ টাকা মাত্র। শান্তিপদ সিংহ মোহিতলালের ছাত্র ছিলেন।

'ধূমকেতু'কে নানাভাবে সাহায্য করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূপতি মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি পরিচালনার অনেকখানি দায়িত্বই বহন করতেন। অপরাপর ব্যক্তির মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলার বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুজফ্ফর আহ্মদ 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

চট্টোপাধ্যায় 'ত্রিশূল' ছদ্মনামে 'ধূমকেতু'তে লিখতেন। 'ধূমকেতু'র আড্ডায় যাতায়াত করতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, গোপীনাথ সাহা, হুমায়ুন কবির, গোলাম মোস্তাফা, রেজাউল করিম প্রভৃতি।

প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপরে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের যে আশীর্বাণীর ব্লকটি থাকত তা এই—

"কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্‌না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'।
আছে যারা অর্ধচেতন!

২৪শে শ্রাবণ
১৩২৯ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

'ধূমকেতু' বার করার উপলক্ষে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,

২৪শে শ্রাবণ, শিবপুর

"কল্যাণীয়বরেষু,

তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

'নবযুগে'র সম্পাদনাকালে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নিবিড় সংস্পর্শে নজরুল প্রধানত শ্রমজীবী জনসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'নবযুগে' প্রকাশিত 'ধর্মঘট,' 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন,' 'মুখবন্ধ' প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। 'ধূমকেতু'র মধ্যে সন্ত্রাসবাদী

বিপ্লবী আন্দোলনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখানে লক্ষ্য ছিল প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়।

'ধূমকেতু'র ১৩শ সংখ্যায় (শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন ১৩২৯। ১৩ই অক্টোবর ১৯২২) নজরুল লিখেছিলেন,

"প্রথম সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে 'সারথির পথের খবর' প্রবন্ধে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করেছিলাম, যা বলতে চাই, তা বেশ ফুটে ওঠে নি মনের চপলতার জন্যে।... ...

সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজটরাজ বুঝিনা, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।"

সে যুগে এমন খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট অথচ দৃঢ় ভাষায় পূর্ণ স্বরাজের দাবি করা সত্যই বিস্ময়কর সাহসিকতার পরিচয়। অসহযোগ আন্দোলনের চাপে যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, নজরুল তাকেই আবার পূর্ণজ্যোতিতে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন। নজরুলের বরাবরই সন্ত্রাসবাদের প্রতি আন্তরিক টান ছিল। শিয়াড়শোল রাজস্কুলে পড়ার সময় বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সংস্পর্শে তাঁর মধ্যে সন্ত্রাসবাদের প্রতি আসক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়।

যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সন্ত্রাসবাদীরা 'ধূমকেতু'কে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত 'ধূমকেতু' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র বিভিন্ন সংখ্যায় মোহররম' (৭ম সংখ্যা, ১৬ই ভাদ্র ১৩২৯), 'বিষ-বাণী' (৮ম সংখ্যা, ২৬শে ভাদ্র ১৩২৯), 'আমি সৈনিক' (১৮শ সংখ্যা, ১৪ই কার্তিক ১৩২৯), 'ভিক্ষা দাও' (২০শ

সংখ্যা, ২১শে কার্তিক ১৩২৯) প্রভৃতি যে সকল অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করে সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি সংকলিত হয় কবির 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' নামক গ্রন্থদ্বয়ে।

'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গানে'র কয়েকটি কবিতাও 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়।

'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত অনেক অগ্নি-ক্ষরা প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়েই নজরুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা করা হল 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতাটি নিয়ে। কবিতাটির আরম্ভ—

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী?"

শেষের কয়েকটি পংক্তি—

"বছর বছর এ অভিনয়—অপমান তোর, পূজা নয় এ,
কি দিস আশিস কোটি ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
অনেক পাঁঠা-মোষ খেয়েছিস, রাক্ষসী তোর যায় নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তিপূজা
দূর করে দে, বল মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেইদিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনী সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ম্যয় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রাণীর মা-দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী!!"

নজরুলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হবার আগেই তিনি কুমিল্লায় চলে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয়। কলকাতার তদানীন্তন চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার সুইনহোর আদালতে নজরুলের বিচার হয়। মলিন মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে নজরুলপক্ষের উকিল হন। ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী সুইনহো মামলার

রায় দেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুলের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। এবার দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বিশেষ শ্রেণী কয়েদীরূপে পরিগণিত হয়ে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হলেন।

নজরুল আদালতে যে জবানবন্দী দেন তা এদেশের রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। জবানবন্দীটি ১৩২৯ সালের (১৯২৩) ১৩ই মাঘ তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকাকারে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে বের হয়েছিল। জবানবন্দীটির কিয়দংশ এখানে আহরণ করা যেতে পারে।

"আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজ-কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে—রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা।

একজন—রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন—সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত, রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে-সত্য—জাগ্রত ভগবান।...

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান অনির্বাণ সত্যস্বরূপ।...

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষখেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্তঊষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে

জীবন ; তাই আমাদের উভয়ের অস্তভারা আর উদয়তারার আলোর মিলন হবে কিনা বল্‌তে পারি না।…

আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব মাভৈঃ! ভয় নাই।

প্রেসিডেন্সি জেল ; কলিকাতা
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩
রবিবার—দুপুর।"

নজরুলের এই জবানবন্দী সাহিত্য হিসেবেও অনবদ্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শ না পেলে ভাষা এমন শাণিত, আবেগদীপ্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে না।

নজরুল 'ধূমকেতু'র সম্পাদনা করেছিলেন প্রথম বর্ষের ২১শ সংখ্যা (২৮শে কার্তিক, ১৩২৯) পর্যন্ত। ২২শ সংখ্যা (১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) থেকে 'ধূমকেতু'র সারথি হন অমরেশ কাঞ্জিলাল। ৩২শ সংখ্যায় (১৩ই মাঘ, ১৩২৯) কাজী নজরুল সম্পর্কে সম্পাদক লেখেন,

"নজরুল আমাদের লক্ষ্মীছাড়া দলের চরম লক্ষ্মীছাড়া। সে বাঁধন-হারা খ্যাপা, কিন্তু অক্লান্ত কর্মী। সে রোজগার করে মুঠো মুঠো টাকা, আর খরচ করে জলের মত, দেশকালপাত্রের বন্ধন তার নেই, যেখানে সেখানে যখন তখন। খাবার বেলায় প্রায়ই ভাতে, পোড়া, ফ্যান, নুন ; শোবার বেলায় প্রায়ই ছেঁড়া কম্বল, ছেঁড়া কাঁথা, শ্মশানঘাটের মত বালিশ অথবা কাগজের তাড়া উপাধান।"

এই তো গেল নজরুলের ছন্নছাড়া জীবনের বর্ণনা। নজরুলের চরিত্রের বিষয়েও সম্পাদকের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"নজরুলের সঙ্গে একবার যাঁহার আলাপ হয়, তাঁহার তাঁহাকে ভোলা একেবারে অসম্ভব, সে একাই একশো। যেখানে সে যায়, গানে বাজনায় হাসিতে খুসিতে, ভাজিতে চুরিতে, হট্টগোলে সেখানে একটা একটা হাট পত্তন করে ফেলে। মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, যুবা তার হাত থেকে কারও এড়ান নেই!"

কয়েকটি সংখ্যা চলার পর 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩৮ সালের

৫ই ভাদ্র (২২শে অগস্ট ১৯৩১) 'ধূমকেতু'র পুনরায় উদয় হয়েছিল। তখন এর সম্পাদক হন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক এবং সহ-সম্পাদক চণ্ডীচরণ গুপ্ত।

নজরুল ১৩৩৮ সালের ৫ই ভাদ্র সংখ্যায় 'ধূমকেতুর আদিউদয়-স্মৃতি' শীর্ষক একটি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। এই স্মৃতিকথার মধ্যে 'ধূমকেতু'র আদর্শ, তার বিপদসঙ্কুল জয়যাত্রার পথ, তার সফলতা বিফলতার আভাস আছে। নব পর্যায়ের 'ধূমকেতু'র সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগের স্বরূপও উল্লিখিত হয়েছিল এই স্মৃতিকথায়। সেই হিসেবে এই স্মৃতিকথাটি মূল্যবান এবং অবশ্য পঠিতব্য।

"প্রায় দশ বছর আগের কথা। স্মৃতি-মঞ্জুষায় সে কথা হয়ত আজ ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে।

১৩২৯ সাল, শ্রাবণ মাস—"তিমির-ভালে অলক্ষণের তিলক রেখা"র মতই 'ধূমকেতু'র প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধূলোট উৎসব পুরোমাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশে ধরে না, 'বন্দেমাতরম্‌', 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' রব আকাশে বাতাসে আর ধরে না! মার খাইয়া খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশের হাতে খিল ধরিয়া গিয়াছে! মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আর মারে না, পলাইয়া যায়।

ইহারই মাঝে স-প্রমথ প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশের নেতা, অপ-নেতা, হবু-নেতা সকলে যখন বড় বড় দূরবীণ লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন আমার উপর শিব ঠাকুরের আদেশ হইল—এই আনন্দ রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমার হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন—'ধূমকেতু'র ভয়াল নিশান। স্বরাজপ্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

আমার ভয় ছিল না; আমার পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়-নাথ।

'ধূমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছিল কিনা জানি না, সে অকল্যাণের প্রতীক হইয়াই আসিয়াছিল। 'ধূমকেতু' তাহাদেরি বাণী লইয়া আসিয়াছিল—যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়,

ফণী তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথের দিশারী হয়, পিতামাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন-শীতল হইয়া যায়।

রুদ্রদেব আশীর্বাদ করিলেন, আমার কারাশুদ্ধি-হইয়া গেল।- প্রয়োজনের আহ্বানে, নটনাথের আদেশে আমি নিশান-বর্দার হইয়াছিলাম, তাঁহারি আদেশে 'ধূমকেতু' অন্ধ বিমানপথে হারাইয়া গিয়াছে।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিক আবার 'ধূমকেতু'কে আহ্বান করিতেছে। কোনরূপে এই 'ধূমকেতু'র উদয় হইবে জানি না, তবু আশা আছে—যে ধূর্জটির জটাজুটে 'ধূমকেতু' ময়ূরপাখা, সেই ধূর্জটির রুদ্র আশীর্বাদ সে লাভ করিবে, এ যুগের প্রলয়েশ তাহাকে নবপথে চালিত করিবেন। আমি ইহার অগ্নিশিখায় সমিধ যোগাইব মাত্র।"

'ধূমকেতু'র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে নজরুলের অনেকগুলি গান ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ ৫ ॥

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুল কিছুদিন বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবেই ছিলেন। এই সময় অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাওয়াতে সরকার তাঁদের নীতি পরিবর্তন করে স্থির করলেন যে, খুব স্বল্পসংখ্যক কয়েদীকেই শুধু বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে রাখা হবে আর বাকী কয়েদীদের সাধারণ কয়েদী হিসেবে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠানো হবে। সেন্ট্রাল জেলের বন্দীদের সকলকেই বলা হল যে, তাঁদের বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা শ্রেণীবিভাগের খবর জানতে পেলেন না। পরিশেষে একদল বন্দী যাঁরা সাধারণ শ্রেণীর বন্দী ব'লে গণ্য হয়েছেন তাঁদের নৈহাটি স্টেশনে নামিয়ে হুগলী জেলে নিয়ে গিয়ে সাধারণ কয়েদীর পোষাক জাঙিয়া ও খাটো কুর্তা পরিয়ে দেওয়া হল। এই অত্যাচারিত ও প্রবঞ্চিত বন্দীদের দলে নজরুলও ছিলেন।

হুগলী জেলে কয়েদীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করা হত। নজরুল গানে, আবৃত্তিতেও হাসির হুল্লোড়ে এই নৈরাশ্যপূর্ণ পীড়িত আবহাওয়ার মধ্যে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করতেন। এই সময় হুগলী জেলের

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন আর্স্টন্ নামে এক ইংরেজ। নজরুল রবীন্দ্রনাথের "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে" গানটির প্যারডি করে 'সুইপার বন্দনা' নামে একটি গান রচনা করেন। 'ভাঙার গান' গ্রন্থে এই গানটি সংকলিত হয়েছে। গানটির ফুটনোটে নজরুল লিখেছেন,

"হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।"

এই জেলের অকথ্য অত্যাচারের পরিবেশে তিনি 'শিকলপরার গান', 'সেবক', 'বন্দী-বন্দনা', 'মরণ-বরণ', ইত্যাদি বিখ্যাত গান ও কবিতা রচনা করেন।

শেষ পর্যন্ত যখন অত্যাচার চরমে পৌছল, তখন নজরুল ও অন্যান্য বন্দীরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে অবস্থা সম্মান-জনক না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ধর্মঘট থামবে না। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নজরুলকে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত টেলিগ্রামে নজরুল সম্পর্কে তাঁর ধারণার উজ্জ্বল পরিচয় দীপ্যমান ছিল। নজরুল যখন হুগলী জেলে তখন রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করেছিলেন—"Give up hunger strike, our literature claims you." টেলিগ্রাম করা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায়। 'Addressee not found' বলে কর্তৃপক্ষ সে টেলিগ্রামকে হুগলীতে নজরুলের কাছে না পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাজেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পুস্তকটি হুগলী জেলে তাঁর কাছে নিয়ে যান। নাটকটির উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল, 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইস্লাম, কল্যাণীয়েষু'। তার নীচে কবি কাঁচা কালিতে তাঁর নাম স্বাক্ষর করেছিলেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্র এক পত্রে নজরুল সম্পর্কে লিখেছিলেন, "একজন সত্যকার কবি, রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।"

অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করেও নজরুলের উপবাস ভাঙাতে পারলেন না। নজরুলের মা তাঁর সঙ্গে জেলে দেখা করেন, কিন্তু তিনি মায়ের অনুরোধেও অনশন ভঙ্গ করতে রাজী হন নি। নলিনীকান্ত সরকার ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। শেষ পর্যন্ত কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে নজরুল আহারে সম্মত হন। ৩৯ দিন পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু বলার সুবিধের জন্যে তিনি চল্লিশ দিন অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন বলে ঘোষণা করা হল। কর্তৃপক্ষ বন্দীদের অনেক দাবি মেনে নেন। হুগলী জেলে নজরুলের সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়ার মৌলবী আফসারউদ্দীন আহ্‌মদ, নেপালী-নেতা সর্দার দল বাহাদুর সিং, বরিশালের সতীন্দ্রনাথ সেন, পণ্ডিত রামসুন্দর সিং, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।

হুগলী জেল থেকে নজরুলকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানকার জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত ভৌমিক তাঁকে একটি হারমোনিয়াম পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়ম পেয়ে তিনি খুব খুশী হন এবং গান গেয়ে ও কবিতা লিখে বেশ আনন্দেই সময় কাটাতে থাকেন। জেল থেকেই নজরুল বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। এই সময় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ছোট বড় যে কোন আকারের কবিতার জন্যে দশ টাকা হিসেবে সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নজরুলকে উৎসাহিত করেছিলেন। তখনকার দিনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বলতে গেলে আর কেউ কবিতা লিখে টাকা পেতেন না। সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে নয়, কবি ও গ্রন্থকার হওয়ার সম্মান-স্বরূপ নজরুল বহরমপুর জেলে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

জেল জীবনের প্রথম দিকে সম্ভবত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালে নজরুলের সুখ্যাত কবিতা 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' ১৩৩০ সালের (১৯২৩) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'কল্লোলে' ছাপা হয়। ঐ সংখ্যার পরিচয়-লিপিতে ছিল,

"বন্দী-কবি নজরুল 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' আত্মহারা হয়ে যে সুরলহরী তুলেছেন, আপনাদের সেই সুখের ভাগ দেবার জন্যে নিমন্ত্রণ করছি।"

॥ ৬ ॥

জেল থেকে বেরিয়ে (১৫ই অক্টোবর, ১৯২৩) নজরুল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর যান (১৩৩০ সাল, ১১ই ফাল্গুন)। এখানে তিনি চার দিন অবস্থান করেছিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা। অধিবেশনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দিনের সকালে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে নজরুল কয়েকটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে সকলকে আপ্যায়িত করেন। অপরাহ্নে পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয়। তৃতীয় দিনের বিকেলে মহিলারা পৃথকভাবে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ঐ দিনই সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভায় মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে সম্মান দেখান। চতুর্থ দিনের বিকেলে একটি সভায় মৌলবীরা কোরান থেকে আয়েত উদ্ধৃত করে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। এই রকম সম্মান, হৃদ্যতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জীবিতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটেছে কিনা বলা কঠিন। নজরুল মেদিনীপুরবাসীদের এই সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা ও প্রীতি কখনও বিস্মৃত হন নি। স্বাধীনতাসংগ্রামে মেদিনীপুরের গৌরবময় স্থানের কথাও তাঁর মনে জাগরূক ছিল। তাঁর 'ভাঙার গান' মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করে তিনি মেদিনীপুরবাসীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তাকে দুর্লভ মর্যাদায় মণ্ডিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজা দেবেন্দ্রলাল খানের উদ্যোগে আয়োজিত এক শিল্পপ্রদর্শনীতে যোগ দেবার জন্যে নজরুল ও তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার আর একবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে নজরুল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল কলকাতার ৬, হাজী লেনের বাড়ীতে নজরুলের সঙ্গে

গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তর বিবাহ হয়। এই বিবাহে বিশেষ-ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন 'চানাচুর' প্রবন্ধ ও 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িত্রী মিসেস এম, রহমান (হুগলীর সরকারী উকিল খান বাহাদুর মজ্‌হারুল আন্‌ওয়ার সাহেবের কন্যা) এবং মঈনউদ্দীন হোসায়ন সাহেব (নূর লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী)। নজরুল মিসেস রহমানের নামে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে লেখা হয় যে, বাঙলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব কবির জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম, রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন রহমান সাহেবার নাগ-শিশু কাজী নজরুল ইস্‌লাম। গ্রন্থারম্ভের পূর্বে রহমান সাহেবার নামে একটি উৎসর্গ-কবিতা ছিল। উৎসর্গ-কবিতার শেষে নজরুল লিখেছিলেন,

"শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি!"

'বিষের বাঁশী'র প্রচ্ছদপট এঁকে দেন নজরুলের 'ঝড়ের রাতের বন্ধু' 'কল্লোল'-সম্পাদক কবি দীনেশরঞ্জন দাশ। প্রকাশের কিছুকাল পরেই সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন।

নজরুলের এই বিবাহ অনেকে পছন্দ করেন নি। প্রায় গোটা ব্রাহ্ম-সমাজ নজরুলের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। তবে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি কোন কোন মান্যব্যক্তির সঙ্গে নজরুলের হৃদ্যতার ভাব অক্ষুন্ন ছিল। কারা বরণের জন্যে নজরুলের জনপ্রিয়তা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। কারামুক্তির পর নজরুল বহু অভিজাতমণ্ডলীতেও নিমন্ত্রিত ও অভিনন্দিত হতে থাকেন। তাঁর নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির চাহিদা এই সময় আশ্চর্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই সময় তারকেশ্বরের মোহান্তকে বিতাড়িত করবার অভিপ্রায়ে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মোহের যার অন্ত নেই সেই পূজারী মোহান্তকে নিয়ে লেখা 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান'-এ নজরুল পুণ্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত মোহান্তকে নির্মম ব্যঙ্গের শরে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। গানটি 'ভাঙার গান' পুস্তকে স্থান পেয়েছে। গানটির কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"এই সব ধর্ম-ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব'সে।

সে যে   পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প'শে।

আর   ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই, যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী!

জাগো বঙ্গবাসী ॥"[১]

ভূপতি মজুমদারের চেষ্টায় নজরুল সস্ত্রীক হুগলীতে যান। কিন্তু হুগলীতে কেউ তাকে বাড়ী ভাড়া দিতে রাজী হল না। তখন হুগলীর বিপ্লবী দেশসেবক বীরেন ঘোষ তাঁর দাদা খগেন ঘোষের কাঠঘড়ার বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু এখানে তাঁর নানা অসুবিধা হতে লাগল। তখন ভূপতিবাবু নজরুলকে হামিদুন্নবী মোক্তারের বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই বাড়ীতেই তাঁর প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই পুত্রটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

এই বাড়ীতে বহু শিল্পী সাহিত্যিকের সমাগম হত। গোপীনাথ সাহার মত বিপ্লবী দেশভক্ত সন্তানেরা তাঁর কাছে সস্নেহ প্রেরণা লাভ করতেন। প্রথম পুত্রের জন্ম উপলক্ষে নজরুল যে উৎসবের আয়োজন করেন তাতে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই যোগদান করেছিলেন।

১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় (১৯২৫, ১৬ই জুন) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন দার্জিলিঙে দেহত্যাগ করেন, তখন নজরুল হুগলীর বাড়ীতেই ছিলেন। পরের দিনই তিনি দেশবন্ধুর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে 'অর্ঘ্য' শীর্ষক একটি গান রচনা করেন। গানটি অপূর্বসুন্দর। তাঁর 'চিত্তনামা' গ্রন্থে এটি প্রথমেই স্থানলাভ করেছে। পুস্তকটি মাতা বাসন্তীদেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে উৎসর্গীকৃত। হুগলী থেকে তিনি নিজেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। দেশবন্ধুর শবাধারে রচনাটি মালার সঙ্গে অর্ঘ্য হিসেবে আটকে দেওয়া হয়েছিল। 'চিত্তনামা' গ্রন্থের অপর কবিতা 'অকাল-সন্ধ্যা' লেখা হয় ৬ই আষাঢ় এবং 'সান্ত্বনা' ১৬ই আষাঢ়। 'অকাল-সন্ধ্যা' কবিতাটি আরিয়াদহে রচিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গীত হয়। হুগলী ও চুঁচুড়ার অধিবাসীরা একযোগে চুঁচুড়ার কৈরী টকী হাউসে ১৮ই আষাঢ় চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির উদ্দেশে যে শোকসভার আয়োজন করেন, তার জন্যে তিনি ১১ই আষাঢ় 'ইন্দ্রপতন' নামক বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করে দেন। 'ইন্দ্রপতন' কবিতাটি আবৃত্তি করে সভার উদ্বোধন করা হয়। তিনি ১৭ই আষাঢ় 'রাজভিখারী' শীর্ষক যে গানটি রচনা করেছিলেন সেইটি স্বকণ্ঠে উক্ত সভায় গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

---

১ নজরুল ইস্‌লাম : ভাঙার গান দ্বিতীয় মুদ্রণ : কলিকাতা ১৯৪৯ : পৃ ১৬

'কল্লোলে'র একটি পুস্তক-প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল ২৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। সেখানে বিক্রয়ার্থ 'বিষের বাঁশী'র কয়েকটি কপি রাখার জন্যে পুলিশ হানা দেয়। এই সময় বইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু বইটি নিষিদ্ধ হলেও ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে তার শত শত কপি বিক্রী হয়। এইখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি 'বিষের বাঁশী'র অন্তর্গত 'চরকার গান' গেয়ে গান্ধীজীকে মুগ্ধ করেন।

হুগলীতে নজরুল হামিদুন্নবী মোক্তারের বাড়ী থেকে চক্ বাজারের রোজভিলার একটা অংশে উঠে আসেন। এইখানে একটি বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডা জমে উঠেছিল। এই আড্ডায় যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে সুবোধ রায়, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আবদুল হালিম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মিসেস রহমান প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হুগলীতে অবস্থানকালে নজরুলকে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি একবার জল-বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি যখন জ্বরে নির্জীব হয়ে পড়েছেন, এমন সময় আকাশ পৃথিবী কাঁপিয়ে এল প্রবল ঝড়। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেই 'ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)' কবিতাটি রচনা করে ফেললেন। কবিতাটি 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা হিসেবে গ্রথিত হয়েছে।

১৩৩২ সালের (১৯২৫) আষাঢ় মাসে নজরুল বাঁকুড়া যুব ও ছাত্র সমাজ এবং বাঁকুড়ার গঙ্গাজল ঘাটি জাতীয় বিদ্যালয় এই উভয় জায়গা থেকেই একসঙ্গে নিমন্ত্রণ পান। ঠিক হল যে, তিনি প্রথমে গঙ্গাজল ঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে বাঁকুড়া শহরে যুব ও ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করবেন। গঙ্গাজল ঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়টি 'অমর কানন' নামে পরিচিত, কেননা 'অমর' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবকের অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবার পূর্বে তিনি 'অমর কানন' নামে একটি গান রচনা করেন। গানটি তাঁর 'ছায়ানট' গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। প্রথমে গঙ্গাজল ঘাটি হয়ে তিনি বাঁকুড়া স্কুলডাঙার কলেজ প্রাঙ্গণে যুব ও ছাত্র সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তাঁর বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান'-এর আটশত কপি বিক্রি হয়। সম্মেলন শেষ হলে তিনি বিষ্ণুপুর দেখতে যান। বিষ্ণুপুরের রাজারা যে এককালে স্বাধীন ছিলেন, তারই সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপুরের গড়, কামান ইত্যাদি। নজরুল

গড়ের নিকটবর্তী বিরাটকায় 'দলমাদল' (ভাল নাম 'দমুজমর্দন') কামান দেখে তাকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে আলিঙ্গন করেন। পরে কামানের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি একটি ফটো তোলান। এই ফটোটি নজরুলের 'চিত্তনামা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এবং কয়েকটি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শ্রমিকের গান'-এ নজরুল এই দলমাদলের উল্লেখ করেছেন।

"মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥"[১]

হুগলীতে থাকাকালীন নজরুল সক্রিয়ভাবে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নজরুল এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হন। ১৯২৫ সালের শেষাশেষি কলকাতায় যে একটি নূতন পার্টি গঠিত হয়, তার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার, কুতবউদ্দীন আহ্মদ, শামসুদ্দীন হোসায়ন ও নজরুল ইস্‌লাম। এই পার্টির নামকরণ হয় ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress)। মজুর স্বরাজ পার্টি গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'লাঙল' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান পরিচালক ও সম্পাদক হিসেবে যথাক্রমে নজরুল ইস্‌লাম ও মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম কাগজে ছাপা হত। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'লাঙলে'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। 'লাঙলে'র অফিস ছিল কলকাতায় ৩৭ নং হ্যারিসন রোডের দোতালার উত্তর কোণের ঘরে। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের সুখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরে 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী 'লাঙল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় নজরুলের 'কৃষকের গান' কবিতাটি বের হয়। ৮ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় তাঁর 'সব্যসাচী' কবিতাটি আত্মপ্রকাশ করে।

১ নজরুল ইস্‌লাম : সর্বহারা পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ : কলিকাতা ১৯৫৩ : পৃঃ ১৩

১৩৩২ সালের (১৯২৫) ৮ই আশ্বিন 'কল্লোলে'র সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ দার্জিলিঙে মারা যান। তাঁর স্মৃতিতে নজরুল ৩০শে কার্তিক একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'কল্লোলে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা হয়।

এই সময়ে মোহিতলাল প্রমুখ অনেকে তাঁর কাব্যের অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেন। সজনীকান্ত দাস নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে ব্যঙ্গ করে 'শনিবারের চিঠি'তে 'ব্যাঙ' (৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৪) শীর্ষক একটি কবিতা লেখেন। নজরুল মনে করলেন যে এটি মোহিতলালের রচনা। তাই তিনি তার প্রত্যুত্তর দেন 'সর্বনাশের ঘণ্টা' কবিতাটিতে। কবিতাটির লক্ষ্য প্রধানত মোহিতলাল। কবিতাটি ১৩৩১ সালের (১৯২৪) কার্তিক সংখ্যার 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরে 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মোহিতলাল তখন অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে 'দ্রোণ-গুরু' কবিতায় নজরুলকে অসংযত ও অসহিষ্ণু ভাষায় আক্রমণ করেন।

এইখানে নজরুল ও মোহিতলালের বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যিকদের মধ্যে রেষারেষি ও অসহিষ্ণুতার একটি স্পষ্ট চিত্র এর মধ্যে পাওয়া যাবে। ১৩২৭ সালের আষাঢ় মাসের (১৯২০) 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের 'বাদল-প্রাতের শরাব' (হাফিজের ভাব ও ছন্দ অবলম্বনে) কবিতা পড়ে মোহিতলাল কবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরপর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'খেয়াপারের তরণী' পাঠ করে মোহিতলালের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে উক্তপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র লেখেন। পত্রটি ১৩২৭ সালের ভাদ্রমাসের 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এই পত্র পাঠে উৎসাহিত হয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নজরুল আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় মোহিতলালের কাছে গিয়েছিলেন। তারপর মোহিতলালের সঙ্গে প্রায়ই নজরুলের নানা আড্ডায় দেখা হত। ক্রমে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট প্রীতিসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতলালের সৌহার্দ্য ছিল না। তাই তিনি নজরুলকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখতে নিষেধ করতেন। মোহিতলাল বুদ্ধির দীপায়নের জন্যে নজরুলকে ব্রাউনিং, কীটস্, শেলী, বায়রণ প্রভৃতি কবির রচনা পাঠ করতে বলতেন। কিন্তু নজরুল এসব পড়তে

চাইতেন না। শেলীর কিছু কিছু কবিতা ছাড়া অন্য কবিদের লেখা তিনি প্রায় পড়তেনই না বলা চলে।

মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের প্রীতি সম্পর্কে শীঘ্রই ফাটল ধরল। একদিন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়ীতে মোহিতলাল 'মানসী' পত্রিকায় (পৌষ ১৩২১ সাল) প্রকাশিত তাঁর একটি কথিকা 'আমি' পাঠ করে নজরুলকে শোনান। এটা ১৯২০ সালের ঘটনা। এরপর নজরুলের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে মোহিতলাল বললেন যে, নজরুল তাঁর 'আমি' কথিকার ভাবৈশ্বর্য চুরি করেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেছেন। এই ঘটনার পরে উভয়ের সৌহার্দ্য ক্ষুণ্ণ হ'লেও একেবারে বিচ্ছেদ ঘটে নি।

ইতোমধ্যে নজরুল মোহিতলালের নিষেধ না শুনে 'প্রবাসী'তে লেখা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। 'প্রবাসী' থেকে নজরুলকে লেখার জন্যে সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হত। ১৯২৩ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে নজরুলের এক বছরের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড হ'লে জেল থেকেও তিনি 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপতে পাঠাতেন। জেল থেকে বেরুনোর পর নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের দেখা সাক্ষাৎ প্রায় হতই না। এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' নজরুলকে সর্বপ্রকারে আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। সজনীকান্ত দাস 'গাজী আব্বাস, বিটকেল' ও 'আবাহন' শীর্ষক কবিতাদুটিতে নজরুলকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রূপ করেন। বলতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান লক্ষ্যই ছিল নজরুল। এদিকে 'কল্লোল' প্রমুখ প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর মুখপত্রগুলি নজরুলকে সাদরে বরণ করে নিয়ে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। মোহিতলাল ক্রমেই নজরুলের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন এবং শেষে যোগদান করলেন 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীতে। এইভাবে নজরুল ও মোহিতলালের প্রীতি সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলল। তারপর 'শনিবারের চিঠি'তে 'ব্যাঙ' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর যা ঘটল তার কথা পূর্বেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা উচিত যে, মোহিতলাল ছিলেন মুখ্যত শিক্ষিত ও বিদগ্ধ সমাজের কবি আর নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করতেন প্রধানত জনসাধারণের জন্যে। সেদিক থেকে কাব্যাদর্শে উভয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই ছিল বেশী। সুতরাং উভয়ের হৃদ্যতা যে স্থায়ী হ'তে পারে না এতো জানা কথা।

॥ ৭ ॥

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে হেমন্তকুমার সরকার নজরুলকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হেমন্তবাবু নজরুলকে তাঁদের বাসভবনের একটি অংশ ভাড়া দিয়েছিলেন। হেমন্তবাবুদের গোয়ালপটীর বাসভবনটি পুরনো হওয়ার দরুন অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাই নজরুল চাঁদ সড়কের ধারে বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা একটা একতলা বাংলো প্যাটার্নের ভাল বাড়ীতে উঠে গিয়েছিলেন। নজরুলের 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাস এই বাড়ী ও তার পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করেই রচিত হয়। এইখানে ১৯২৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে নজরুলের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এর ভাল নাম রাখা হয় অরিন্দম খালেদ। এর ডাক নাম ছিল বুলবুল।

১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে (নদিয়া) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সভার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছাত্র ও যুবসমিতির সভাপতির পদে বৃত হন। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসু রাজবন্দী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কলকাতা ছাড়াও প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশের আবহাওয়া কলুষিত হয়ে উঠেছিল। রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে এই দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে। প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর হিন্দুমুসলমান প্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়। দাঙ্গার বিষাক্ত পরিবেশের জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়ে নজরুল যে উদ্বোধনী সংগীত 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' রচনা করেন তার তুল্য সংগীত বাংলায় খুব কমই রচিত হয়েছে। প্রাদেশিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজবাড়ীর সুবৃহৎ পূজাদালানে। নজরুল নিজেই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' উদ্বোধনী সংগীতটি গেয়েছিলেন। সেই সময়েই ছাত্র ও যুব সম্মেলনের জন্যে নজরুল 'ছাত্রদলের গান' রচনা করে দিয়েছিলেন।

এই সময় মজুরস্বরাজ পার্টির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মুজফ্ফর আহ্মদ কুতুব-

উদ্দীন আহমদ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করতে কৃষ্ণনগরে আসেন। এই সম্মেলনে নজরুল 'শ্রমিকের গান' নামে একটি গান রচনা করে নিজেই গেয়েছিলেন। এই গানটি তখন 'লাঙলে' ছাপা হয়েছিল। এই সম্মেলনেই লেবর স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল নামে যে দলটি গঠিত হয় তা আর কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে না।

'লাঙলে'র ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকমাস পরে পত্রিকাটিকে শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র করার জন্যে তার নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' রাখা হয়। মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্থলে গঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পাদক হন। গঙ্গাধরবাবু বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের সভ্য ছিলেন এবং ৩৭নং হ্যারিসন রোডের অফিসে মুজফ্ফর আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতেন। 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট তারিখে। সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে নজরুলের 'রক্তপতাকার গান', 'জাগর-তূর্য', ইণ্টারন্যাশনাল সংগীতের অনুবাদ প্রভৃতি ছাপা হয়েছিল। নজরুল কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। 'গণবাণী' অফিসেই সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়।

পূর্বেই বলেছি যে এই সময় কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের প্রবল দাঙ্গা চলছিল। নজরুল এই সাম্প্রদায়িকতায় মর্মাহত হয়ে কতকগুলি গান, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ,' 'পথের দিশা' ইত্যাদি কবিতা এবং 'মন্দির ও মসজিদ' প্রমুখ প্রবন্ধ এই সময়েই রচিত। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি প্রথমে ১৯২৬ সালের ২৪শে অগস্টের 'গণবাণী'তে প্রকাশিত এবং পরে 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়। 'পথের দিশা' শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের 'অগ্রদূত' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে।

১৯২৬ সালে ব্রিটেনে যে সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল নজরুল তাকে লক্ষ্য করে 'যা শত্রু পরে পরে' নামে কবিতা লেখেন। কবিতাটি প্রথমে বর্ধমানের 'শক্তি' পত্রিকায় ১৩৩৩ সালের (১৯২৬) আশ্বিন মাসে আত্মপ্রকাশ করে। পরে ১৯২৬ সালের ১২ই অক্টোবরের 'গণবাণী'তে সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

মঈনুদ্দীন বলেছেন যে অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে (কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন

রোডের নিকটে) মিশরের নর্তকী ফরিদার নৃত্যকলা ও উর্দু গজল শুনে নজরুল তাঁর বিখ্যাত গান 'আসে বসন্ত ফুলবনে, সাজে বনভূমি সুন্দরী' রচনা করেন।[১] গানটি ফরিদার কাছ থেকে শোনা উক্ত উর্দু গজলের সুরে প্রণীত। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসের 'সওগাতে'।

১৯২৬ সাল থেকে নজরুল গজল রচনায় মেতে ওঠেন। কিসের প্রেরণায় তিনি গজল গান রচনায় উৎসাহী হন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। নজরুলের বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন,

"এই সময় নজরুল রয়েছেন একদিন আমার বাড়ীতে। দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে উর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধুবর্ষণ করতে করতে। নজরুলের আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হ'ল। অনেকগুলো গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল। নজরুল তক্ষুনি বসলেন গান লিখতে। তাদের "জাগো প্রিয়া" গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হ'চ্ছে। এই গানের সুর অবলম্বন ক'রে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেল্‌লেন—"নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া, পরাণ পিয়া" গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে ব'সলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্যে কয়েকজন বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। নজরুল এজন্য কয়েকজন রাজনৈতিক চরমপন্থীর বিরাগভাজন হ'য়ে পড়লেন।"[২]

আগে থেকেই নজরুল কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই গান রচনা করতেন। তাঁর গজল গান প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আশ্চর্যরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নজরুলের গানগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে দিলীপকুমার রায়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। নজরুল রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে পুলিশের ভয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁর কোন গান রেকর্ড করতে সাহস পেত না। এই সময় হরেন্দ্র ঘোষই প্রথম নজরুলের নাম উহ্য রেখে তাঁর কবিতার অংশবিশেষ সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। এই রেকর্ড দুটি খুবই জনপ্রিয় হওয়ায় কোম্পানী

---

১ মুইনুদ্দীন : যুগ-স্রষ্টা নজরুল : ঢাকা ১৯৫৭ : পৃঃ ১৪৮-৯

২ নলিনীকান্ত সরকার : নজরুল (কবিতা : কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ : পৃঃ ৩২)

হরেন্দ্র ঘোষের গাওয়া গান দুটির জন্যে রয়ালটি বাবদ কয়েকশত টাকা নজরুলকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের জন্যে তাঁকে গান লিখে দিতে অনুরোধ করেন। এইভাবে গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে।

১৯২৬ সালের নবেম্বর মাসে ঢাকায় ইলেক্‌শান আরম্ভ হয়। কংগ্রেসের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় নজরুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ২৯শে নবেম্বর ফলাফল প্রকাশের কথা ছিল। এর পূর্বেই তিনি ২৩শে নবেম্বর কৃষ্ণনগরে ফিরে আসেন। ব্রজবিহারী বর্মনকে লেখা তাঁর ২৫শে নবেম্বরের পত্রে জানা যায় যে, কংগ্রেস তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে নি। এর ফলে নজরুল ইলেক্‌শানে পরাজিত হন।

কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন নজরুলকে খুবই দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর সুবিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতাটি কৃষ্ণনগরেই লেখা। 'প্রবর্তকের ঘুর চাকায়', 'এ মোর অহঙ্কার,' 'অগ্রপথিক' প্রভৃতি কবিতার জন্মস্থান কৃষ্ণনগরই। তাঁর 'কুহেলিকা' ও 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাস দুটি কৃষ্ণনগরে থাকাকালীনই লেখা। ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে (১৯২৭) কলকাতা থেকে মোহাম্মদ আফজাল্‌-উল হকের সম্পাদনায় মাসিক 'নওরোজ' প্রকাশিত হয়। 'নওরোজে' নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসের প্রথমাংশ এবং 'ঝিলিমিলি' ও 'সেতুবন্ধ' নাটিকা আত্মপ্রকাশ করে। পাঁচ সংখ্যা বের হবার পর 'নওরোজ' বন্ধ হয়ে গেলে 'কুহেলিকা' ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক 'সওগাতে' বের হতে থাকে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি 'সওগাতে'ই মুদ্রিত হয় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—ফাল্গুন, ১৩৩৬)। কৃষ্ণনগরেই ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল জন্মগ্রহণ করে।

১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের যে বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় কৃষ্ণনগর থেকে গিয়ে তার উদ্বোধন করেন নজরুল ইস্‌লাম। এই সভার সভাপতিত্ব করেন তাসাদ্দুক আহমদ সাহেব। পরের বছরেও তিনি ঢাকায় সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধক হন।

আফজাল্‌-উল হক্ সাহেব 'নওরোজ' নামে একটি মাসিক বের করলে নজরুল তাতে যোগ দেন। এর অর্থসংস্থানের ভার নেন বে-নজীর আহ্মদ সাহেব। কয়েকটি সংখ্যা বের হতেই পুলিশের হাঙ্গামায় 'নওরোজ' বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৩৫ সালের (১৯২৮) ১৫ই জ্যৈষ্ঠ নজরুলের মাতা পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণনগরে অর্থকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে নজরুল ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথম দিকে তিনি ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটের 'সওগাত' অফিসের নীচের তলার দুখানা ঘরে এসে ওঠেন। তারপর তিনি উঠে যান ইণ্টালী অঞ্চলে পানবাগান লেনের একটি বাড়ীতে। কিছুদিন এখানে থেকে উত্তর কলকাতার কয়েক জায়গায় বাসা বদল করে শেষে তিনি মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের একটি ছোট তিনতলা বাড়ীতে সংসার পাতেন। এই বাড়ীতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর চার বছরের প্রিয় শিশু বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। বুলবুলের রোগশয্যার শিয়রে বসেই নজরুল 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের তর্জমা শেষ করেন। বুলবুলের নামেই বইটি উৎসৃষ্ট হয়ে ১৯৩০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল তখন নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে অধ্যাত্মরাজ্যে শান্তির সন্ধানে ছুটলেন। তিনি বহরমপুর, লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বরদাকান্ত মজুমদারের শরণাপন্ন হলেন। বরদাকান্তবাবু ছিলেন গৃহীযোগী। বরদাবাবুর আনুকুল্যে নজরুল বিপুল প্রশান্তি লাভ করেন।

১৯২৬ সালের মাঝামাঝি নজরুল একবার চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। আর একবার তিনি যান ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে যখন কলকাতায় পানবাগান লেনে থাকতেন। এই চট্টগ্রাম সফরের ফলে জন্মলাভ করেছে 'সিন্ধুহিন্দোল' ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের কতকগুলি অনবদ্য কবিতা এবং ভাটিয়ালী সুরে বহু 'সাম্পানের গান'।

চট্টগ্রামে নজরুল মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের চট্টগ্রাম-থাকাকালীন জীবনযাত্রা সম্পর্কে হবীবুল্লাহ্ বাহার 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' গ্রন্থে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণনাটি উদ্ধারযোগ্য।

"কাজী সাহেব চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছেন কয়েকবার। যে কয়দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হ'ত বাড়ীখানি যেন ভেঙ্গে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্ক ভ'রে চা, বাটাভরা পান, কালিভরা ফাউন্টেন পেন, আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিতাম। সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতায়। এক-এক ক'রে 'সিন্ধু' তিন তরঙ্গ, 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'কর্ণফুলী', 'মিলন মোহনায়', 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি', 'নবীনচন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'শিশু যাদুকর',

'সাত ভাই চম্পা'—আরও কত কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আমাদের বাড়ীর সুপারি গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে।

সারারাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। দুপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন পামিষ্ট্রীর চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবাখেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে, সমুদ্রে। সাম্পানওয়ালারা এসে জুটত, সুর ক'রে চলত সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম। 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাঙা আমার তরী',……'ওগো গহীন জলের নদী'……

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চ'ড়ে পাহাড়ে। কখনো পরতেন তিনি আরবী পোষাক, কখনো বা ব্রিচেস। কাজী সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত, খালবিল, নদীচরে বেড়িয়েছি। সঙ্গে ছেলের দল। এত বড় বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি বড় ভয় করতেন। একবার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোঁকের ভয়ে তিনি আর নামতে চান না। কয়েকজনে মিলে কাঁধে ক'রে তাঁকে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।"[১]

চট্টগ্রামে নজরুলের কর্মব্যস্ত খেয়ালী জীবন সম্বন্ধে শামসুন্ নাহার মাহ্‌মুদের একটি বৃত্তান্তও উপভোগ্য।

"চট্টগ্রামে তিনি বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেছেন, বিশিষ্ট জননেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন; বড় বড় লোকদের কাছে প্রচুর সম্মান পেয়েছেন হয়তো; কিন্তু তরুণদের তিনি ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশী।

বেশী ক'রে তাদের নিয়েই ছিল তাঁর কারবার। বেশীর ভাগ সময়েই তাঁকে দেখেছি ছাত্রদের নিয়ে মেতে থাকতে।……কেউ তাঁকে বলতেন 'কবিদা', কেউ 'কাজিদা' আর কেউ বা 'নুরুদা'। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সব সময় যেন পালা ক'রে এঁরা কবিকে ঘিরে থাকতেন। কোনদিন কবি জনসভায় বক্তৃতা করবেন, হয়তো কোনদিন চট্টগ্রামে জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রাচীন এডুকেশন সোসাইটির বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন করবেন, কোনদিন বা খানবাহাদুর আবদুল আজিজের সমাধিতে শ্রদ্ধানিবেদন করবেন অথবা স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন কবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী সভায়;

[১] শামসুন্ নাহার মাহ্‌মুদ : নজরুলকে যেমন দেখেছি পৃঃ ৫৮-৯

আবার কোনদিন বা সব ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে পড়বেন সমুদ্রে বা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে; প্রকৃতির সঙ্গে হবে মুখোমুখি আলাপ। বিভিন্ন দিনে পোষাকের ঢঙে একটু তফাত, কখনো পরনে ধুতি, গায়ে নিমা ও চাদর, মাথায় কিস্তি টুপি; কখনো পায়জামা, পাঞ্জাবি, মাথায় একখানা কাপড় পাগড়ীর ঢঙে জড়ানো। আগাগোড়া সবই মোটা খদ্দর।"[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নজরুল 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থকে চট্টগ্রাম সফরের স্মৃতি-স্বরূপ উৎসর্গ করেছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ এবং তাঁর ভ্রাতা মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহারের নামে। চট্টগ্রামে বসে লেখা অনেক বিখ্যাত কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই সময় লেখা তাঁর 'শিশু যাদুকর' কবিতাটি শামসুন নাহারের শিশুপুত্রকে নিয়ে লেখা। তিনি এই শিশুপুত্রের নামকরণও করে দিয়েছিলেন। শামসুন নাহারের 'পুণ্যময়ী' গ্রন্থের জন্যে তিনি একটি আশীর্বাণী লিখে দেন।

নজরুলের স্ত্রীর ডাক নাম ছিল দুলি, ভাল নাম প্রমীলা। হয়ত আশাও তাঁর কোন নাম হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে শামসুন নাহার লিখেছেন,

"আমি চট্টগ্রাম থাকতে কবি-পত্নীর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার পত্রালাপ চলত। আজকাল দেখতে পাই তিনি নাম স্বাক্ষর করেন 'প্রমীলা নজরুল', তখন কিন্তু আমাকে চিঠিতে লিখতেন 'তোমার বৌদি আশা'।"[২]

চট্টগ্রামের সফরে নজরুল যে প্রচুর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা যে উদ্দীপ্ত হয়েছিল তা তিনি অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন শামসুন নাহারকে লেখা একটি পত্রে। এই পত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন,

"ফুল যদি কোথাও ফোটে, আলো যদি কোথাও হাসে, সেখানে আমার গান গাওয়ায় পায়, গান গাই। সেই আলো, সেই ফুল পেয়েছিলাম এবার চট্টলায়, তাই গেয়েছি গান। ওর মাঝে শিশিরের করুণা যেটুকু, সেটুকু আমার, আর কারুর নয়।"[৩]

ঐ পত্রের আর এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন,

"তোমরা আমায় বলেছ লিখতে। সে-বলা আমায় আনন্দ দিয়েছে, তাই সৃষ্টির বেদনাও জেগেছে অন্তরে। তোমাদের আলোর পরশে, শিশিরের

১ শামসুন নাহার মাহমুদ : নজরুলকে যেমন দেখেছি : পৃঃ ৭০-১
২ ঐ : পৃঃ ৭৫
৩ ঐ : পৃঃ ৮২

ছোঁয়ায় আমার মনের কুঁড়ি বিকচ হয়ে উঠেছে। তাই চট্টগ্রামে লিখেছি। নইলে তোমরা বললেই লেখা আসত না।"[১]

এই সময় নজরুল চট্টগ্রাম হয়ে সন্দীপ গিয়েছিলেন। তাঁর 'মধুমালা' গীতিনাট্যের নায়িকা 'মধুমালা' এই সন্দীপের রাজকুমারী। সন্দীপের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, "চারিদিকে সমুদ্রের জলকল্লোল—মাঝে সন্দীপ"। সেই শীতের সময় সন্দীপ যাবার পথে বঙ্গোপসাগরের প্রশান্ত বুকে বিহারের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে নজরুলের 'শীতের সিন্ধু' কবিতায়।

পূর্বেই বলেছি—কৃষ্ণনগরে থাকাকালে নজরুল ঢাকায় গিয়েছিলেন। অফুরন্ত প্রাণস্রোতে তিনি শহর মাতিয়ে তুলেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রতিভা সোম প্রমুখ অনেকের সঙ্গে তাঁর সে সময় ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে', 'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, পরাণ-পিয়া' প্রভৃতি গজল-গান তিনি ঢাকাতেই রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় গানটি বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' মাসিক পত্রে [চৈত্র, ১৩৩৪ সাল (১৯২৮)] স্বরলিপি সমেত ছাপা হয়। 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে' স্বরলিপিসহ ১৩৩৫ সালের (১৯২৮) বৈশাখ মাসের 'প্রগতি'তে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় থাকাকালীন নজরুলের কার্যকলাপের যে মনোজ্ঞ বর্ণনা বুদ্ধদেব বসু দিয়েছেন তা সত্যই উপাদেয়।

"নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তারপর ব'য়ে চলেছে গানের অফুরন্ত স্রোত—যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না।...

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড়ো-বড়ো লাল-ছিটে-লাগা মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের স্ফূর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং

১ শামসুন নাহার মাহমুদ : নজরুলকে যেমন দেখেছি : পৃঃ ৮৭

তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে, তাই।' বলে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। কখন আড্ডা ভাঙলো মনে নেই—নজরুল যে-ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাতো না। আমাদের প্রগতির আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি।"[১]

॥ ৮ ॥

১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে নজরুল কলকাতায় এসে প্রথমে ওঠেন ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটে 'সওগাত' অফিসের নীচের দুটি অপ্রশস্ত ঘরে। সেখান থেকে তিনি ইন্টালী এলাকায় ৮/১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে চলে যান। এই বাড়ীটির নীচের তলায় দু'খানি ঘরে শান্তিপদ সিংহেরা থাকতেন। নজরুল বাস করতেন দোতালার দু'খানি ঘরে।

এই বাড়ীতেই ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খান আসা-যাওয়া করতেন। তাঁর কাছে নজরুল ওস্তাদী গানের তালিম নিতেন। 'বন-গীতি' গ্রন্থটি নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন জমীরউদ্দীন খান সাহেবের নামে। জমীরউদ্দীন গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের ট্রেনার ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর নজরুল সেই স্থলাভিষিক্ত হন।

পূর্বেই বলেছি—কলকাতায় শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর নজরুল শোকে অভিভূত হয়ে বরদাকান্ত মজুমদারের কাছে অধ্যাত্ম-উন্নতির সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন এবং ধর্ম-সাধনায় একাগ্রচিত্ত হ'য়ে থাকেন। কোরান-পুরাণ-তন্ত্র-উপনিষদ্ প্রভৃতির অনুশীলন চলতে থাকে। তিনি গেরুয়া পরতে আরম্ভ করেন। এই সময় রচিত সাধন-সংগীতগুলি তাঁর অধ্যাত্মসাধনের স্বাক্ষর বহন

[১] বুদ্ধদেব বসু: নজরুল ইস্‌লাম (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১: পৃ ১৮-৯)

করে। অধ্যাত্মসাধন কালে তাঁর স্বষ্টি-প্রতিভার সামনে নূতন দিগন্ত দেখা দিলে। বহু বিস্মৃত প্রায় রাগরাগিণীকে উদ্ধার করে তিনি সেই সব সুরে গান রচনা করতে আরম্ভ করেন। তাছাড়াও নজরুলের হাতে নির্ঝরিণী, রেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নামে কয়েকটি নতুন রাগিনীর সৃষ্টি হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে হরেন্দ্রনাথ ঘোষের গাওয়া গানের সূত্রেই নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর সংস্রবের সূত্রপাত হয়। কোম্পানীর অনুরোধে তাদের জন্য তিনি গান লিখতে আরম্ভ করেন। কয়েকটি গান তিনি নিজেই গেয়েছিলেন। কয়েকটি কবিতাও তিনি পাঠ করেছিলেন স্বকণ্ঠে। মেগাফোন রেকর্ডে 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'কেন আসিলে ভালবাসিলে', 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি' ও 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম' গানগুলি নজরুল কর্তৃক গীত হয়। হিজ মাস্টারস ভয়েসে 'রবিহারা' (N 27188) ও 'নারী' (P 11520) শীর্ষক কবিতা দুটি তিনি নিজেই আবৃত্তি করেন। নজরুলের গানের অভাবিত ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কলকাতা বেতার কেন্দ্র তাঁকে সুরসৃষ্টি ও গান-রচনার কাজে নিয়োজিত করেন। এই সময় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীত-বিভাগের কর্ণধার ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। 'হারামণি' ও 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সময় নজরুল সিনেমা ও মঞ্চের সঙ্গেও জড়িত হন। এ দেশের সিনেমায় যখন বাণী-চিত্রের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী চলছে, তখন 'ধ্রুব' নাট্যচিত্রের নারদের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁর 'আলেয়া' গীতিনাট্যখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ১৩৩৮ সালের (১৯৩১) ৩রা পৌষ তারিখে। যিনি এই নাটকে কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি একটি অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত হতে অসমর্থ হলে নজরুল স্বয়ং সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে সকলকে বিস্মিত করে দেন। তাঁর দুটি কাহিনী—'বিদ্যাপতি' (প্রথম আরম্ভ—১৯৩৯ সালের ১৩ই অগস্ট) ও 'সাপুড়ে' (প্রথম আরম্ভ—১৯৩৯ সালের ২৭শে মে) ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। নজরুলের গান ও সুর মঞ্চ ও সিনেমা সংগীতের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পর্বের উন্মোচন করে। মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের মহুয়ার গান ও 'কারাগার' নাটকের ধরিত্রীর গান এবং প্রবোধকুমার সান্যালের 'শ্যামলীর স্বপ্ন'-এর

গানগুলি নজরুলের রচনা। 'সাপুড়ে', 'চৌরঙ্গী', 'নন্দিনী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' প্রভৃতি ছায়াচিত্রের অন্যতম আকর্ষণ নজরুল সংগীতের অপূর্ব সম্ভার। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতালপুরী' ও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় নজরুল বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সংগীত পরিচালনা করেন।

১৩২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ছুটোর সময় কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নজরুলকে স-সমারোহে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তার সংবাদ ছাপা হয় ১৩৩৬ সালের (১৯২৯) অগ্রহায়ণ মাসের 'কল্লোলে'। অভ্যর্থনা সভার সভাপতি ছিলেন এস্, ওয়াজেদ আলী। 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ ও 'সওগাত'-সম্পাদক এম, নাসিরউদ্দীন সম্পাদক নির্বাচিত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্বকুমার চন্দ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আচার্য রায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নজরুলকে প্রতিভাবান বাঙালী কবি বলে অভ্যর্থনা করেন। তিনি বলেন, "আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের যাতুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভা তেমন করে ধরা পড়ছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইস্‌লাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালী রূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইস্‌লামকেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারের শৃঙ্খল প'রে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।"

এর পর মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী জাতির পক্ষ থেকে নীচের অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করেন।

কবি নজরুল ইস্‌লাম করকমলেষু

"কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের উর্ধ্বে—সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগল-ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও।

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক-বন্দনা গ্রহণ কর।

তুমি বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নতমস্তকে বরণ করিতেছে,—তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ-অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর।

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার-সাথে আঙুর-লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যামশান্তকণ্ঠে ইরানী-সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর।

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে-গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়নদর্পণে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথাবিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে

নজরুল-সম্বর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।

কলিকাতা, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯"

তারপর সোনার দোয়াত-কলম ও একটি রূপার কাস্কেটে ভরে অভিনন্দন-পত্র নজরুলের হাতে দেওয়া হয়। উমাপদ ভট্টাচার্য ও নলিনীকান্ত সরকার একটি আবাহন-সংগীত গান।

অভিনন্দনের যে উত্তর নজরুল দেন তার মধ্যে বলেন,

"এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারি নি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র—Beauty is Truth, Truth Beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে, কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারি নি ; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটে নি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পতাকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি ; সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরুপথে পথ না হারাই।—এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।......

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখি নি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।"

সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেন,

"স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু

নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"র মত প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।"

এই সভাতেই নজরুল তাঁর 'বীরদল চল সমরে' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গান দুটি গেয়ে সকলকে তৃপ্তিদান করেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজবিহারী বর্মন কাজী নজরুল ইস্‌লামের 'প্রলয় শিখা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে রাজদ্রোহমূলক কবিতা থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহকর মামলা আনা হয়। ইতিপূর্বে 'ফাঁসীর আশীর্বাদে'র জন্যে ব্রজবিহারী বাবুর ২ বৎসরের জেল হয়েছিল বলে তাঁকে আর এ মামলায় জড়ানো হয় নি। নজরুলের ছ'মাসের জেল হয়, কিন্তু ১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ গান্ধী-আরউইন-চুক্তির ফলে নজরুল জেল খাটার দায় থেকে অব্যাহতি পান।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর নজরুল সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই বৎসরের ২৫শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন হয় কলকাতার অ্যালবার্ট হলে। এ সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন 'মহাশ্মশান' কাব্যের কবি কায়কোবাদ সাহেব। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন তাঁর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন যে কায়কোবাদকে মাল্যভূষিত করা হলে তিনি সে মালা নজরুলের গলায় পরিয়ে

দিয়ে বলেন, "বয়সের দাবীতে এঁরা আমাকে আজ সভাপতি করেছেন। কিন্তু এ সম্মানের প্রকৃত অধিকারী আপনি।"[১] নজরুল 'এসো এসো রসলোক বিহারী' এই উদ্বোধন-সংগীতটি এই সম্মেলনে গান। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পূর্বেই বিবেকানন্দ রোডের উপর 'কলগীতি' নামে তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকানটি নিলামে বিক্রী হয়ে যায় এবং তিনি বহুবিধ দেনায় জড়িয়ে পড়েন।

১৯৩৮ সালের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের কাব্যশাখায় নজরুল সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের দলের মুখপত্র-রূপে নবপর্যায়ের 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হয়। নজরুল এবারও প্রধান সম্পাদকরূপে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪১ সালের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সমিতির রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই বছরের ২৫শে মে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার সেণ্টাল কলেজ হল প্রাঙ্গণে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে মহাসমারোহে তাঁর ৪৩ তম জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মৌলিক সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন।

এরপর নজরুলের জীবনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। তাঁর স্ত্রী ১৩৪৭ সালে (১৯৪০) নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। স্ত্রীর নিরাময়তার জন্যে তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল রকম চিকিৎসারই ব্যবস্থা হল। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হল না। তিনি একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

এইভাবে সমস্ত চেষ্টায় বিফল হয়ে নজরুল এক দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগস্ট। শেষের দিকে তিনি যোগসাধনা আরম্ভ করেছিলেন। পরলোক-তত্ত্ব নিয়েও তিনি খুব উৎসাহী ও কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন বাঙলার গণ্যমান্য মনীষীদের চেষ্টায় 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠিত হয়। এর সম্পাদক নির্বাচিত হন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। ২৫শে জুলাই নজরুল ও তাঁর পত্নী রাঁচী মেণ্টাল হস্‌পিটালে প্রেরিত হন। চার মাস

১ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন: যুগস্রষ্টা নজরুল: পৃঃ ৬০

চিকিৎসা হওয়ার পর কোন সুফল পাওয়া যায় না। তখন ১৯৫৩ সালের ১০ই মে তারিখে দুজনকে লণ্ডনে পাঠানো হয়। এখানে London St. Thomas হাসপাতালের মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম সার্জেণ্ট, ই. এ. বেটন ও সার রাসেল ব্রেন নজরুলকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁরা একমত হতে না পারায় ৭ই ডিসেম্বর তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় ভিয়েনাতে। ৯ই ডিসেম্বর নজরুলের উপর সেরিব্রাল অ্যালজিওগ্রাফী পরীক্ষা করা হয়। এই ডাক্তারি পরীক্ষার ফল দেখে প্রখ্যাত স্নায়ু-বিদ্যাবিদ ডাঃ হান্স হফ্‌ বলেন যে নজরুল 'পিকস ডিজিস' নামক একপ্রকার মস্তিকের রোগে ভুগছেন। এই রোগ এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে তিনি নিরাময়ের বাইরে চলে গেছেন। এই রোগে মস্তিষ্কের সামনের ও পাশের অংশগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং রোগী শিশুর মত ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। ১ ই ডিসেম্বর তারিখে নজরুল ও তাঁর স্ত্রীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়।

॥ ৯ ॥

নজরুলের জীবনকে সম্যকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁর মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাবাবর্ত আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে। সত্যকার প্রতিভা ছাড়া এই সমন্বয় সাধন সম্ভবপর নয়। নজরুলের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আর কারো ছিল বা আছে বলে মনে হয় না। নজরুল প্রকৃত কবিধর্মের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর কাব্য বৈচিত্র্যে নূতন, স্বতঃস্ফূর্ততায় স্বাভাবিক ও ভাবাবেগে বেগবান। একদিকে যেমন দেশপ্রেমের উন্মাদনা ও অন্যায় লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁর সৃষ্টিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে, অপরদিকে তেমনি বিরহমিলন রাগানুরাগকে নিয়ে তিনি জীবনের কোমলমধুর রূপের মহিমা কীর্তন করেছেন। হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে যেমন কবিতা, গান ইত্যাদি রচনা করেছেন, তেমনি মুসলিম আদর্শ ও ঐতিহ্যকে অপূর্বসুন্দর ভাবে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেছেন। নজরুল-মানসের পরিচয় জানতে হলে তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধহয় অবান্তর হবে না।

নজরুল-প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করত তাঁর চেহারা। ১৩৩০ সালের (১৯২৩) আশ্বিন মাসের 'কল্লোলে' নজরুল সম্পর্কে একটি পরিচয়-লিপি প্রকাশিত হয়। এই সময় নজরুলের বয়স প্রায় ২৪ বৎসর।

"কবি নজরুল ইসলাম—বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, চোখে চশমা, সামান্য গোঁফ আছে, বিদ্রোহীর মতই উৎসাহে উজ্জ্বল চোখ, বেশী লম্বা নয়।"

যৌবনে নজরুলের গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চেহারায় ছিল আর্যের লক্ষণ। হাঁটার সময় মাথার কোকড়ানো চুলগুলি নাচত। তাঁর লেখা স্বদেশী গানগুলি যেন মূর্ত হ'য়ে উঠত তাঁর বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহে।

নজরুলের প্রকৃতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু যা বলেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়েই উছলে পড়েছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার—তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—বড়ো-বড়ো জরুরি এনগেজমেণ্ট ভেসে যাবে।......

হয়তো দু'দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই একমাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয় কিন্তু এ-চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহেমিয়ান চাল-চলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন—মনে-মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহেমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা।"[১]

নজরুল চরিত্রের এই সর্বজনীনতা তাঁর সৃষ্টিকেও সর্বজনীন করে তুলেছিল।

গোলাম মুস্তফার একটি ছড়ায় নজরুলের প্রাণোচ্ছলতা ও খেয়ালিপনা অনবদ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

"কাজি নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।

১ বুদ্ধদেব বসু: নজরুল ইসলাম (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১: পৃ ১৯)

ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিনরাত,
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয়,
ধরায় পর তার কেউ নয়।"

নজরুলের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর একান্ত সুহৃদ্ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যা লিখেছেন তাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"নজরুলের বিদ্রোহ ও বেহিসেবী যৌবনশক্তি শুধু যে তাঁর কাব্যেই রূপায়িত হয়েছিল, তাই নয়, তাঁর জীবনেও পরিপূর্ণভাবে তা ফুটে উঠেছিল। সাবধানী পথিকের মত পা ফেলে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না, তাই সে করেছে যখন চেয়েছে মন যা। কিন্তু তাঁর মন তো শয়তানের আবাস ছিল না। তাঁর মন ছিল সকলের জন্তে প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসায় ভরপুর। সেই মনের খুশী মেটাতে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখেন নি তিনি কোনদিন। অনেকে বলেন, তার জন্ম জীবনে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু ঠকিয়েছে জেনেও সেই বন্ধুর কথায় আবার বিশ্বাস করেছেন, ঠেকে শেখেন নি কোনদিন। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি এ বিশ্বাস কোনদিন হারান নি যে, মানুষ মাত্রই সৎ, অবস্থার বিপাকে পড়ে সাময়িকভাবে যতখানি নীচতাই সে প্রকাশ করুক না কেন!"[১]

নজরুলের বহুমুখী জীবন ও বিচিত্র প্রকৃতির বিষয়ে তাঁর পরমবন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের রচনাংশ উদ্ধৃত ক'রে এই প্রসঙ্গের শেষ করি।

"সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভাসমিতিতে নজরুল, আড্ডা-মজলিসে নজরুল,—দেশব্যাপী বন্দনায় নজরুল, দ্বেষতুষ্ট লাঞ্ছনায়,—দাবা খেলায় নজরুল, ফুটবল মাঠে নজরুল,—রঙ্গরসে নজরুল, ব্যঙ্গবিদ্রূপে নজরুল,—যোগী নজরুল, ভোগী নজরুল,—হস্তরেখা-পাঠে অধ্যবসায়ী নজরুল, 'কলগীতি'-পাটে অব্যবসায়ী নজরুল,—কোথায় কিসে নাই নজরুল? কিন্তু এই ছোট ছোট টুকরোগুলো জোড়া দিলে যে-আকার সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে, সেই নজরুল মানুষটি যেন এ-সবের সমষ্টির চেয়ে আরও বড়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরাই এ সত্য উপলব্ধি করেছেন। বিংশ শতাব্দীর কোলে নজরুল যেন উনবিংশ শতাব্দীর বিদায়কালীন প্রীতি-উপহার।"[২]

---

১ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়: নজরুল (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ : পৃ ৯)
২ নলিনীকান্ত সরকার: নজরুল (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ : পৃ ৬৩)

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

কবি নজরুল

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে নজরুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন—একথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের চরম উৎকর্ষের কালে যখন অধিকাংশ কবি তাঁর সর্বব্যাপী প্রতিভার কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পণ করে কাব্য-সরস্বতীর আরাধনা করছিলেন, সেই সময় নজরুল তাঁর অগ্নিবাণা হাতে নিয়ে বিদ্রোহীবেশে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে পুরোপুরি অস্বীকার না করেও তাঁর কাব্য স্বর ও স্বরে যে বিশিষ্ট, এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কাব্যভাবনা ও রীতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ নজরুলের পূর্বসূরী হলেও তাঁর কাব্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে বাংলাদেশের আশাআকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্যবিক্ষোভ ও বিদ্রোহের যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এ কথাও না মেনে উপায় নেই। রবীন্দ্র-বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রথম বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ তাঁরই। জনজীবনের সঙ্গে কাব্যকে সার্থকভাবে যুক্ত করার প্রথম গৌরব বহুলাংশে নজরুলই দাবি করতে পারেন। বাংলা কাব্যের বিদ্রোহ পৌরুষ ও যৌবনের অগ্রগণ্য ভাষ্যকারদের মধ্যেও নজরুল অন্যতম। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতামূলক বিদ্রোহ পরবর্তী বাংলা কাব্যের আধুনিক কবিদের স্বকীয় বৃত্ত খুঁজে নিতে অনেক সাহায্য করেছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কবিদের নিজস্ব স্বর ও সুর নির্ণয়ে নজরুলের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে অগস্ট বিপ্লবের আরম্ভকালের মধ্যে নজরুল-প্রতিভার উদয় ও অস্ত হয়েছে। এর পর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর কবিকণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার পর তাঁর কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ, যেমন 'নতুন চাঁদ', 'মরু-ভাস্কর' ও 'শেষ সওগাত' প্রকাশিত হয়েছে। অগস্ট বিপ্লবের পূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা',

'বিষের বাঁশী', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', চিত্তনামা', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'জিঞ্জীর', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা'। এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভাববস্তুর বিচার করলে তিনটি ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর মোটামুটি এক। কবির বিদ্রোহীরূপ এগুলির মধ্যে প্রধানত পরিস্ফুট। দেশপ্রেম, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে কবির বিক্ষোভ, নৈরাশ্য, আশা ইত্যাদি কাব্যরূপ পেয়েছে। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'চক্রবাকে'র মধ্যে কবির প্রেমিকরূপই অধিকতরভাবে প্রতিফলিত। মানবিক প্রেম, বাৎসল্য, প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ই এইসব গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। 'নতুন চাঁদ' ও 'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ কোন চরিত্র নেই। উপর্যুক্ত দুই ধারার কবিতাই এ গ্রন্থ দুটিতে স্থান পেয়েছে। 'চিত্তনামা' ও 'মরু-ভাস্কর' জীবনীবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। সেই হিসেবে এই দুটিকে একটি স্বতন্ত্র ধারার গ্রন্থহিসেবে ধরা যায়। বলাবাহুল্য কাব্য-ভাবনার ক্ষেত্রে কোন বিভাগই পুরোপুরি স্বতন্ত্র হতে পারে না। এক অখণ্ড কবিমানসের সৃষ্টি বলে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য নিশ্চয়ই আছে আর এই অন্তর্নিহিত ঐক্যই কবির কাব্য-ইতিহাসের আত্মা। আলোচনার সুবিধের জন্যে এই রকম বিভাগ করা অন্যায় নয়।

কাব্যগ্রন্থ ধরে ধরে প্রথমে তাদের কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু আলোচনা করে পরে তাদের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বলাবাহুল্য এখানেও বিষয়বস্তু ও গঠনরীতিকে আলাদা করা হবে আলোচনার সুবিধের জন্যে, কেননা বিষয়বস্তু ও গঠনরীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ, একের থেকে অপরকে বিযুক্ত করা অসঙ্গত। বিষয়বস্তু ও গঠনরীতির সার্থক ও অচ্ছেদ্য মিলনেই কবিতার রসমূর্তি প্রকাশ পায় এবং তাইতেই কবিতার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক মাইকেল রবার্টস যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

"In the narrow sense, the word 'from' is used to describe special metrical and stanzaic patterns : in a wider sense it is used for the whole set of relationships involving the sensuous imagery and the anditory rhetoric of a poem. A definite

'form' in the narrower (and older) sense is not an asset unless it is an organised part of the 'form' in the wider sense, for the final value of a poem always springs from the inter-relation of form and content. In a good poet a change of development of technique always springs from a change or development of subject-matter."[১]

॥ ২ ॥

নজরুল ইস্‌লামের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (কার্তিক, ১৩২৯)। গ্রন্থটি ভাঙা বাংলার রাঙা যুগের আদি পুরোহিত ও সাগ্নিক বীর বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গীকৃত।

এই গ্রন্থেরই শুধু নয়, নজরুলের সকল কবিতার মধ্যেও অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সেকালে এত আলোড়ন তুলেছিল যে এই বিশেষণটি এখনো নজরুলের নামের পূর্বে একটি ভূষণের মত শোভা বর্ধন করছে। বস্তুত এই কবিতাটি নজরুলের জীবন ও কবিমানসের একটি বিশিষ্ট প্রতিনিধি। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার কাছাকাছি সময়ে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেছেন যে, মোহিতলাল মজুমদার একদিন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটস্থ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের (পৌষ ১৩২১ সাল) 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'আমি' শীর্ষক একটি কথিকা নজরুলকে পড়ে শোনান। তিনি দাবি করতেন যে, 'আমি'র ভাবসম্পদ ধার করেই নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন। 'আমি' কথিকার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করলে আলোচনার সুবিধে হবে।

"আমি বিরাট্। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভোনীলিমার ন্যায় সর্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার

[১] Michael Roberts Ed.: The Faber Book of Modern Verse, Introduction. Twelfth Impression: London 1946: P 7

ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্তসীমন্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাটচন্দন।

বায়ু আমার খাস, আলোক আমার হাস্যজ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষাশক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মত অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যূষের শিশিরকণা আমার মুখমুকুর, সাগরগর্ভের শুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত; অশ্বত্থ-বীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমার রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ. পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্যাস্তশেষ প্রায়ান্ধ-কারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তরউষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ—অমানিশীথের সমুদ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দন্তান্ধ পিতৃরোষ।......

আমি মধুর—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধূমারুণ লোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত; যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত।...

আমি জড়জগতের আকর্ষণশক্তি, প্রাণীজগতের ক্ষুধা, এবং মানবজগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে—আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি সর্বভূতে আত্মরক্ষণ ধর্ম বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আমি মানব-হৃদয়ে প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দয়িতের প্রিয়তমের জন্য আত্মবিসর্জন; সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ—আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক, মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার অমৃত; আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ; আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।"[১]

এই কথিকার শেষাংশ—

"আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণা করিতে পারি। আমি

---

১ মানসী, পৌষ ১৩২১ সাল: পৃ ৫৭২-৪

মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকেই প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্বল, কিন্তু আমার চিন্তাশক্তি ধরণীকে নবকলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু ঊর্ধ্ব হইতে আমার মুখে যে আলোক আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে?"[১]

'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে 'আমি' কথিকার মিল রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধের দিক থেকে। 'আমি'র মধ্যে দার্শনিক মনোভাব প্রবল, কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অনেকখানি সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনাজ্ঞানসম্পন্ন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির শেষাংশের সঙ্গে 'আমি' কথিকাটির উপসংহারের তুলনা করলেই এ বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 'বিদ্রোহী' কবিতা ও আমি' কথিকার ভাষাসম্পদ, প্রতীকগৌরব ও বাচনভঙ্গির সমধর্মিতা অসতর্ক পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। একথা অনেকেই জানেন যে, কোন একটি রচনার প্রেরণায় অন্য একটি উঁচুদরের রচনা জন্মগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে 'আমি' যদি 'বিদ্রোহী'কে কিঞ্চিৎ প্রেরণা যুগিয়ে থাকে, তাহলেও 'বিদ্রোহী' নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জীবনবোধে 'বিদ্রোহী' 'আমি'র চেয়ে উৎকৃষ্টতর রচনা—একথা বলাই বাহুল্য।

'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যে নজরুলের উপর অজস্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু এইসব ব্যঙ্গবিদ্রূপ নজরুলের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। কবিতাটি বহু আলোচিত হওয়ার ফলে অভূতপূর্ব প্রচারের সৌভাগ্য লাভ করে।

ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ও আক্রোশের কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যের রসবিচারে অনেকের মতে এই কবিতাটির প্রধান ত্রুটি এই যে, কবিতাটিতে নানা বিরোধীভাবের সমাবেশ হওয়ায় কাব্যের ফলশ্রুতি বিঘ্নিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নজরুলের বিদ্রোহে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক চেতনার স্বাক্ষর থাকলেও তা মূলত রোমান্টিক। রোমান্টিসিজমের অনেকটা স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু এই কবিতার রোমান্টিক বিদ্রোহ অনেকক্ষেত্রে ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে।

কবি বলেছেন, 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ', 'আমি ধূর্জটি', 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস'। এই এতবড় মহান বিদ্রোহের পরিকল্পনায় পাশে 'আমি

১ মানসী, পৌষ ১৩২১ : পৃ ৫৭৭

গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন, আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন-চুড়ির কন্‌-কন্‌' প্রভৃতি বিদ্রোহীর প্রতীককল্পনা অত্যন্ত লঘু ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যদিও নজরুলের বিদ্রোহীর রোমান্টিক স্বরূপে জীবনের রুদ্রভীষণের সঙ্গে কোমলমধুরের ভাবপরিণয় স্বীকৃত, তবুও এই মিলনের সীমা আলোচ্য কবিতাটির অনেকস্থলে অতিক্রান্ত হওয়াতে মূলরসনিবেদন পুরোপুরি সার্থক হয় নি। এই বিদ্রোহ-পরিকল্পনায় আর একটি বিশেষ ত্রুটি—এখানে কবি বিদ্রোহীর মহনীয়তা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন নি। এখানকার বিদ্রোহের প্রধান গৌরব ও মহত্ত্ব এই যে, এই বিদ্রোহ কখনও ক্লান্ত শান্ত হবে না। এখানে সচেতন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানবচিত্ত বিশ্বের সকল বন্ধন ছিঁড়ে ছিঁড়ে অনন্ত প্রগতি লাভ করবে। এই প্রগতির শেষ নেই, ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই। যে আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ মানবচিত্ত বলে, 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ', সেই যখন ঘোষণা করে,

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত"

তখন মহৎ উদ্দীপ্ত বিদ্রোহের মহনীয়তা খর্ব হ'য়ে যায় না কি?

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার জাতীয় কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'One's-Self I Sing' নামে একটি অনবদ্য কবিতার কথা মনে হয়। কবিতাটি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনায় উদ্বোধিত মানবচিত্তের ঘোষণা। স্বল্পপরিসরের মধ্যে এটি একটি আশ্চর্য অনুভূতিঘন কবিতা।

"One's-self I sing, a simple separate person,
Yet utter the word Democratic, the word En-Masse.

— –

Of physiology from top to toe I sing,
Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the
Muse, I say the Form complete is worthier far,
The Female equally with the Male I sing.

Of Life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful, for freest action form'd under the laws divine,
The Modern Man I sing."

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির ভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কি বলতে চেয়েছেন এ সম্বন্ধে নানা মত শুনতে পাওয়া যায়। কবির প্রায় ২৩ বৎসরের বিপুল সাহিত্যসাধনার উপরে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোন বিদ্রোহ-বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা—এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ—সেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি উচ্চকিত—প্রায় দিশাহারা। এর মনে যে ভাব সেটি এক সুপ্রাচীন তত্ত্ব, ভারতীয় 'সোহম্' 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' 'যত্র জীব তত্র শিব' প্রভৃতি বাণীতে তা ব্যক্ত হয়েছে, সুফীর 'আনালহক' বাণীতেও সে-তত্ত্ব রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগরূপ মহাবিদ্রোহও হয়তো এর মূলে রস যুগিয়েছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের মতে শ্রীঅরবিন্দের কলকাতার শিষ্যদের সাহচর্যে কবির সোহম্ তত্ত্বে দৃঢ়স্থিতি ঘটে।"[১]

এই তো গেল ভাববস্তুর কথা। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কবিতাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে, এখানে ভাষা শুধু অর্থপূর্ণ ভাষা না হয়ে যেন কতকগুলি ভাবের অভিব্যক্তিব্যঞ্জক ইঙ্গিতমাত্র হয়ে উঠেছে। সুসংবদ্ধ অর্থ সর্বত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও কবির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস হৃদয় দিয়ে অনুভবগম্য। এইভাবে বিচার করলে 'বিদ্রোহী' বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিম্বলিক (symbolic) কবিতা। নজরুলের এই সার্থক সিম্বালকতার মূলে কাজ করেছে তাঁর অপ্রতিহত দুর্দান্ত পৌরুষ, উদ্দাম উন্মুক্ত হৃদয়াবেগ এবং বীর্যবন্ত চির-উন্নত-শির অহমিকা (egotism)। এই অহমিকার উদগ্রতম প্রকাশের আর একটি সার্থক উদাহরণ 'ধূমকেতু' কবিতাটি। বস্তুত নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতা দুটির মধ্যে তাঁর বিদ্রোহের যে রুদ্ররূপ প্রকাশিত তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে অন্যান্য বিদ্রোহভাবমূলক রচনায়। এজন্য এ কবিতা দুটি তাঁর কাব্যজগতে একটি বিশেষ গৌরবময় আসনের অধিকারী।

১ কবি নজরুল : সংস্কৃতি পরিষদ্ প্রকাশিত : কলকাতা ১৯৫৭ : পৃ ২৩-৪

'ধূমকেতু' কবিতাটির মধ্যে নজরুলের কবিসত্তার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত। রাজনৈতিক চেতনার একটি বিশেষ উত্তেজনাময় অধ্যায়ে 'ধূমকেতু' কবিতাটির জন্ম। নজরুল প্রথমে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন যখন আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হল, তখন সন্ত্রাসবাদ উদ্দীপনের মানসে নজরুল 'ধূমকেতু' কাগজ বের করেন। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যাতেই এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এখানে কবি নিজেকে 'স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু' বলে ঘোষণা করেছেন। 'ধূমকেতু'র প্রলয়ঙ্কর বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত কারণ সম্বন্ধে কবি বলেছেন,

"আমি আপনার বিষ-জ্বালা মদ পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুঁদ হ'য়ে আমি চ'লেছি ধাইয়া ভাইয়া!"

এই 'আপনার বিষ-জ্বালা' ও অস্থিরতা কবির বিদ্রোহকে তীব্রতর করেছে। 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থে নজরুল রবীন্দ্রনাথের অশীতিবার্ষিকী জন্মোৎসবে 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' শীর্ষক যে কবিতা লেখেন, তার এক জায়গায় তিনি তাঁর বিদ্রোহের অন্তরে 'অশান্ত রোদন'কে স্বীকার করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তার প্রেরণার উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।

"দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি।
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু!"

'ধূমকেতু' কবিতার মধ্যে অনেকে নাস্তিক্যবুদ্ধিজনিত ভগবানের প্রতি বিদ্বেষকে ভগবৎবিশ্বাসী নজরুলের কবি-মানসের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য ব'লে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'সর্বনাশের ঝাণ্ডা' উড়িয়ে দিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

"পঞ্জর মম খর্পরে জ্বলে নিদারুণ যেই বৈশ্বানর
শোন্ রে মর, শোন্ অমর!—
সে যে তোদের ঐ বিশ্বপিতার চিতা!
এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে, হে সৃষ্টি জান কি তা?
কি বল? কি বল? ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা!
হো হো ভগবানে আমি পোড়াব বলিয়া জ্বালায়েছি বুকে চিতা।"

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে এই আপাত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য নজরুলের কবি-মানসের মধ্যে একটি স্থির বিশ্বাসের আলোকে সমন্বয় লাভ করেছে। যে তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত বৈলক্ষণ্য সংগতি ও ঐক্য পায়, তাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Pantheism'। বাংলায় এই তত্ত্ব লীলাবাদ নামে পরিচিত। নজরুল এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে শাক্তসংগীত, বৈষ্ণবগান, ইসলামী সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক রচনার জনক হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন,

"অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই প্রিয়তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ— ইংরেজিতে যা সাধারণতঃ Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভালো মন্দ, পাপপুণ্য, জন্মমৃত্যু, উত্থানপতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা।...এই হিন্দুমুসলমানের মাথা ভাঙাভাঙির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামা-সঙ্গীত ও বৃন্দাবন-গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর তত্ত্ব) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে।"[১]

পূর্বেই বলেছি—নজরুলের প্রবল অহমিকার (egotism) তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতা দুটিতে। অনেক স্থলে তাঁর নাস্তিক্য-বাদসূচক পংক্তিগুলি তাঁর শক্তিমান অনমনীয় হৃদয়ের অহংকারমূলক অত্যুক্তি। নজরুলের ব্যক্তিগত খাঁটি কবিসুলভ অহমিকার বিষয়ে ওদুদসাহেব যে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য।

"About twenty years ago some notable Khan Bahadurs of Dacca—East Bengal—arranged a conversazione with Nazrul Islam on a house-boat on the river Budi-Ganga. The Khan Bahadurs gathered there in due time, but the poet was conspicuous by his absence. He was found, after a good deal of searching, to be spending his time in the company of a friend —his boisterous langhter must have divulged his whereabouts. When he was reminded in a tone of subdued complaint that the revered Khan Bahadurs had been waiting for him for a

১ আবদুল ওদুদ : শাশ্বতবঙ্গ

long time he said: I am the Poet of the land—what else are the Khan Bahadurs to do except waiting for me patiently? The Khan Bahadurs and Ray Bahadurs of the land will line the street I shall pass through, will bow to me while I proceed accepting their salaams—this is what may be called the true relationship between us. —The historic example of such a sense of glory of the self in a penniless artist is furnished by Beethoven. But we know of no poverty-stricken artist in our country except Nazrul Islam to have expessed himself in such a strain. The poet once uttered: I bow to none except to myself,—and the utterance was no stray outburst but the expression of an abiding feeling in him—it is in fact his dominant feeling.[১]

নজরুলের বিদ্রোহের মধ্যে Prometheus-এর মহাবিদ্রোহের ছায়া দেখা যায়। শেলীর Prometheus-এর মহাবিদ্রোহ প্রধানত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূঢ় ও দাম্ভিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে। Prometheus-এর অদম্য বিদ্রোহের অন্তরে বশ্যতার সামান্যতম চিন্তাও নেই।

"Submission, thou dost know I cannot try:
For what submission but that fatal word,
The death-seal of mankind's captivity,
Like the Sicilian's hair-suspended sword,
Which trembles o'er his crown, would he accept,
Or could I yield? Which yet I will not yield."[২]

'ধূমকেতু' অনেকটা নজরুলের সাহিত্য ও শিল্পজীবনের প্রতীক। বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে নজরুলের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনি অতর্কিত। বাংলা সাহিত্যে উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের ভাগ্যে যে খ্যাতি লাভ ঘটেছিল, তা অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে। আরব্যউপন্যাসের কোন নায়কের মত অকস্মাৎ রাতারাতি তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। ইংরেজী

১ Kazi Abdul Wadud: Creative Bengal: Calcutta 1950: Pages 127-8
২ Shelley: Prometheus Unbound Act I

সাহিত্যে 'Childe Harold' প্রকাশের পর বায়রণ এই রকম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বায়রণের জীবনীকার Andre' Maurois লিখেছেন,

"Byron's life had been abruptly transformed, as that of the hero in some Eastern tale, touched by an enchanter's wand. "I awoke one morning and found myself famous," he wrote. One evening he had known London as a desert peopled by three or four acquaintances; the next, it was a city of the Arabian Nights, crowded with lighted palaces opening their portals to the most illustrious of young Englishmen."[১]

নজরুল ধূমকেতুর মতই অকস্মাৎ উদিত হ'য়ে চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে চিরকালের জন্য সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছেন। এদিক দিয়ে তাঁর পূর্বসূরী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। অতি অল্পসময়ের মধ্যে বিকশিত কাব্যশক্তি সম্পর্কে সচেতন মধুসূদন নিজের বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন,

"You may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet and no mistake."

কবির এই দম্ভোক্তি একদিন সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

১৯২৫ সালে লেখা করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর একপত্রের উত্তরে নজরুল ১৯২৭ সালের শেষের দিকে তাঁর বিদ্রোহের বিষয়ে লিখেছিলেন,

"আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করি নে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। ......আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের —পূর্ণতম স্রষ্টার।"[২]

১ Andre' Maurois : Byron (Translated by Hamish Miles) : London 1950 (Reprinted) : Page 148

২ খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন : যুগ-স্রষ্টা নজরুল : পৃ ১১৪

উপরের উদ্ধৃতির মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রলয়োল্লাস' এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নজরুলের কবিচিত্তও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। কবি পুরাতনের ধ্বংস ঘটিয়ে নূতনকে আহ্বান জানান। তিনি দেশবাসীকে ডাক দেন নূতনকে বরণ করতে।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।"

প্রলয়োল্লাসে-মত্ত অনাগত সুদিন যেন সিংহপ্রতীক ব্রিটিশ রাজশক্তির বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসছে।

"আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশায় নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!"

ধ্বংস দেখে ভীত হবার কারণ নেই। প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির পথ তৈরী হয়। অসুন্দরকে উচ্ছেদ করতেই নবীনের আবির্ভাব। চিরসুন্দর নূতনই ধ্বংসের বুকে নূতন সৃষ্টির মন্ত্র জানে।

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? —প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!"

আমরা দেখেছি—খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন নজরুলের কবি-মানসকে গভীরভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানের ঐক্যস্থাপন-প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার অভিপ্রায়ে নজরুল হিন্দুসংস্কৃতি ও মুসলিম-তমুদ্দুনের সমন্বয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন 'কামাল পাশা' ও 'শাত্-ইল আরব' কবিতা দুটিতে।

সমিল স্বরবৃত্ত মুক্তকছন্দে লেখা 'কামাল পাশা' কবিতাটি সম্পর্কে 'বঙ্গবাণী'র (শ্রাবণ ১৩৩১ সাল) মন্তব্যটি চয়নীয়,

"তুর্কীর নব-সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার নামে যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে সেটি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। গদ্যপদ্যময় কবিতার সংস্কৃত নাম চম্পূ; সে হিসাবে এই কবিতাটিকে চম্পূ বলিলে ইহার বিশেষত্ব বুঝান যায় না, কারণ ইহাতে যে উদ্দীপনা আছে প্রাচীন চম্পূতে তাহা পাই না। যুদ্ধের অভিযানে জয়ডঙ্কার তালে তালে যোদ্ধাদের যে জয়োল্লাস এই 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে পাই তাহা এ দেশের সাহিত্যে নূতন। কবির ছন্দে ও ভাষায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি; ইরান ও ভারতের এমন অপূর্ব মিলন, মোগল সম্রাট্‌দের আমলের নামজাদা হিন্দী সাহিত্যেও দেখি নাই। বঙ্গের কবিসমাজে নজরুল ইসলামের স্থান অতি উচ্চে।"

জনজাগরণের প্রতিনিধি হিসেবে কামাল পাশা নজরুলের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। অনেক জায়গায় তিনি কামাল পাশার শৌর্যবীর্য সম্পর্কে অকুণ্ঠভাবে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে ১৩২৯ সালের (১৯২২) ৩০শে আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত 'কামাল' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মত-ছেলে ব্যাটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরুতেও আর আপত্তি নাই।.........বিশ্বে যখন "যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি" অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ, কামাল এলো তার বিশ্বত্রাস মহাতরবারী নিয়ে সামাল সামাল করে রোজকিয়ামতের ঝঞ্ঝার মত, রুদ্রের মহারোষের মত। অত্যাচারীর মুখে গোখরোসাপের বিষাক্ত চাবুক মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেললে ক্ষ্যাপা ছেলে, ঘুসি মেরে তার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিলে, পেঁদিয়ে তিনভুবন দেখিয়ে দিলে। হ্যাঁ, ব্যাটাছেলে বটে বাবা, একেই বলে বাপের ছেলে সুপুত্তুর।.........এই তো সত্যকার মুসলিম, এই তো ইসলামের রক্তকেতন। দাড়ি রেখে, গোস্ত খেয়ে, নামাজ রোজা করে যে খিলাফৎ উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না তা সত্য-মুসলমান কামাল বুঝেছিল;... ।......ঐ কামালের নামে বেরিয়ে পড় "বোম কেদারনাথ" ব'লে। আপনি আল্লা ভগবান সবাই সহায় হ'বে তোমার।"

কামালকে উপলক্ষ করে দৃপ্ত সৈনিকদের আকাঙ্ক্ষা উল্লাস ও বেদনার মধ্যে নজরুল নিজের দেশের পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা ও স্বাধীনতার

আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়েছেন। নিজের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকে যেমন কবি সমর্থন করেছেন, তেমনি অন্য দেশের স্বাধীনতা-ধ্বংসকারী যুদ্ধের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। যদি কেউ স্বদেশের প্রতি আঘাত হানে, সেখানে প্রত্যাঘাত করাই সৈনিকের ধর্ম। অন্যদেশ লুণ্ঠন করা সৈনিকের সত্য নীতি নয়।

"হিংসুটে ঐ জীবগুলো ভাই নাম ডুবালে সৈনিকের,
তাই তারা আজ নেস্ত-নাবুদ, আমরা মোটেই হই নি জের!
পরের মুলুক লুট ক'রে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত!"

এই সূত্রে শেলী (Shelley)-র কথা আমাদের মনে না পড়ে পারে না। স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী শেলী যে কোন স্বাধীনতাহন্তার প্রতি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করতেন। নেপোলিয়নের পতনের পর তিনি লেখেন,

"I hated thee, fallen tyrant! I did groan
To think that a most unambitious slave,
Like thou, shouldst dance and revel on the grave
Of Liberty."[১]

বায়রণ (Byron)-এর 'Ode to Nepoleon Buonaparte' কবিতায় এই একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল ইস্‌লাম সৈনিকরূপে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁর কাছে যুদ্ধের গৌরবময় ও আনন্দপূর্ণ দিকের পাশাপাশি তার বীভৎস ও ভয়ঙ্কর দিকও ফুটে উঠেছে। যুদ্ধ তখনই গৌরবময় যখন তা কোন পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামে পরিণত হয়। সৈনিক জীবনে উত্তেজনা ও আবেগ থাকলেও মূলত তা অতীব দুঃখপূর্ণ। ইংরেজী সাহিত্যের সৈনিক কবিদের (Soldier Poets) মধ্যে রূপার্ট ব্রুক, (Rupert Brooke), জুলিয়ান গ্রেনফেল (Julian Grenfell) ও উইলফ্রেড ওয়েন (Wilfred Owen) সমধিক প্রসিদ্ধ। এই তিনজন কবিই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারা যান। রূপার্ট ব্রুক ও জুলিয়ান গ্রেনফেল যুদ্ধকে বীর্যবত্তা ও মহত্ত্বের প্রকাশক্ষেত্র বলে উচ্চকণ্ঠে তার গৌরবের কীর্তন করেছেন। অপরপক্ষে ওয়েনের কবিদৃষ্টিতে যুদ্ধের বীভৎস, নৃশংস ও ভয়াবহ রূপই ধরা পড়েছে। রূপার্ট ব্রুক সৈনিক জীবনের উন্মাদনা ও

১ Shelly : Feeling of a Republican on the Fall of Bonaparte

আনন্দউল্লাসের জয়গাথা গেয়ে বলেছেন যে সৈনিকেরা মৃত্যুর পর এক অখণ্ড গৌরবের অধিকারী হয়।

"And after,

Frost, with a gesture, stays the waves that dance

And wandering loveliness. He leaves a white

Unbroken glory, a gathered radiance,

A width, a shining peace, under the night." [১]

ওয়েন তাঁর একটি অসমাপ্ত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন,

"This book is not about heroes. English poetry is not yet fit to speak of them.

Nor is it about deeds, or lands, nor anything about glory, honour, might, majesty, dominion, or power, except War.

Above all I am not concerned with Poetry.

My subject is War, and the pity of War.

The Poetry is in the pity.

Yet these elegies are to this generation in no sense consolatory. They may be to the next. All a poet can do to-day is warn. That is why the true Poets must be truthful."

অকালমৃত্যুর জন্যে ওয়েন তাঁর এই বই শেষ করে যেতে পারেন নি।

নজরুলের কাব্যে যুদ্ধের আবেগ ও গৌরবময় রূপ যেমন ফুটেছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে তার কুৎসিত ও ঘৃণ্য মূর্তি। স্বাধীনতার সংগ্রামকেই নজরুল সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। দেশের মুক্তি-সাধনায় যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হতে বলেছেন দেশবাসীদের। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তিনি মোটেই সমর্থন করেন নি। তিনি বুঝেছেন যে আঘাতকে আঘাত দিয়েই প্রতিরোধ করতে হয় এবং মহৎ কার্যে প্রাণবিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হওয়া ভীরুরই শোভা পায়। তবে যে কোন রকমের যুদ্ধই হোক, তা যে ভয়ঙ্কর, দুঃখপূর্ণ ও বিষাদ-করুণ, এ কথা তাঁর কাব্যের বহুস্থানে ব্যক্ত হয়েছে। 'কামাল পাশা' কবিতাটিতে যুদ্ধসম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট বর্তমান রয়েছে।

---

১ **Rupert Brooke : The Dead**

বীররসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণে কবিতাটির মানবিক আবেদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন জায়গায় ব্যঙ্গের কশাঘাত থাকায় মূলবক্তব্য হয়েছে মর্মভেদী।

কামালের মুক্তিসংগ্রামের বিজয়োল্লাসে কবি আনন্দে ও উত্তেজনায় দিশাহারা।

"ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্‌সে সামাল সামাল তাই।
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!
হো হো কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!"

দেশের মুক্তিযুদ্ধের নিমিত্ত আত্মবলিদানকে কবি মহৎধর্ম বলে মনে করেন। মৃত্যুঞ্জয় শহীদের জন্যে কবি অশ্রুপাতের বিরোধী, কেননা দেশ সেবার গৌরবে তারা ধন্য।

"মৃত্যু এরা জয় ক'রেছে, কান্না কিসের?
আব্‌-জম-জম আনলে এরা, আপনি পিয়ে কল্‌সী বিষের!
কে ম'রেছে? কান্না কিসের?
বেশ ক'রেছে!
দেশে বাঁচাতে আপ্‌নারি জান শেষ ক'রেছে!
বেশ ক'রেছে!!
শহীদ ওরাই শহীদ!"

জুলিয়ান গ্রেনফেলের কবিতায় যুদ্ধের এই আবেগোজ্জ্বল রূপই বন্দিত।

"And Life is Colour and Warmth and Light,
And a striving evermore for these;
And he is dead who will not fight,
And who dies fighting has increase." ১

যুদ্ধের এই গৌরবোজ্জ্বল মূর্তির পাশাপাশি নজরুলের চোখে যুদ্ধের বেদনাবিধুর রূপও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সৈনিকের জীবন ও তার আত্মত্যাগ আদর্শ নিয়ে সাহিত্যিক সাহিত্যসৃষ্টি করেন, লোকে তার জন্যে দুঃখও প্রকাশ করে, কিন্তু কবি জানেন, তার ব্যথায় প্রকৃত ব্যথিত কেউ নেই।

১ Julian Grenfell : Into Battle

"তাই যত আজ লিখনে-ওয়ালে তোদের মরণ ফুর্তি-সে জোর্ লেখে
এক লাইনে দশহাজারের মৃত্যু-কথা! হাসি রকম দেখে!
ম'রলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ-গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর ম'রেছে দশ হাজার সৈনিকে!"
আঁখির পাতা ভিজলো কিনা কোনো কালো চোখের,
জান্‌লে না হায় এ জীবনে ঐ সে তরুণ দশটি হাজার লোকের!
প'চে মরিস পরিখাতে, মা বোনেরাও শুনে বলে 'বাহা'!
সৈনিকেরই সত্যিকারের ব্যথায় ব্যথী কেউ কি রে নেই?......"

এই তীব্র ব্যঙ্গ, স্বভাবতই ওয়েনের 'Anthem for Doomed Youth' শীর্ষক কবিতাটিকে স্মরণ করায়।

"No mockeries for them from prayers or bells,
Nor any voice of mourning save the choirs,—
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires."

এই কারুণ্যমিশ্রিত ব্যঙ্গে যুদ্ধের অন্তঃসারশূন্যতা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা এবং সর্বোপরি সৈনিকজীবনের ট্র্যাজিডি তীব্র ও তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মত আমাদের মর্মভেদ করে। যুদ্ধের ব্যর্থতা চিত্রণে এই কবিতাটির সঙ্গে ওয়েনের 'Futility' কবিতার সমধর্মিতাও লক্ষণীয়।

কবিতাটির অগ্রগতি সবিশেষ প্রশংসনীয়। সৈনিকদের মার্চের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিতাটিতে তাদের জীবনের উত্তেজনা ও বিষণ্ণতা আশ্চর্যরূপে ফুটে উঠেছে। কয়েকটি ঘরোয়া উপমা ব্যবহার করায় যুদ্ধের রূঢ়, নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন মূর্তি অনেক বেশী ভয়ংকরতায় প্রতিফলিত হয়েছে। সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সামজিক জীবনের মধ্যে ফিরে না এলে এই রকম মানবিক আবেদনপূর্ণ পংক্তি রচনা অসম্ভব—

"আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত-চেলী প'রে,
আঁধার-শাড়ী প'রবে এখন পশ্‌বে যে তোর গোরের বাসর-ঘরে!—
ভাব্‌তে নারি, গোরের মাটী ক'রবে মাটী এ মুখ কেমন ক'রে—
সোনার মানিক ভাইটী আমার ওরে!"

বাংলা সাহিত্যে 'কামাল পাশা' একটি অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা।

'শাত্-ইল-আরব' কবিতটির মধ্যে নজরুলের কবি-মানসের একটি বিশেষ রূপ প্রতিফলিত। আরবের বর্তমান দুরবস্থার কথা জেনে তিনি সে-দেশের গৌরবময় অতীত রূপের ধ্যান করেছেন। এই সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের পরাধীনতার কথাও মনে হয়েছে। বস্তুত কবি স্বদেশের দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত বলেই আরবের বর্তমান দৈন্য ও ব্যথাকে অনুভব করতে সমর্থ। কবি বঙ্গবাহিনীতে (Bengal Regiment) যোগদান ক'রে করাচী পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আরবের বেদনায় ব্যথিত হয়ে কবি তার শৌর্য-বীর্যকে স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যপ্রীতি নজরুল-কবিমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি যে কোন মুক্তিযুদ্ধেরই সৈনিক। হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতি সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাও কবির মধ্যে পরিস্ফুট—

"ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে জননী আমার! বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর!
রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু ফোঁটা ভক্ত-বীর!
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির!"

'শাত্-ইল-আরবে'র মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' গানটির অনুরণন সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই বায়রণের 'Don Juan' গ্রন্থের Canto III-র "The isles of Greece" কবিতাটি স্মরণ-পথে উদিত হয়। কবিতাটির শেষ স্তবকে বায়রণের মুক্তিপিপাসা ও গ্রীসের জন্তে তাঁর বেদনাবোধ অদ্ভুতভাবে রূপায়িত।

"Place me on Sunium's marbled steep,
Where nothing, save the waves and I,
May hear our mutual murmurs sweep;
There, swan-like, let me sing and die:
A land of slaves shall ne'er be mine—
Dash down you cup of Samian wine!"[১]

[১] George Gordon Lord Byron : Don Juan, Canto III

স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও ঐতিহ্যপ্রীতিতে বায়রণের সঙ্গে নজরুলের একাত্মতা লক্ষণীয়। ক্রিটো (Crito), আর্নেস্ট জোনস (Ernest Jones) প্রমুখ চার্টিস্ট আন্দোলনের কবিরা স্বাধীনতাস্পৃহার দিক দিয়ে নজরুলের সমগোত্রীয়। ক্রিটো ঘোষণা করছেন, তাঁর 'Ode to Liberty' কবিতায়—

"Devoid of Liberty what's life ?
A shadow and a name ;
An undivided scene of strife,
Of misery and shame."[১]

'A Song for the People' কবিতায় আর্নেস্ট জোন্‌সের কণ্ঠে শুনি—

"We seek not strife—and we value life,
But only when life is free ;
And we'll ne'er be slaves—to idle knaves,
whatever the cost may be."[২]

'রণভেরী', 'খেয়াপারের তরণী', 'আনোয়ার', 'কোরবানী' ও 'মোহর্‌রম' কবিতাগুলির মধ্যে কবি মুসলমান-সমাজজীবনের বর্তমান দৈন্য ভীরুতা ও ব্যর্থতার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের শঙ্কাহরণ অভয়মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি তাদের ডাক দিয়েছেন দেশের মুক্তিরণে অংশ গ্রহণ করতে। কবির আক্ষেপ, 'ঐ ইস্‌লাম ডুবে যায়!'

স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক হিসেবে কবি সকলকে আহ্বান করে বলছেন,

"লাল-পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা,
মরি জালিমের দাজায়।
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি' জয় স্বাধীনতা গাই !
ওরে আয়!"[৩]

'কোরবানী'র খুনেই সত্যমুক্তি স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবপর।

[১] An Anthology of Chartist Literature : Page 112
[২] Ibid : Page 151
[৩] রণ-ভেরী : অগ্নিবীণা

"ওরে সত্যমুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন!"[১]

'কোরবানী' কবিতাটির একটি জন্মবৃত্তান্ত আছে। তরীকুল আলম ব'লে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বরযুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই সময়েই নব্যতুর্কীরা স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে জান কোরবান দিচ্ছিল। তখন নজরুল এই 'কোরবানী' কবিতাটি লিখে প্রচণ্ডভাবে এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে সমর্থন করেন।

'খেয়াপারের তরণী' সম্পর্কে ১৩২৭ সালের (১৯২০) কার্তিক মাসের 'নারায়ণ' মাসিকপত্র লিখেছিলেন,

"গোড়ায় একটি ছোটমেয়ের আঁকা ছবি—খেয়াপার। নজরুল তার উপযোগী একটি কবিতা লেখেন।

ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্—এর একটা টান আছে। ভগবানের রুদ্র উদ্যতবজ্র রূপ গোড়ায় সাধকের ভাল লাগে। কিন্তু যে আপ্ত যে ভগবানকে পেয়েছে, সে ভীষণের মাঝে সুন্দরকেই দেখে—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর আর কি ভয় থাকে? পাপপুণ্য এ সব বঁধুর সঙ্গে চেনাচেনির অভাবের কথা।"

১৩২৭ সালের (১৯২০) ভাদ্র মাসের 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলাল "খেয়াপারের তরণী'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

"কাজীসাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও, মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুরসৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ-গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর,

---

১ কোরবানী : অগ্নিবীণা

শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উস্‌মান উমর্ আলী-হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান—লা শরীক আল্লাহ্!

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে;—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ্'—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি রচনার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। ঢাকার নবাব পরিবারের কোন মহিলা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশের জন্যে একটি ছবি পাঠান। ছবির ভাবটি ছিল—তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলধি-বক্ষে একটি তরণী এগিয়ে চলেছে। তরণীটির চারটি দাঁড় ও একটি হাল। চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবী হরফে লেখা—আবুবকর, ওমর্, উস্‌মান ও আলি। এঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের চারজন মহামান্য খলিফা, পরে হজরতের 'আস্‌হাব' নামে পরিচিত। হালের মাথায় ও পালের মধ্যে যথাক্রমে হজরত মহম্মদের নাম ও শাফায়াৎ লেখা ছিল। এই ছবিটির কোন নাম ছিল না। এই ছবিটিকে উপলক্ষ্য করেই নজরুল 'খেয়াপারের তরণী' রচনা করেন।

'মোহর্‌রম' কবিতাটি (মোসলেম ভারত, আশ্বিন ১৩২৭) ব্যথার গাঢ়তায় ও ছন্দের নৈপুণ্যে মর্মস্পর্শী। এটি একটি আবেগদীপ্ত মর্মিয়াগীতি। এতে ব্যক্ত হয়েছে খেলাফৎ আন্দোলনের যুগে মুসলমানসমাজের লক্ষ্যহীন অনির্দেশ্য মানসিকতা। বর্তমানে বর্জিত এই শেষ দুটি পংক্তি লক্ষিতব্য—

"দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইস্‌লাম।
লোহু লাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম॥"

কবি মুসলমান সমাজকে আহ্বান করছেন রক্তের মূল্যে তাদের হৃত-গৌরব ও আহতসম্মানকে পুনরুদ্ধার করতে।

"ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,—
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্‌ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুস্‌লিম কারো শির,—⋯

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো ওঠ মুস্‌লিম হাঁকো হাইদরী হাঁক।
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক।"

কবিতাটি ১৩২৯ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখের 'ধূমকেতু'তে পুনর্মুদ্রিত হয়।

এই কবিতার মূলভাবটি প্রাণস্পর্শী আবেগোজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে 'ধূমকেতু'র মোহর্‌রম সংখ্যায় (১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯) নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে।

"কোথায় কারবালা-মাতম তা কি দেখেছ অন্ধ? একবার চোখ খুলে দেখ,—দেখবে কোথায় কারবালার দুপুরে'-মাতম হাহাকার-রবে ক্রন্দন করে ফিরছে। আজ কারবালা শুধু আরবের ঐ ধু ধু সাহারার বুকে নয়, ঐ ফোরাত নদীর কূলে নয়—আজ কারবালার হাহাকার ঐ নিখিল নিপীড়িত মুসলিমের বুকের সাহারায়, তোমার অপমান-জর্জরিত অশ্রু-নদীর কূলে।⋯⋯ ঐ শোনো কাসেমের অতৃপ্ত আত্মা ফরিয়াদ করে ফিরছে—"তৃষ্ণা তৃষ্ণা!" কে দেবে এ তৃষ্ণাতুর তরুণকে তৃষ্ণার জল? এ তৃষ্ণা আব-জমজম আবে কওসরেও মিটবার নয়। এ কারবালার মরুদগ্ধ পিয়াসী চায় নিখিল মুস্‌লিম তরুণের রক্ত, ধর্ম আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ-বলিদান। কে আছ অরুণ খুনের তরুণ শহীদ মুসলিম, কাসেমের এ তৃষ্ণা এ ক্রন্দন-তিক্ততা মেটাবে?

ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকীনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইসলামের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে কাসেমের মত প্রাণ-বলিদান।"

মুসলমানসমাজকে জাগ্রত করার চেষ্টা যেমন তিনি করেছেন, তেমনি হিন্দুসমাজকে অন্ধতা, দৈন্য, ক্লীবত্ব ও আত্মবিস্মৃতি দূর করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার

জন্যে ডাক দিয়েছেন 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা' ও 'আগমনী' শীর্ষক কবিতায়। এই দুটি কবিতাই তখনকার সমাজে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

১৩২৯ সালের মাঘ মাসের (১৯২২) 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকার' পুস্তকপরিচয়ে নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থটি সমালোচিত হয়।

"বিদ্রোহীর বীর-কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ বাংলাদেশে পরিচিত। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকাতেই কাজী সাহেবের 'হাতে-খড়ি' হইয়াছিল।······এই কবিতা-গ্রন্থে (১) প্রলয়োল্লাস (২) বিদ্রোহী (৩) রক্তাম্বর-ধারিণী মা (৪) আগমনী (৫) ধূমকেতু (৬) কামালপাশা (৭) আনোয়ার (৮) রণ-ভেরী (৯) শাত-ইল-আরব (১০) খেয়াপারের তরণী (১১) কোরবানী (১২) মোহর্‌রম এই দ্বাদশটি বাছা বাছা কবিতা আছে। এতদিন বাংলার কাব্যকুঞ্জে প্রেমের কবিতাই অজস্র ফুটিত, বীর-বীণার ঝংকার কচিৎ শুনা যাইত। কিন্তু অগ্নিবীণার প্রত্যেকটি কবিতাই বীরত্বব্যঞ্জক—মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। নৃত্যদোদুল ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গিমাবিকাশে কবি অপূর্ব গুণপনা দেখাইয়াছেন। কবি বাঙালী পল্টনে হাবিলদারের কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, 'কামাল পাশা' কবিতায় তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে,—বাংলা সাহিত্যে ইহা একেবারে অভিনব জিনিস। কবির এই বীরভাব অনেক কবিতাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রসিন্ধুমন্থন করিয়া কবি যে সব অনুপম উপমা সংযোজন করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়।·········কবি-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটখানি পুস্তকের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।"

১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসের (১৯২৪) 'বঙ্গবাণী' 'অগ্নিবীণা' সম্পর্কে লিখেছিলেন,

"কবিতাগুচ্ছের অগ্নিবীণা নাম সার্থক হইয়াছে ; কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে আগুনের ফুল্কি ছুটিয়াছে, আর কোথাও বা সে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে।"

তখনকার দিনের অন্যতম অভিজাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"গ্রন্থখানির সব কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়, যে যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ আজ আপনার ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে

সেই যুগ-নির্মাতা রুদ্র-দেবতার আগমনধ্বনি গ্রন্থখানিতে শুনিতে পাওয়া যায়।"[১]

মুসলমান সমাজের এক রক্ষণশীল অংশ 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে নজরুল ইস্‌লাম ধর্মের শত্রু ও তাওহীদের মূল উৎপাটন করে পৌত্তলিকতা-প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ১৩৩৫ সালের (১৯২৮) কার্তিক মাসের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে নজির আহ্‌মদ চৌধুরী 'এছলাম ও নজরুল ইসলাম' নামে প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক।

"যে কবিতাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা স্ফুরণ লাভ করিয়াছে বলিয়া বলা হয়—সেখানে তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব হইতেছে—খোদাকে অস্বীকার করিয়া, অমান্য করিয়া, অপমান করিয়া। উদাহরণস্বরূপ মুছলমান পাঠক-পাঠিকাগণকে কবির "অগ্নিবীণা" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। খোদাতালার প্রতি অতি জঘন্য ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তাঁহার এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব।...

ভক্তি ও বিদ্রোহের এই উভয় আদর্শ একই কবি সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটায় তাওহীদের মূলোৎপাটন, অন্যটায় পৌত্তলিকতার প্রতিষ্ঠা। প্রথম স্থলে তিনি বিদ্রোহী, দ্বিতীয় স্থলে অনুরক্ত ভক্ত।

.........খোদাকে মান্য করা আর অ-খোদাকে ঈশ্বররূপে মান্য না করাই সমস্ত সত্যধর্মের মৌলিক সাধনা। এছলাম এই সাধনাকে পূর্ণরূপ দিয়া, বাস্তব রূপ দিয়া বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। কবি নজরুল ইসলাম এছলামের এই চরম ও পরম শিক্ষার মূল কাটিতে চাহিয়াছেন—একদিকে আল্লাহকে অমান্য করিয়া, তাঁহার বুকে পদাঘাত করার ও হাতুড়ি ঠোকার চরম ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া; অন্যদিকে কালী দুর্গা সরস্বতী প্রভৃতির পূজা অর্চনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পাইয়া। সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে এছলামের সর্বপ্রধান শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

'অগ্নিবীণা'র পর নজরুলের 'দোলন-চাঁপা' নামক দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'অগ্নিবীণা'ধারী বিদ্রোহী কবির মর্মলোকে যে প্রেমের পিপাসা অতৃপ্ত অবস্থায় কেঁদে ফিরছিল, তাই এই গ্রন্থে অসামান্য কাব্যপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিদ্রোহী কবির উদ্দীপ্ত আবেগ এখানে

১ প্রবাসী : চৈত্র ১৩৩০ সাল

একটি নির্দিষ্ট পথের পথিক হলেও তা এমনই উদ্দাম ও দুর্বার যে মাঝে মাঝে তার দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটেছে। 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবি আত্মহারা। যে আত্মস্থ অবস্থা মহৎ কবিতার জন্মভূমি এখানে তার অভাব ঘটাতে অনেকগুলি কবিতা মাত্রাজ্ঞানের অভাবে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ। এখানে কবির 'মন ছুটেছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে'। সূচীপত্রের আগে স্থাপিত 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতাটি ১৩৩০ সালের (১৯২৩) জ্যৈষ্ঠমাসের 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। পরিচয়লিপিতে এই কবিতাটির বিষয়ে লেখা ছিল,

"বন্দী-কবি নজরুল 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' আত্মহারা হয়ে যে সুরলহরী তুলেছেন, আপনাদের সেই সুখের ভাগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ করছি।"

এই সময় নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী ছিলেন। তৎসম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রে সেবার (১৯২৩) পূজোর সময় 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক সুদীর্ঘ উদ্দীপনাময় কবিতা লেখার জন্যে তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইতিপূর্বে নজরুল যখন ১৯২১ সালে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন, তখন সেখানে বীরেন্দ্র সেনগুপ্তর বিধবা জ্যেঠীমা গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলার (ডাক নাম দুলি) সঙ্গে তার প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু বিবাহের কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা দাঁড়ায় না। এই সময় নজরুল আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে নজরুলের বিবাহ-বন্ধন হলেও তিনি চিরকালের মত তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। নজরুলের প্রথম বিবাহের ব্যর্থতা এবং প্রমিলার সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারের সংশয় ও অনিশ্চয়তা তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত ও উদ্বেলিত করেছিল। 'দোলন-চাঁপা'র মধ্যে কবির প্রেম-সম্পর্কিত অস্থির মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রেমিকের বিচিত্র প্রণয়লীলা ও তার মানঅভিমান -অনুরাগবিরাগ দ্বন্দ্বসংশয় প্রভৃতি সব রকম ভাবই 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত।

'দোলন-চাঁপা'র রচনাকাল ও তার মূল স্থায়ীভাব সম্পর্কে ব্রজবিহারী বর্মন যা লিখেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

"প্রেসিডেন্সী জেলে অবস্থানকালেই কবি তাঁর চতুর্থ বই 'দোলন-চাঁপা' রচনা করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে তার সবগুলো কবিতাই বাইরে পাচার করে দেওয়া হয়। পবিত্রদা' (শ্রীযুত পবিত্র গাঙ্গুলী) ওয়ার্ডারদের যোগাযোগে তা বার করে আনেন এবং কবির নির্দেশ মত 'আর্য পাবলিশিং

হাউসে'র কর্মকর্তাদের হাতে প্রকাশ ভার দেন। যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হয়।

কবির কারাবাসের সুযোগে তাঁর মানসী-প্রিয়া তাঁকে অগ্রাহ্য করে অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী হতে যাচ্ছেন এই পটভূমিকায় রচিত হয় 'দোলন-চাঁপা'।"[১]

কুমিল্লাবাসী জনৈক উকিলে কাছে শোনা, প্রমীলার ডাক নাম ছিল দোলন। দুলি এই দোলনের অপভ্রংশ। হয়ত উভয় নামেই তাঁকে ডাকা হত। এই দোলনের থেকেই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'দোলন-চাঁপা'। দোলন বা দুলির সঙ্গে হৃদয়লীলার বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল স্বাক্ষর পড়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। হৃদয়বিহারের অবশ্যম্ভাবী স্বপ্নসাধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির নামকরণেও পরিস্ফুট, যেমন—'দোদুল দুল', 'বেলাশেষে', 'পউষ', 'পথহারা', 'ব্যথাগরব', 'উপেক্ষিত', 'সমর্পণ', 'পূবের চাতক', 'অবেলার ডাক', 'চপল-সাথী', 'পূজারিনী', 'অভিশাপ', 'আশান্বিতা', 'পিছুডাক', 'মুখরা', 'সাধের ভিখারিনী', 'কবি-রানী, 'আশা' ও 'শেষ প্রার্থনা'।

'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে ১৩৩০ সালের (১৯২৪) চৈত্র মাসের 'প্রবাসী' মন্তব্য করেছিলেন,

"কবিতাগুলির ভিতরকার কথা—প্রিয়ের জন্য বেদনা-উচ্ছ্বাস। 'পূজারিনী' কবিতাটি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কবিতাটিই বইখানির শ্রেষ্ঠ কবিতা,—প্রেম-পিপাসার অপূর্ব প্রকাশ।"

'পূজারিনী' কবিতাটি অতিকথন-দোষে দুষ্ট হলেও এর মধ্যে নজরুলের প্রেমধারণার একটি বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে বলে এটি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। বস্তুত শুধু 'দোলন-চাঁপা'রই নয়, সাধারণভাবে নজরুলের অপর প্রেম-কাব্যগ্রন্থগুলির মূল সুরও এটিতে ধ্বনিত।

'পূজারিনী' কবিতায় নজরুল দেহগত প্রেমের অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটনে উন্মুখ হয়েছেন। পূজারিনী কবির জীবন্ত মানস-প্রতিমা। পূজারিনীর সঙ্গে তাঁর প্রেমরহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে কবি দুজনের জন্মজন্মান্তের মিলন-বিরহ, আশানিরাশা, মানঅভিমান প্রভৃতির দ্বন্দ্বমুখর কঠোরমধুর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। জন্মজন্মান্তরের প্রেমভালবাসা ও জীবনতৃষ্ণা কবির মধ্যে আছে বলেই তাঁর কবিত্ব। পূজারিনীর পরিচয়ে কবি বলেছেন,

"চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে মোর অনাদৃতা সীতা।

---

১ ফসল, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৬৫ : পৃ ২৭০

কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্ত কুমারী সতী; তব দেব-পূজায় থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপ-ভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা!
নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী
আমি তব কবি।"

কবি প্রেয়সীকে পূজারিনী বলে কল্পনা করাতে প্রেমের একটি শুদ্ধ পবিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। এটি বাংলার অলৌকিক প্রেমকল্পনার সঙ্গে কবির পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে অনুভূত হয়। তাঁর কাছে প্রেমলীলা দেবপূজারই উপায়। এতৎসত্ত্বেও নজরুলের প্রেম প্রধানত মানবিক, দেহস্পর্শতপ্ত ও লৌকিক ভাবাপন্ন। তাই প্রেমিকার পূজারিনী মূর্তিকে কখনও ছলনাময়ী বলে কবির সংশয় জাগে ও তার একনিষ্ঠ প্রেমকে মিথ্যা বলে মনে হয়। এই মানবিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাঁর প্রেমকে অনেক স্পর্শসাধ্য ও প্রাকৃত করে তুলেছে।

প্রথমে কবি প্রিয়ার উদ্দেশে আবেগগাঢ় কণ্ঠে বলেন,

"যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি, চিনি, চিনি!"

নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'নতুন চাঁদে'র 'চির-জনমের প্রিয়া' কবিতাটি ভাবের সামঞ্জস্যহেতু এই সঙ্গে পঠিতব্য।

প্রেম-পরিক্রমার পথে জন্মজন্মান্তরের ইতিহাসে কখনও প্রিয়ার প্রেম সম্পর্কে কবি সন্দিহান হ'য়ে উঠে মানবিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হন।

হতাশায় বেদনায় তিনি আর্তনাদে ফেটে পড়েন।

"এ-তুমি আজ সে-তুমি তো নহ;
আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী!"

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কবির প্রশ্ন শোনা যায়—

"—হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিনী,
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী?"

প্রেমের ক্ষেত্রে একজন নারীর ছলনায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে কবির মন সমগ্র নারী-জাতির প্রতি আক্রোশে ভরে ওঠে। হতাশপ্রেমিকের এই মানবিক অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা ও ক্ষোভ নজরুলের প্রেমকে অনেক বেশী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ভোগসাধ্য ও দেহমুখী করে তুলেছে। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও ক্ষোভে উদ্বেলিত কবি বলে চলেন,

"ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহুজন!............
যে পূজা পূজি নি আমি স্রষ্টা ভগবানে
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে!"

উন্নত কাব্যধর্মে এই সব পংক্তি মণ্ডিত না হলেও এদের স্বাভাবিকতা মনকে স্পর্শ করে। কুমিল্লায় প্রমীলা সেনগুপ্তর সঙ্গে বিবাহের অনিশ্চয়তা তাঁর মনে যে প্রেমিকসুলভ সংশয় ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছে এইসব ব্যথায়-ভাঙা পংক্তিতে।

প্রিয়ার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক পরিকল্পনা পৃথিবীর বিভিন্ন মহৎকবির প্রিয় বিষয়বস্তু। এই দূরবিস্তৃত আত্মীয়তার ধারণায় প্রেমের গভীরতা, মহনীয়তা ও উজ্জ্বলতা প্রকাশিত। যুগযুগান্তরের কড়িকোমল সুরে, আলো-ছায়ার আলিম্পনায় ও সদাসতের ব্যঞ্জনায় প্রেম জীবনের আলোকে নূতন ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নজরুল বলেন,

"বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চিরপূজারিনী!"

রবীন্দ্রনাথের 'অনন্তপ্রেম' কবিতায় শুনি,

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার—
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার॥"

১ অনন্তপ্রেম : মানসী

'স্মৃতি' কবিতায় প্রিয়ার দেহের দিকে চেয়ে কবি বলেন,

"ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব-জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।"[১]

যতীন্দ্রনাথের কাব্যেও প্রেমের চিরন্তনতা রূপায়িত।

"আমরা দু'জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা!"[২]

এই প্রসঙ্গে Dante Gabriel Rossetti-র 'Sudden Light' শীর্ষক অপূর্বসুন্দর আবেগগাঢ় ক্ষুদ্রনিটোল কবিতাটির কথা মনে হয়।

"You have been mine before,—
How long ago I may not know:
But just when at that swallow's soar
Your neck turned so,
Some veil did fall,—I knew it all of yore."

পূর্বস্মৃতি ও জন্মজন্মান্তরের বাসনার বর্ণবৈচিত্র্যেই বাস্তবপ্রিয়া কবির কল্পনায় অসাধারণ সৌন্দর্য ও মধুরতায় অপরূপ হয়ে ওঠে। পুরুষের বাসনা-লোকেই নারী পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; কেননা নারীকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।' কাব্যের নারী কবির এই বাসনাময়ী নারী। শেক্সপীয়র বলেছেন, 'Beauty is lover's gift.'

জীবনে যৌবনপ্রেমের আবির্ভাবকে কবি স্পর্শকাতর দে[illegible]বোন্মুখ ও তীব্র অন্তর্জ্বালাময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই সময় প্রেমের অপূর্ব রমণীয় ব্যথার উৎসসন্ধানে প্রেমিকের মন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। প্রকৃতির লতাপাতা ফুলপাখি প্রভৃতি সকল বস্তুই প্রেমিকের কাছে ব্যথাকুল বলে মনে হয়। পৃথিবী যেন যৌবনাতুর কোন প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ।

---

[১] স্মৃতি : কড়ি ও কোমল
[২] বোঝা : সায়ম্

"দু'দিন না যেতে একি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি' অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্মমূলে!
খুঁজে ফিরি, কোথা হ'তে এই ব্যথা-ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—
আকাশ, বাতাস, ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে!

....

কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হ'তে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে; দিগন্তর তুলি' ওঠে মোর ক্ষিপ্ত
হাহাকার ত্রাসে!
কস্তুরী হরিণ সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!
আপনারই ভালবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা!"

প্রেমিকহৃদয়ের এই অস্থির উদ্বেলিত ও দিশাহারা অবস্থার বর্ণনায় স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' কবিতাটি মনে পড়ে—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুনরাতে দক্ষিণবায়ে কোথা দিশা খুঁজে পাই না—
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না॥"[১]

যৌবনজ্বালায় অস্থির অতৃপ্ত প্রেমিক তার অন্বিষ্টার জন্যে শান্তিহীন। তাই তার সেই চিরন্তন প্রশ্ন—

"কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই, শান্তি নাই!"

কবি প্রথমমিলনের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ পান। বিরহের মাঝে প্রথম প্রীতি ও রাঙা সুখস্মৃতিকে স্মরণ ক'রে কবির মনে হয়—তাঁর জীবন ধন্য, তাঁর জন্ম সার্থক। মৃত্যুগ্রস্ত অধরে প্রিয়ার নাম জপ ক'রে কবি অপূর্ব আনন্দের আস্বাদন করেন।

---

১ মরীচিকা: উৎসর্গ

"সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হ'ল—আমি আজ তৃপ্ত হয়ে মরি!
না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে—শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজি আমি শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি!"

প্রেমের স্মৃতি প্রেমিকের জাগতিক সমস্ত সম্পদের চেয়ে মহার্ঘ। প্রেমিক তার সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু প্রিয়ার মধুর স্মৃতিকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আঁকড়ে রাখতে চায়। Leigh Hunt-এর একটি ক্ষুদ্র কবিতায় এই ভাবটি আশ্চর্য আন্তরিকতায় ব্যক্ত হয়েছে।

"Jenny kissed me when we met,
Jumping from the chair she sat in;
Time, you thief, who love to get
Sweets into your list, put that in!
Say I'm weary, say I'm sad,
Say that health and wealth have missed me,
Say I'm growing old, but add,
Jenny kissed me."[১]

কবির প্রিয়া যদি দ্বিচারিণীও হয়, তবুও কবি তার পুরাতন প্রেমের মূল্য কখনও অস্বীকার করবেন না। কবির 'অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী' যে সত্তা তা প্রিয়ার পুরানো প্রণয়ের মধ্যে বিরহের ব্যথা-বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

"মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চিরস্বার্থপর লোভী,—
অমর হইয়া আছে—রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!"

Congreve-এর একটি গান এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। প্রিয়ার বর্তমান অবাঞ্ছিত পরিবর্তনে কবি দুঃখিত হলেও কোন প্রত্যাঘাতের কথা কখনও ভাবেন না; বরং তার পুরাতন ব্যবহারের জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন অকুণ্ঠভাবে।

১ Leigh Hunt: Jenny Kiss'd Me

"False though she be to me and Love,
I'll ne'er pursue Revenge;
For still the Charmer I approve,
Tho' I deplore her Change.
In Hours of Bliss we oft have met,
They could not always last;
And though the present I regret,
I'm grateful for the past."[১]

'পূজারিনী' কবিতাটিতে প্রেমিক তার দেহগত সমস্ত প্রেমসম্পর্ক নিয়ে উপস্থিত। শুধু দেহের কামজ বর্ণনায় প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় নি, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়চেতনার সব জ্বালা, অভিলাষ ও বাসনা নিয়ে প্রেম সামগ্রিক রূপে এখানে অভিব্যক্ত। এই সব জায়গায় নজরুলের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতলাল মজুমদারের একাত্মতা অনুভব করা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রকাব্যের আলো তাঁর কাব্যের আকাশে এসে পড়েছে। এতৎসত্ত্বেও আবেগপ্রবলতা ও মর্মজ্বালার তীব্রতায় তাঁর কয়েকটি প্রেমের কবিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বৈষ্ণব কবিতায় প্রেম বা অনুরক্তি ভক্তি অর্থে গৃহীত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তি বলতে প্রেমকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অপর নাম ভালবাসা। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।" বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেমকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটি রসই রতি এবং পাঁচটি রতির মধ্যে মধুর রতি শ্রেষ্ঠ। এই মধুর রতির প্রকাশই কান্তাপ্রেম। বাস্তব বা লৌকিক জগতের প্রিয় ও প্রিয়ার সম্পর্কের রূপকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের কান্তাপ্রেমকে বোঝানো হয়। কিন্তু আসলে এই প্রেম পরিশুদ্ধ ও প্রাকৃত রাগানুরাগের সঙ্গে বিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোন কোন স্থলে প্রেমের প্রসাধন প্রকাশিত হলেও সমগ্রভাবে তা অধ্যাত্ম সাধনের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। কাব্যজীবনের প্রভাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

১ William Congreve : 'False though she be......'

"ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
... ...
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের॥
....
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে।"[১]

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রেমসৌন্দর্যকে দৈহিক কামনাবাসনায় কলুষিত করতে অসম্মত। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি প্রথম জীবনের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে মর্ত্যপিপাসাময় ও দেহপ্রীতিমূলক কিছু কিছু কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন, অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ও ভোগবিমুখ। রবীন্দ্রনাথের প্রেম কাল থেকে কালাতীত, সীমা থেকে অসীম, রূপ থেকে অরূপ, পাত্র থেকে পাত্রাতীত, মরত্ব থেকে অমরত্বের দিকে প্রসারিত। ব্যক্তিগত প্রেম বৃহত্তর প্রেমসাধনার পাদপীঠ বইতো কিছু নয়। তাঁর প্রেম Algernon Charles Swinburne-এর মত কামজননী গ্রীকদেবী Aphrodite-এর আরতি করা নয়। তিনি দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে উত্তরণ করতে চান। মানবিক প্রেম তার সমস্ত জ্বালাবেদনা, আবেগউন্মাদনা ও আকাঙ্ক্ষাতৃষ্ণা নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের মূল ভাবস্রোতের সঙ্গে কখনই গভীরভাবে সংবদ্ধ হতে পারে নি।

মোহিতলালের আগে দেহপ্রতিষ্ঠিত প্রেমের উল্লেখযোগ্য অঙ্কুর দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) কাব্যে। দেহসর্বস্ব প্রেমের আদর্শে অসংস্কৃত ও অপরিণত হলেও গোবিন্দচন্দ্র

১ নিষ্ফল কামনা : মানসী

দাস বিশিষ্ট। গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রেমে একটা দুর্নিবার তীব্রতা বা প্যাশন ছিল। একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

"আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ!
আমি ও নারীর রূপে,
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি-কালীদহ—
ও কর্দমে—অই পঙ্কে,
অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।"[১]

দেবেন্দ্রনাথের প্রেম পত্নীর ঘরোয়া রূপপ্রসাধনে ও তার বিচিত্র গার্হস্থ্য-লীলার মধুরতায় মুগ্ধ।

"কস্তুরী-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত! তোমা লাগি ছুটিয়া ছুটিয়া,
ক্লান্ত-অবসন্ন-দেহে, প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম গৃহে শোভে অমূল্য রতন!"[২]

গোবিন্দচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ এই উভয়ের প্রেম প্রধানত পত্নীকেন্দ্রিক হলেও গোবিন্দ দাসের মধ্যে প্রেমের স্থূলদিকটার অর্থাৎ দেহের আকর্ষণের রূপায়ণ বেশী।

মোহিতলালই প্রথম বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও দুর্নিবার দেহাসক্তিকে তাঁর কাব্যে সার্থক রসমূর্তি দান করেন। তাঁর প্রেম পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চদীপ জ্বেলে দেহমন্দিরেই জীবনের আরাধনায় রত। মোক্ষের মিথ্যা মায়াকে অপসারিত করে মানুষের মনকে জীবনোন্মুখ করে তোলার জন্যে তিনি 'মোহমুদ্গর' রচনা করেন। দেহাত্মবাদী ও রূপতান্ত্রিক মোহিতলালের ঘোষণা—

"হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমা পানে।

১ আমার ভালবাসা : কস্তুরী
২ তুমি : গোলাপগুচ্ছ

তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহাপরিবেশ।—
দেহলীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে।"[১]

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমেরিকার দেহগত সর্বাত্মক প্রেমানুভূতির কবি ও দেহ-সংবদ্ধ আত্মার রূপকার ওয়াল্ট হুইটম্যানের উক্তি মনে পড়ে,—

"I am the poet of the body,
And I am the poet of the soul.
The peasures of heaven are with me and the
pains of hell are with me,
The first I graft and increase upon myself·········
the latter I translate into a new tongue."

[Walt Whitman : Song of Myself]

কিন্তু হুইটম্যানের প্রেম যেখানে দেহসীমায় আবদ্ধ, ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবে সেখানে মোহিতলালের প্রেম গভীরতর আনন্দতীর্থের পথিক ও কামনাতিরিক্ত সৌন্দর্যামৃত-আস্বাদনে উন্মুখ।

"আমার পিরীতি দেহরীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত,
ভস্মভূষণ কামের কুহকে দেখা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা
লাখো লাখো যুগে আঁখি জুড়াল না—
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সংগীত।"[২]

নজরুলের প্রেম মোহিতলালের প্রেমের মত গভীরতাসমৃদ্ধ, বর্ণৈশ্চর্যভূষিত ও প্রমত্তগতি না হলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জ্বালায় তা বেদনামধুর, আবেগ-স্পন্দিত ও প্রাণবন্ত। 'পূজারিনী' প্রভৃতি খুব স্বল্পসংখ্যক কবিতাতেই নজরুল সার্থকভাবে তাঁর প্রেমসিদ্ধান্তকে উপস্থিত করতে পেরেছেন। কেননা, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই শিল্পপ্রমূর্তির শিথিলতা ও আবেগপ্রাবল্যের জন্যে

---

১ মৃত্যুশোক : বিস্মরণী
২ স্মরগরল : স্মরগরল

রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। মোহিতলালের মত তাঁর প্রেম প্রধানত জীবন-নিবিড় ও দেহস্পর্শমুখর হলেও, দেহাতীতের ব্যঞ্জনাও তাতে অনুপস্থিত নয়। প্রণয়ের ছলাকলা ও মানঅভিমানের লীলালাস্যে নজরুলের প্রেম প্রজ্ঞা-স্বল্পতার জন্যে কতকটা অমার্জিত ও অগভীর হওয়া সত্ত্বেও জীবনঘনিষ্ঠ। কোন কোন ক্ষেত্রে কামনাবেগের দাসত্ববন্ধন স্বীকার করাতে তাঁর কবিতা Sensuousness-এর মাত্রা ছাড়িয়ে Sensual হয়ে উঠেছে। বস্তুত নজরুলের খুব অল্পসংখ্যক কবিতাতেই আবেগ ও প্রজ্ঞার যথার্থ সংযত মিলনে কবিত্বের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, নজরুল প্রধানত আবেগপ্রধান কবি আর মোহিতলাল প্রজ্ঞাপ্রধান কবি। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশিল্পদর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বুদ্ধিবাদী 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর উপর প্রেমধারণার ক্ষেত্রে নজরুলের চেয়ে মোহিতলালের প্রভাব খুব কম নয়।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের Robert Burns, Byron, John Donne, Swinburne, Keats, Whitman, Sandburg, Shelley, D.H. Lawrence প্রভৃতি দেহাত্মবাদী কবিই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর আদর্শস্থানীয় ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের সঙ্গে নজরুলের আন্তরিক যোগ ছিল না। এ দেশীয় ভাবধারা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর প্রেমধারণা উদ্ভূত। এইজন্যে মোহিতলালের চেয়ে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিতে Paganism-এর আধিক্য ও তার অসংস্কৃত রূপ দৃষ্ট হয়।

'দোলন-চাঁপার' প্রথম কবিতা মোতাকারিব্ ছন্দে লেখা 'দোদুল-দুল' কবিতায় কবি প্রিয়ার তুলনাহীন রূপবর্ণনা করেছেন। প্রিয়ার বাহ্যিক রূপব্যাখ্যা দেহাত্মবাদী কবিতার অন্যতম উপজীব্য।

> "মৃণাল-হাত
> নয়ন-পাত,
> গালের টোল,
> চিবুক দোল
> সকল কাজ
> করায় ভুল,
> প্রিয়ার মোর
> কোথায় তুল ?
> কোথায় তুল
> কোথায় তুল ?"

প্রেমিকের চোখে প্রিয়া সব সময়েই দ্বিতীয়রহিত ও তুলনাহীন। John Masefield-এর কথায়—

"But the loveliest things of beauty God ever has
showed to me
Are her voice, and her hair, and eyes, and the dear
red curve of her lips."[১]

Sandburg তাঁর 'The Great Hunt' কবিতায় লিখেছেন,

"I never knew
any more beautiful than you……"

পউষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কবি কাঙ্ক্ষিতার বিরহবেদনা টের পান।

"সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥"[২]

এই বেদনার কারণ কবির কাছে অজ্ঞাত নয়। পউষ হচ্ছে—'পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।' কিন্তু তবুও আশাবাদী কবি শুষ্ক দীর্ঘনিশ্বাসময় ও ক্রন্দনভারাতুর বিদায়মুহূর্তে যেন কার ভাঙা গলার স্বরে শুনতে পান,

"ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে॥"[৩]

কবিতাটি প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালে কবি রচনা করেন।

'পথহারা' কবিতার মধ্যে বেলা-শেষে ব্যথিত, উপেক্ষিত ও উদাস পথিকের অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে। সন্ধ্যার আবির্ভাবে যখন প্রকৃতির অন্তঃপুরে ও মানবসংসারে সুখের উৎসব, তখন বিরহ-উদাস পথিকের সামনে তার পথের রেখা গহন আঁধারের ধাঁধার মধ্যে লুপ্ত হয় এবং তার পথ-চাওয়ার কান্না তারায় তারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সেই সময়—

"আর কি পুবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।"

১ John Masefield : Beauty
২ পউষ : দোলন-চাঁপা
৩ ঐ

'ব্যথা-গরবে'র মধ্যে মনচোরের কঠোর অবহেলায় প্রেমিকার অন্তরের ব্যথাকে কবি নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রিয়-অনাদৃতা প্রেমিকা বিরহ-ব্যথাকে গর্বের বস্তু বলে মনে করে।

"এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরাণ-প্রিয়!
সেই পদ-চিন বক্ষে রেখে
ভগবানে কইব ডেকে—
'ছাই ভৃগুপদ, যাও হে দেখে
কি কৌস্তভ এ হিয়ায় রাজে!'
মরবে হরি হিংসা-লাজে॥"

'অবেলার ডাকে' একটি বিরহ-ব্যথাতুর নারীহৃদয়ের আর্তি প্রেমিকার ভাষণের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমিকা একদিন যৌবনগর্বে তার সাধের রাজ-ভিখারী প্রিয়তমকে দ্বার থেকে বিদায় দিয়েছিল। অনেক করেও যাকে ভালবাসতে পারে নি আজ অবেলায় তার কথাই বার বার মনে পড়ছে। অভাগিনীর গর্ব আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

আজ সে বুঝেছে যে, প্রিয়তম যে দেশে গেছে সেখানে ঝড়ের হাওয়াও যেতে পারে না। তবুও প্রেমিকার বুকে চিরন্তন প্রশ্নের ঢেউ ওঠে ও সেই সঙ্গে অসীম আকুলতার সৃষ্টি হয়।

"সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নাই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!
তবু কেন থাকি থাকি
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি!
যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন্ আছ্‌ড়ে মরে বুকের দ্বারে!"

কিন্তু কবি প্রেমের অমৃতশক্তিতে বিশ্বাসী। তাই প্রেমিকার উক্তিতে তিনি বলতে পারেন যে, প্রেমিকের মৃত্যু অভিমানজনিত ক্ষণকালের বিরহ ব্যতীত আর কিছু নয়; প্রেমিক প্রেমের শক্তিতে প্রেমাস্পদার কাছে ফিরে আসবেই, প্রেমিকা তার খোঁজে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও।

"যাই তবে মা! দেখা হ'লে আমার কথা ব'লো তারে—
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিনী ঠেল্‌তে পারে?

মাগো আমি জানি জানি
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজ্‌তে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
ব'লো তখন. খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে।"

প্রেমের অমরত্বের ধারণা অনেক প্রখ্যাত কবির প্রিয় কাব্যসিদ্ধান্ত। John Clare-এর সোজাসুজি বক্তব্য মনে আশ্বাস জাগায়—

"Love lives beyond
The tomb, the earth, which fades like dew!
I love the fond,
The faithful, and the true."[1]

Shelley-র 'The Sensitive Plant'-এ এই একই অনুভবের ঘোষণা—

"For love, and beauty, and delight,
There is no death nor change: their might
Exceeds our organs, which endure
No light, being themselves obscure."[2]

'অভিশাপ' কবিতাটি 'কল্লোলে' (শ্রাবণ ১৩৩০ সাল) আত্মপ্রকাশ করে। কবিতাটি সম্পর্কে পরিচয়লিপিতে লেখা হয়—

" 'অভিশাপ' যে বিশ্বপ্রকৃতির একটা ক্ষণিক বিদ্রোহ মাত্র তারই পরিচয় কবি নজরুলের কবিতার প্রতিবর্ণে দেখা দিয়েছে—

'আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হান্‌ত,
সেই আঘাতই যাচ্‌বে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত—'

আবার ঐ অভিশাপের অন্তরালে থাকে মানব মনের মমতার ছবি স্বপ্নের মাধুরী দিয়ে ঘেরা। মানুষ বাঁচে ঐটুকু নিয়ে।

মানব আত্মাকে একমাত্র ফুলেরই সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে ফুলেরই মত রূপ-রস-গন্ধে-ভরা এবং সে ফোটেও বুঝি পূজারই জন্যে। আপনাকে অসঙ্কোচে বিলিয়ে দেওয়ার নামই পূজা! এই পূজা যিনি গ্রহণ করেন, মানুষ তাঁকেই দেবতার চেয়ে বড় করে আপনার বুকে স্থান দেয়।"

১ John Clare: 'Love lives beyond the Tomb'
২ P. B. Shelley: The Sensitive Plant

'আশান্বিতা' (প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩০) কবিতাটির মধ্যে প্রেমের একটি চিরন্তন আশ্বাসের সুর ধ্বনিত। প্রেমিকা জানে—তার নাথ তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না ও সত্যকার প্রেমের কাছে তাকে হার মানতে হবেই। অশ্রুসিক্ত প্রেমের দুর্বার আকর্ষণী শক্তি প্রেমিককে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনে। প্রেমিক প্রেমিকার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে বুকে তুলে না নিয়ে পারে না। তাই প্রেমিকার উক্তি—

"যতই কেন বেড়াও ঘুরে
মরণ-বনের গহন জুড়ে
দূর সুদূরে,
কাঁদ্‌লে আমি আস্‌বে ছুটে, রইতে তুমি নার্‌বে নাথ!
সেই আশাতে জাগ্‌ব রাত।"

'পিছু-ডাক' কবিতায় আমরা প্রেমের একটি চিরন্তন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। নূতন সংসারে গিয়ে কি প্রেমিকা প্রেমিকের সব স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারবে?

"সখি! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় পড়বে কি আর মনে?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে॥"

'কবি-রাণী' কবিতায় কবি তার কবিত্বের মূল উৎসসন্ধানে তৎপর। কবিরাণী তাঁর প্রেমের অমৃতরূপিণী মানসী। তার সংস্পর্শে কবির কাব্যের উৎস-মুখ উন্মোচিত হয়, তাঁর অসিতে বাঁশীর সুর ঝঙ্কার তোলে, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। মানসীর প্রেমদর্পণে কবি তাঁর আত্মস্বরূপের প্রতিফলন দেখতে পান।

"তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥"

'শেষ প্রার্থনা' কবিতায় মানবপ্রেমের একটি চিরন্তন আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও দুঃখ-বেদনা যেন এই জন্মেই শেষ হয়, পরবর্তী জীবনে যেন আনন্দময় প্রেমের নিত্য আবির্ভাব ঘটে—প্রেমিকার বিদায়-লগ্নে এই শেষ প্রার্থনাই কবিতাটির অন্তরে ধ্বনিত। এই পৃথিবীতে এ জীবনের খণ্ড মিলন যেন নূতন জীবনের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, এবারের ব্যর্থ আশা যেন সফল প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এবারের স্বার্থপরতাজনিত

দুঃখ যেন অশ্রুজলে মুক্তিস্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে পরবর্তী জীবনে পূর্ণ আনন্দমুখর প্রেমের স্বর্ণসিংহাসন রচনা করে।

"আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষবরষের শেষে,
এমনি কাটে আসছে-জনম তোমায় ভালবেসে।
এম্‌নি আদর, এম্‌নি হেলা,
মান অভিমান এম্‌নি খেলা
এম্‌নি ব্যথার বিদায় বেলা
এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।"

Elizabeth Barrett Browning-এরও প্রার্থনা ছিল—

"—I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life !—and, if God choose,
I shall but love thee better after death."[১]

মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরেই পূর্ণ জীবন লাভ হয়, এই ধারণা পৃথিবীর অনেক আস্তিক্যবাদী কবির কাব্যে প্রকাশিত। John Donne মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলেছেন,—

"Death, be not proud, though some have called thee
Mighty and dreadful, for thou art not so ;
For those whom thou think'st thou dost overthrow
Die not, poor Death ; nor yet canst thou kill me.
... ...
Why swell'st thou then ?
One short sleep past, we wake eternally,
And Death shall be no more : Death, thou shalt die."[২]

গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় চার লাইনের একটি নামহীন অপূর্বসুন্দর কবিতা আছে। প্রেমের অন্তর্গূঢ় রহস্য প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরের কাছেই একান্তভাবে জ্ঞাত। '—কোনো এক মানুষীর মনে কোনো এক মানুষের তরে যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে' (জীবনানন্দ দাশ)

১ E. B. Browning : Sonnets from the Portuguese
২ John Donne : Death, Be Not Proud

তা বিশ্বজগতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলে কবি অনুভব করেন। শেলী তাঁর 'Love's Philosophy'তে উপলব্ধি করেছিলেন,—

"See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another;
No Sister-flower would be forgiven
If it disdain'd its brother:
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea—
What are all these kissings worth,
It thou kiss not me ?"[১]

নজরুলের কবি-মানসে সেই একই দর্শনের ছায়াপাত ঘটে—

"সে যে   চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে   ঘন ঘন বরিষন কেন কেতকী,
চাঁদে   চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে   প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম্ চুম্ দি'।"

নজরুলের 'বিষের বাঁশী' (প্রথম প্রকাশ—১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১। দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫২) সুর ও স্বরে 'অগ্নি বীণা'রই সমগোত্রীয়। 'বিষের বাঁশী'র প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রন্থের কৈফিয়তে নজরুল লিখেছেন,—

""অগ্নি-বীণা" দ্বিতীয় খণ্ড নাম দিয়ে তাতে যে সব কবিতা ও গান দেবো ব'লে এতকাল ধ'রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই "বিষের বাঁশী" প্রকাশ করলাম। নানা কারণে "অগ্নি-বীণা" দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদ্‌লে "বিষের বাঁশী" নাম-করণ কর্‌লাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইন-রূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত "বিদ্রোহ"-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি লাগ্‌লে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ অসুরের।

[১] Percy Bysshe Shelley : Love's Philosophy

এ "বিষের বাঁশী'র বিষ যুগিয়েছেন, আমার নিপীড়িতা দেশ-মাতা আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।"

যদিও নজরুল কৈফিয়তে বলেছেন যে, 'বিদ্রোহ'-রাধাকে তিনি বিষের বাঁশীর সুরে ডাকবেন না, তবুও এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ও গান বিদ্রোহের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির।

এই প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, নজরুলের বিদ্রোহ কোন বিশেষ মতবাদের খাদে প্রবাহিত নয়। তাঁর বিদ্রোহের মূলে স্বভাবগত অকৃত্রিম মানব-প্রেম এবং সে প্রেমের প্রকাশ তাঁর অন্তরের নির্দেশানুসারে। শুধু স্বদেশেরই নয়, বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন বলেই তাঁর রোমান্টিক কবি-চিত্ত মানুষের নির্যাতন, লাঞ্ছনা, শোষণ প্রভৃতি উচ্ছেদ করতে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কোন পরম আস্তিক্যবোধে তিনি মানুষের অত্যাচার, অবিচার ও নিপীড়নের জন্যে বিধাতার শক্তির কাছে আবেদন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি, তাঁর কবি-সত্তা নিজেই তরবারি হাতে অসংগতি বৈষম্য প্রভৃতির অবসান ঘটাবার জন্যে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে ডাক দিয়েছে। তিনি আস্তিক্যবাদী হলেও তাঁর আস্তিক্যবাদ অক্ষত নয়। মুক্তিসংগ্রামে পুরুষকারের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার কাছেও তিনি শক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। এই দিক থেকে দেখলে নজরুলের বিদ্রোহ একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোকিত, একটি বিশেষ মূল্যে গৌরবান্বিত। এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নজরুলের মত কোন কবির কাব্য মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে নি।

সমস্ত মহৎ কবির মধ্যেই তো বিদ্রোহ আছে। পুরাতন ধ্যানধারণার উচ্ছেদ বা পূর্বতন ঐতিহ্যের নূতন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকল শ্রেষ্ঠ কবিরই বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। বাংলা কবিতায় প্রথম পর্যায়ে অতীন্দ্রিয় ধ্যাননিমগ্ন আস্তিক্যনির্ভর রবীন্দ্র-দার্শনিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন দেহাত্মবাদী মোহিতলাল ও দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ। তারপর এলেন বিদ্রোহীর ধ্বজা উড়িয়ে নজরুল। মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহ যেখানে ভাবের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিল, নজরুল তাকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের বৈষম্যকণ্টকিত বাস্তবক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্যে 'বিদ্রোহী' বিশেষণটি তাঁর নামের সঙ্গে

বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে গেল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যের উদ্দাম ভাবাবেগ, কোন বন্ধন-না-মানার প্রবণতা প্রভৃতি তাঁর 'বিদ্রোহী' বিশেষণটির সঙ্গে জড়িত। এদিক থেকে বায়রণের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষিতব্য।

পূর্বেই বলেছি যে, নজরুলের বিদ্রোহের উৎস তাঁর সুগভীর ও প্রত্যয়োজ্জ্বল মানব-প্রেম। তাই মানুষের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেরই বৈষম্য ও অসংগতি তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি এইসব বৈষম্য ও অসংগতির স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর বিদ্রোহ কখনো স্বদেশের অধীনতার বিরুদ্ধে, আবার কখনো তা বিস্তৃত আকারে সমগ্র মানবজাতির নির্যাতন ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'বিষের বাঁশী'তে এই বিদ্রোহের প্রকাশ প্রধানত স্বদেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রেমের মূর্তিতে। 'বিষের বাঁশী'র 'বিদ্রোহীর বাণী' শীর্ষক কবিতায় নজরুলের কবি-কণ্ঠে শুনি—

"যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মরব শেষ।
নরম গরম প'চে গেছে আমরা নবীন চরম দল।
ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিম্বা পাতাল-তল!"

নজরুলের দেশপ্রেম সম্পর্কে ১৯২৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখের 'ধূমকেতু' লিখেছিল,

"নজরুলের দেশপ্রেম তার নিজেরই মত দুর্দম; তার কোনো দলের জ্ঞান নেই, প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা নেই; সকলকে সমান অধিকারে সে স্বাধীন দেখতে চায় এবং তাদের সঙ্গে গলাগলি হয়েই সেই স্বাধীনতা পেতে চায়।"

ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ মনীষীদের রচনায় দেশপ্রেমের যে রূপ ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে নজরুলের স্বদেশপ্রেমমূর্তির স্বাতন্ত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এই সাহিত্যরথীগণের অধিকাংশই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন মধ্যবিত্ত বা জমিদার পরিবার থেকে। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগ ছিল না। তাই তাঁদের রচনায় জনসাধারণের মর্মজ্বালা ও আশাআকাঙ্ক্ষা তেমন তীব্রতা নিয়ে ব্যক্ত হয় নি।

এঁদের মধ্যে প্রবল ও আন্তরিক সহানুভূতির সাহায্যে দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে নীল-চাষীদের অন্তর্বেদনাকে ভাষা দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকে খাঁটি স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের স্বরূপউদ্ঘাটনে ও দেশের অর্থনৈতিক শোষণের বাস্তব আলেখ্যচিত্রণে। অসহায় ভূমিহীন অত্যাচারিত কৃষকের হাহাকার বেজেছে তাঁর লেখায়। অন্যান্য ধুরন্ধরেরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের সুব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সম্ভবমত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধা ভোগ করতে। ইংরেজ-শাসনের পূর্ণ অবসান তো তাঁরা চানই নি, বরং তাঁদের কেউ কেউ ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্ষায় ও তার জয়কীর্তনে তৎপর ছিলেন। কোনও সংঘবদ্ধ জনআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ণোচ্ছেদের স্বপ্ন তাঁরা দেখেন নি। যেটুকু স্বদেশপ্রেমের স্ফুরণ তাঁদের রচনায় দেখা গেছে, তাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল ভাবলোকেই সীমাবদ্ধ। এর একটি বিশেষ কারণ—ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শেই স্বদেশপ্রেমের সত্যকার স্বরূপ অনেকের মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই সহসা ইংরেজের প্রতি তাঁদের দুর্বলতা ও মমত্ব তাঁরা জয় করতে পারেন নি।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনার কোন কোন জায়গায় স্বদেশপ্রেমের আভাস পাওয়া গেলেও সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি বলেছেন, "শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম, শিবধাম স্বদেশ তোমার॥" তবুও তার পাশেই যখন পড়ি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে তাঁর আবেদন এবং তারপরে রাজভক্ত প্রজার উক্তি—

"রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা॥"[১]

তখন বুঝতে বাকী থাকে না যে, তাঁর স্বদেশপ্রেম নেহাতই রোমান্টিক ভাবুকতা। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।' ইত্যাদি রচনার মূলেও সেই রোমান্টিক স্বদেশপ্রেম। মধুসূদন যখন যুগপ্রতিনিধিস্বরূপ রাবণের কণ্ঠে শৃঙ্খলিত স্বদেশের প্রতীক মহাসিন্ধুকে সম্বোধন করে বলেন,

---

১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১ম ২য় খণ্ড একত্রে, বসুমতী সং : পৃ ১৩৫

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ?......"[১]

তখনও স্বদেশের প্রতি নিবিড় একাত্মতাজনিত কোন অন্তর্জ্বালা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে না।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমও মনের সাময়িক উত্তেজনা। স্বদেশপ্রেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্য 'আনন্দমঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র তো খোলাখুলিই বলেছেন,

"সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"[২]

গ্রন্থশেষে মহাপুরুষের উক্তিতে সন্তানবিদ্রোহের অন্যতম অগ্রগণ্য নায়ক সত্যানন্দকে যা বলা হয়েছে, ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মোটামুটি মনোভাব তাই।

"মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।"[৩]

বাঙালী জাতির মধ্যে সত্যিকার স্বদেশচেতনা জাগল বঙ্গভঙ্গ-নিবারণ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ইংরেজ-শাসনের রূঢ় নির্মম স্বরূপ জাতির সামনে উদ্ঘাটিত হতে লাগল। স্বদেশী শিল্পসংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ তীব্র হয়ে উঠল। আরম্ভ হল স্বদেশী যুগ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক কবিতা সংগীত ও প্রবন্ধে দেশের মুক্তিআকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে দেশীয় চেতনার আলোকপাত হল। তারপর এল সর্বনাশী প্রথম মহাযুদ্ধ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল জাতির স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে। মধ্যবিত্ত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করলে। বিশ্বব্যাপী আর্থিকমন্দা ও নৈরাশ্যে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ল। সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। এই সময় জাতির স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কোন

---

১ মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদ বধ প্রথম সর্গ
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ
৩ ঐ

সাহিত্যনায়কের মধ্যেই ভাষা পেল না। তখন 'অগ্নি-বীণা' হাতে জাতায় চারণকবির মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন নজরুল। তাঁর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন, তাঁর সৈনিকজীবনের মোহভঙ্গজনিত অভিজ্ঞতা ও কয়েকজন জননায়কের সঙ্গে সৌহার্দ্য তাঁকে জনজীবনের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করলে। ইংরেজ শাসনের প্রতি কোন মোহ থাকা কোন ক্রমেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করলেন তিনি। জনসাধারণের সংঘবদ্ধ শক্তির তীব্রতাকে তিনি অনুভব করলেন বলেই ব্রিটিশ শাসনের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠল। তিনি কম্বুকণ্ঠে প্রচার করলেন,

"জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জনসঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ এখনও কি আর ও-রকম ছেলে-মানুষী চলিবে মনে কর?"[১]

এই ঘোষণাই তখন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ জাতির আত্মোপলব্ধি।

'ধূমকেতু'র সম্পাদক হিসেবে নজরুল তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেছিলেন নির্ভীকভাবে,

"..."ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।...

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হ'লে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর এই বিদ্রোহ করতে হ'লে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ" বলতে হবে, "যে যায় যাক সে আমার হয় নি লয়।" "

নজরুলের বিদ্রোহ তথা স্বদেশপ্রেমের এই ঐতিহাসিক স্বরূপ মনে রাখলে তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির আস্বাদন করা সহজ হবে।

'আনন্দমঠ' নজরুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 'সেবক' কবিতায় 'আনন্দমঠে'র সন্তানধর্মের ইঙ্গিত ও প্রেরণা বর্তমান।

> "হঠাৎ দেখি আসছে বিশাল মশাল হাতে ও কে?
> "জয় সত্যম" মন্ত্র-শিখা জ্বলছে উজল চোখে।
> রাত্রি-শেষে এমন বেশে কে তুমি ভাই এলে?—

মুখবন্ধ : ১

"সেবক তোদের, ভাইরা আমার! —জয় হোক মা'র!"
হাঁকলো তরুণ কারার দুয়ার ঠেলে।"

তোটক ছন্দে লেখা 'জাগৃহি' কবিতায় নজরুল যে মায়ের আগমনী রচনা করেছেন তাঁর রূপ—কালী ও দুর্গা উভয়েই 'আনন্দমঠে'র মধ্যে প্রাপ্তব্য।

প্রথমে মায়ের সর্বনাশী চণ্ডীমূর্তি চিত্রিত।

"মৃত মৃত্যু-কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।...
উর- হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা।
নিয়া রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা
নাচে ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইক দিশা!"

কবি মাকে রক্তোন্মত্তা ভীমামূর্তি সংবরণ করে কল্যাণীমূর্তিতে আবির্ভূতা হতে মিনতি করেছেন।

"এসো শুদ্ধ মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে!
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী!
আনো হৈম ঝারি, আনো শান্তি-বারি!...
ওঠে কণ্ঠ ছাপি, বাণী সত্য পরম—
বন্- দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!"

হাফিজের "যুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ্ আয়েদ্ ব-কিন্‌আন্ গম্ মখোর্" শীর্ষক গজলের ভাব-ছায়াবলম্বনে রচিত 'বোধন' গানটি অনবদ্য। আশাবাদী কবির উজ্জ্বল প্রত্যয় ছত্রে ছত্রে উচ্চারিত।

"হ'য়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু,—বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ-শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভু পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।"

'অভয়-মন্ত্র' গানটি দীপক-রাগে উদ্দীপ্ত। সত্যের কখনো ক্ষয় বা মৃত্যু হতে পারে না। ইতিহাসের ধারায় ব্যক্তির মৃত্যু হলেও সমষ্টির নাশ নেই।

"ঐ নির্যাতকের বন্দী কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায় ?
ক্ষীণ দুর্বল বলে' খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয় !"

শেলীর কণ্ঠেও শুনি, "Truth be veiled, but still it burneth,"[১]

কবি 'আত্ম-শক্তি'তে উদ্বুদ্ধ বীরের অভ্যর্থনা করেছেন। তাঁর এই অভ্যর্থনার ভিতরে বিবেকানন্দের অমৃতকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

'মরণ-বরণ' গানে কবি মরণকে শিবরূপে আহ্বান করেছেন। মরণই দেশের পরাধীনতার পাপচিহ্ন ধ্বংস ক'রে নবীন সৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। তাঁর কাছে ঐহিক জীবনই সত্য। শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে তিনি বলেছেন ভীরুর দর্শন। শেক্সপীয়ার বলেছেন যে কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগে বহুবার মরে। কিন্তু সত্যিকার সাহসী পুরুষের একবারই মৃত্যু হয়। দেশের জন্যে শহীদের মৃত্যু মুক্তির বেদী রচনা করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই মৃত্যুভয় বিজিত হয়।

"জ্ঞান-বুড়ো ঐ বল্ছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তি দাতা মরণ ! এসো কাল-বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মর্লো যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মারার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্ছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ ॥"

'বন্দী-বন্দনা' গানে কবি মুক্তির প্রদীপ্ত মহালগ্নে বীরের বন্দনা করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি শুধু নজরুল-কাব্যে কেন, বাংলা কাব্য-জগতেও দুর্লভ। এমন আবেগগাঢ় রসঘন নিটোলউজ্জ্বল পংক্তি নজরুল নিজেই জীবনে খুব কমই লিখতে সমর্থ হয়েছেন। প্রলম্বিত ছন্দে বীরের অব্যাহত গতিপথটি অসামান্য আন্তরিকতার জ্যোতিতে ভাস্বর।

"ললাটে জয়টিকা, প্রসূন-হার-গলে
চলে রে বীর চলে ;
সে নহে নহে কারা, যেথানে ভৈরব
রুদ্র-শিখা জ্বলে ॥"

'বন্দী-বন্দনা' গানটি রচনার একটি ইতিহাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

---

১ Shelley : Hellas

হুগলী জেলে থাকাকালীন নজরুল ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের ‘ফাইলে’ রোজ ভোরে দাঁড়াতে হত। হেড্ জমাদার বন্দীদের গোনা শেষ করলে জেলার আবির্ভূত হত তার বিরাট ভুঁড়ি দুলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার চীৎকার করে উঠত ‘সরকার সেলাম।’ কবি ও অন্যান্য বন্দীরা এই সরকার সেলাম ব্যাপারটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ‘সরকার সেলাম’ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটি ক’রে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। এই অবাধ্যতার জন্যে তাঁরা কম লাঞ্ছনা ভোগ করতেন না। ‘বন্দী-বন্দনা’ রচনার সঙ্গে এই ব্যাপারটি জড়িত। কবিতাটি আর একটি কারণে উল্লেখনীয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বন্দীর বন্দনা’র (১৯৩০) নামকরণ হয় সম্ভবত এই কবিতাটি থেকেই।

পূর্বালোচিত ‘সেবক’ ও ‘বন্দী-বন্দনা’ গান দুটি হুগলী জেলে বন্দী থাকাকালীন নজরুল রচনা করেছিলেন। সেই সময় ‘ভাঙার গান’ ও শিকল-পরার গান’ও রচিত হয়। এইসব গানে তাঁর জেলজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্বালা ও মর্মবেদনা অনুভব করা যায়। এই গানগুলি গেয়ে কবি অন্যান্য বন্দীদের মনে উৎসাহ, সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেন। ‘শিকল-পরার গান’ আবেগ ও উত্তেজনায় তরঙ্গ-মুখর। বন্দীজীবনের নির্যাতন ও লাঞ্ছনায় বন্দীত্বের জড়িমা কেটে যায়, বন্ধনের ভয় দূর হয়, বন্ধন-মুক্তির অদম্য উত্তেজনা আসে। দধীচির মত আত্মত্যাগে দেশে যে বিপ্লবাগ্নি জ্বলে ওঠে, তাতেই আসন্ন হয় স্বাধীনতার বহুআকাঙ্ক্ষিত লগ্ন।

"এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প’রেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥…
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা
এ যে মুক্তি-পথের অগ্র-দূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥"[১]

নজরুল বিদ্রোহী বাউল চারণকবি।

"মোরা ভাই বাউল চারণ
মানি না শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।

---

১ শিকল পরার গান : বিষের বাঁশী

দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক মোদের ভয় রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উট্‌কে দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে॥"

এই সূত্রে Richard Lovelace-এর সুখ্যাত 'To Althea from Prison' কাবতাটি মনে পড়ে। Arthur Hugh Clough-এর কবিকণ্ঠে উৎসারিত হয়,

"Say not the struggle naught availeth,
The labour and the wounds are vain,
The enemy faints not, nor faileth,
And as things have been they remain.
... ...
For while the tired waves, vainly breaking,
Seem here no painful inch to gain,
Far back, through creeks and inlets making,
Comes silent, flooding in, the main."[১]

চার্টিস্ট আন্দোলনের অন্যতম কবি Charles Cole-এর 'The Strength of Tyranny' কবিতাটিও তাই এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

"The tyrants chains are only strong
While slaves submit to wear them;
And, who could bind them on the throng
Determin'd not to bear them?"[২]

গান্ধীজী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল চরকায় সুতো কাটা। সে সময় প্রচুর বস্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী করে দেশের চাহিদা মেটানো হত এবং এইভাবে দেশের বহু অর্থ বিদেশে চলে যেত। দেশের অর্থ দেশে রেখে জাতির আর্থিক বনিয়াদকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে গান্ধীজী চরকায় সুতো কেটে বস্ত্রের দিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার

১ Clough : Say Not the Struggle Naught Availeth
২ An Anthology of Chartist Literature : p. 120

জন্যে জাতিকে ডাক দিলেন। তিনি প্রচার করলেন যে, চরকার দৌলতে লভ্য অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ সুগম করে দেবে। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'চরকার গান' ও 'চরকার আরতি' শীর্ষক কবিতা দুটিতে সত্যেন্দ্রনাথ চরকার মাহাত্ম্যকীর্তন করলেন। তিনি জাতিকে ডাক দিলেন চরকাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্যতম অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে।

"চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর।
ঘর-ঘর সম্পদ—আপনায় নির্ভর!
স্বপ্নের রাজ্যে দৈবের সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!
ঘর-ঘর সম্ভ্রম—আপনায় নির্ভর।
প্রত্যাশা ছাড়্‌বার জাগল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া!"[১]

সত্যেন্দ্রনাথের গানে আন্তরিকতার চাইতে ভঙ্গিই বেশী। নজরুল যে 'চরকার গান' রচনা করেন, তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও তাতে স্বদেশী আন্দোলনের স্বরূপ-বিষয়ে তাঁর প্রখরতর কবিদৃষ্টির উপস্থিতি অনুভব-গম্য। নজরুল চরকা-ঘোরার শব্দে স্বরাজ-সিংহদ্বার-খোলার শব্দ শুনতে পান। চরকাকে উপলক্ষ্য ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাত্র-চেতনাকে উপলব্ধি করেন। চরকাকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন,

"তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুন্‌তে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর॥
... ...
হিন্দু-মুস্‌লিম দুই সোদর
তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর,
তুই ঘোর্‌ ঘোর্‌ ঘোর্‌।
আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দুভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়।"[২]

১ চরকার গান : দ্বিতীয় আরতি
২ চরকার গান : বিষের বাঁশী

গান্ধীজী কবির কণ্ঠে এই গানটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

নজরুলের 'জাতের বজ্জাতি'র একটি ইতিহাস আছে। নলিনাক্ষ সান্যালের বিয়েতে নজরুলকে আমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কয়েকজন বন্ধু তাঁকে নিয়ে গিয়ে বিয়েবাড়িতে হাজির করেন। বিয়েবাড়ির অত্যন্ত হিন্দুগোঁড়ামির আবহাওয়ায় নজরুল অপমানিত বোধ করতে পারেন, এই ভয়ে নলিনাক্ষবাবু খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত নলিনাক্ষবাবু সবদিক রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুগোঁড়ামির আবহাওয়ায় বিক্ষুব্ধ নজরুল বিয়েবাড়িতে বসেই এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি নজরুলের জেলে থাকাকালে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় (শ্রাবণ, ১৩৩০) প্রকাশিত হয়েছিল।

'জাতের বজ্জাতি' গানে কবি জাতিভেদের অন্তঃসারশূন্যতা ও অভিশাপের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই জাতিভেদ ভারতের পরাধীনতার জন্যে দায়ী।

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় ত মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, কর্‌লি তোরা এক জাতিকে একশ' খান !
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
প'চে আছিস্ বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥"

'সত্য-মন্ত্র' গানে নজরুল খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মোহম্মদ ও রামের মত গান্ধীজীকেও অবহেলিত মানবিকতার মুক্তিসাধক বলে বন্দনা করছেন। গান্ধীজী তাঁর পূর্বসূরী মহাপুরুষদের মত বঞ্চিত ও উপেক্ষিত জনসমাজকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু হায়! এখনো অনেক মানুষ অজ্ঞানতা-বশত মানবিকতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

"চিনেছিলেন খ্রীষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম—
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই) মানুষ যাদের কর্‌ত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন্ স্থান,
গান্ধী আবার গান সে গান।"

নজরুল দৌলতপুরগ্রামে আলী আকবরের কাছে প্রতারিত ও অপমানিত

হয়ে কুমিল্লায় আসেন। তখন কুমিল্লায় অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজিত ছিল। কবি 'পাগল পথিক' গানটি এই সময়ে রচনা করেন। গানটিতে গান্ধীজী এবং তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে।

"এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ-গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়॥"

নজরুলের মতে গান্ধীজী ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছেন,

'প্রলয়-রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।'

সত্যেন্দ্রনাথও গান্ধীজীকে 'জাতীয়তার নান্দী'-পাঠক হিসেবে বন্দনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরমপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করলেও অহিংস পথের পথিক গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও অহিংস মতের উপর গভীরভাবে আস্থাবান। আফ্রিকায় গান্ধীজীর বর্ণ-বিরোধী আন্দোলন তাঁর সমর্থনলাভ করে। আমার মনে হয়,—সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত ছিল না। সাধারণভাবে তিনি মানবতার সকলপ্রকার স্বাধীনতাসংগ্রামেরই সমর্থক ছিলেন। তাই মানবতার স্বাধীনতাকামী সকল পুরুষই—তা যে কোন দলেরই হোক, তাঁর কাছে শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছেন। তিলকের স্বরাজস্বপ্ন এবং গান্ধীজীর অহিংসনীতির প্রতি তিনি প্রায় সমান শ্রদ্ধালু ও বিশ্বাসসম্পন্ন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুলের রাজনৈতিক দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ। তাই নজরুল প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমর্থক হলেও পরে যখন আন্দোলনের ব্যর্থতা বুঝতে পারলেন, তখন সন্ত্রাস-বাদীদের পক্ষ অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করে অহিংসানীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না। অবশ্য এর প্রধান কারণ এই যে, সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরতর ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'সত্য-মন্ত্র' গানটির সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'গান্ধীজী' কবিতাটির আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথও জন-সেবক গান্ধীজীকে বুদ্ধ খ্রীষ্ট কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের সমগোত্রীয় বলে বন্দনা করেছেন। গান্ধীজীর পরিচয়ে তাঁর বক্তব্য—

"অহিংসা যার পরম সাধনা হিংসা-সেবিত বাসে,
আসন যাহার বুদ্ধের কোলে, টলষ্টয়ের পাশে—"[১]

---

[১] গান্ধীজী : বেলাশেষের গান

'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থ সুর ও স্বরের দিক থেকে 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র সমগোত্রীয়। বইটি স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা মেদিনীপুর-বাসীদের উদ্দেশে নিবেদিত। 'ভাঙার গানে'র প্রথম সংস্করণ [শ্রাবণ ১৩৩১ সাল (১৯২৪)] সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণকাল ১৯৪৯ সাল।

'ভাঙার গানে'র মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহী রূপই অধিকতর পরিস্ফুট। এই গ্রন্থের প্রথম গান 'ভাঙার গানে'র মধ্যেই কাব্যগ্রন্থের মুল সুর ধ্বনিত। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে 'ভাঙার গান' রচিত হয়। সেই সময় নজরুল মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে ৩৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে থাকতেন। সুকুমাররঞ্জন দাশ দেশবন্ধুর কাগজ 'বাংলার কথা'র জন্যে নজরুলের কাছে কবিতা চাইলে তিনি তাঁকে 'ভাঙার গান'টি লিখে দেন। গানটিতে যে উদাত্ত ও স্পর্ধিত কবিকণ্ঠের আহ্বান শোনা যায় তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। একটি বিষয় লক্ষিতব্য যে, গানটি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আবহাওয়ায় অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতার কাগজের জন্যে লিখিত হলেও সক্রিয় বিপ্লবের পথে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা গানটির ছত্রে ছত্রে জ্বলে উঠেছে। বস্তুত নিরুপদ্রব আন্দোলনের চাইতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথকেই নজরুল সমর্থন করতেন বেশী।

"কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'!"

নজরুলকে বলা যায় 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। ইংরেজীতে এই ধরনের কবিকে topical poet বলে অভিহিত করা হয়। সমসাময়িক বস্তু বা ঘটনাকে নিয়ে কাব্যসৃষ্টির আনন্দে তাঁর লেখনী স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এদিক থেকে ঈশ্বর গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সাযুজ্য লক্ষণীয়। সাময়িক ঘটনাকে নিয়ে লেখা কবিতা বা সংগীতের একটা সাময়িক মূল্য বা প্রয়োজন আছে, একথা কেউ-ই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু সাময়িকতাকে

অতিউগ্রমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়ার ফলে কালোত্তীর্ণ সুরের সংযোগ এসব কবিতা বা গানে প্রায়ই হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলির অপমৃত্যু অনিবার্য। মহৎ কবিতা তাকেই বলব যা যুগের চাহিদা মিটিয়েও কালোত্তীর্ণ হবার গুণে ভাগ্যবান। নজরুলের বহু কবিতা ও গান ধূমকেতুর মত সাময়িক উত্তেজনা ঘটিয়ে আজ নিঃশেষপ্রায় তবুও বাংলার জনজাগরণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভাবে নজরুলের চারণকবির ভূমিকাটি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

পূর্বেই বলেছি ১৯২১ সালের প্রথমে দৌলতপুর গ্রামে আলী আকবর খানের কাছে প্রতারিত হয়ে নজরুল কিছুকাল কুমিল্লা শহরে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে ছিলেন। এর পরে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি নবেম্বরমাসে আর একবার কুমিল্লায় যান। এই সময় ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভারতে এসেছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। কুমিল্লাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। নজরুল এই প্রতিবাদ মিছিলের জন্যে 'জাগরণী' শীর্ষক একটি কোরাস রচনা করে নিজেই মিছিলে গেয়েছিলেন। গানটির মধ্যে জাতীয় চারণকবির কণ্ঠে বৈতালিক সুর ঝঙ্কৃত।

"জননী আমার ফিরিয়া চাও!
ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!
চাই মানবতা, তাই দ্বারে
কর হানি মাগো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে!
সত্যমানব জাগো রে!
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও
সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও।"

নজরুল এখানে মানবতাকে ভিক্ষা চেয়েছেন। 'বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা সত্য-মানবে'র জাগরণের জন্য তিনি ব্যাকুল। বাংলাদেশে এই মানবতার ধারণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যে প্রভাব আছে একথা অবশ্যস্বীকার্য।

'মিলন গানে'র মধ্যে হিন্দুমুসলমান মৈত্রীর কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। হিন্দুর ও মুসলমানের বিরোধের জন্যেই দেশের এই দুরবস্থা। সে আজ

বিদেশী শত্রুর পদদলিত। উভয় জাতির মধ্যে মিলন হলে যে অসাধ্য সাধন হতে পারে এ কথা কবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। গানটি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফৎ আন্দোলনের প্রেরণায় লেখা বলে মনে হয়।

"(তোরা) করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
(আজো) বুঝলি না হায় নাড়ী-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান।
(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি, পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ॥
(তোরা) মেঘ বাদলের বজ্রবিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লালনিশান॥"

এখানে 'লালনিশান' কথাটির মধ্যে রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা লালনিশানের কোন প্রেরণাময় সজ্ঞান ব্যঞ্জনা আছে বলে মনে হয় না। কবি 'লাল'কে সাধারণভাবে বিপ্লবের রক্তবর্ণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর তারকেশ্বরের দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মোহান্তকে তাড়াবার নিমিত্ত একটি আন্দোলন উপস্থিত হয়। নজরুল এই সময় 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান' লিখে এই আন্দোলনকে সমর্থন ও শক্তিশালী করেন।

শেলীর কবিতাতেও অত্যাচারী পুরোহিতশ্রেণীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশিত হয়েছে।

"Rather say the Pope :
London will be soon his Rome : he walks
As if he trod upon the heads of men :
He looks elate, drunken with blood and gold ;—"[১]

এই প্রসঙ্গে ধর্মের নামে অনাচার ও দুর্নীতির বিষয়ে বায়রণের সেই অমর উক্তি মনে পড়ে,

"A thousand cups of gold,
In Judah deemed divine—
Jehovah's vessels hold
The godless Heathen's wine."[২]

'দুঃশাসনের রক্তপান' কবিতায় নজরুল দেশের মুক্তির জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাই বলেছেন। সন্ত্রাসবাদকে এখানে গভীর আবেগের সঙ্গে সমর্থন করা

[১] Shelley : Charles the First Scene I
[২] Byron : The Vision of Belshazzar

হয়েছে। কবি বন্য ও হিংস্রভাবাপন্ন বীর সৈনিকদের আহ্বান করেছেন দেশের দুশমন সাম্রাজ্যবাদী স্বাধীনতাহরণকারী দুঃশাসনের রক্তপান করার জন্যে।

"বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই।
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!"

নজরুলের প্রচণ্ড অবাধ্য আবেগ মাঝে মাঝে কবিত্বের শালীন সীমা অতিক্রম করে নেহাতই প্রচারমূলক বক্তৃতা হয়ে উঠেছে।

"হিংসাশী মোরা মাংসাশী,
ভণ্ডামী ভালবাসাবাসি।
শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই।
মারি লাথি তার মড়া মুখে
তাতা-থৈ নাচি ভীম সুখে।"

এই তীব্র বাস্তববোধদীপ্ত বিদ্রোহের মধ্যেও নজরুল রোমান্টিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বস্তুত পারেন নি বলেই তিনি সত্যকার কাব্যসৃষ্টিতে সমর্থ। স্বাধীনতালাভের জন্যে যে সব বিদ্রোহী ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ইত্যাদি সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, তারা মৃত্যুর পরে সামান্য স্মরণ-সহানুভূতির জন্যে আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত। শুধু স্বদেশের মুক্তির নিমিত্ত তারা উদ্দীপ্ত নয়, সাধারণভাবে সমস্ত লাঞ্ছিত নিপীড়িত জনসমাজের কল্যাণের চেষ্টায় তারা ব্যাকুল ও আগ্রহান্বিত।

"শুধু মানবের শুভ লাগি
সৈনিক যত দুখভাগী।
... ...
তোমাদের তরে মুক্ত দেশ,
মোদের প্রাপ্য তোদের শ্লেষ।
জানি জানি ঐ রণাঙ্গন
হবে যবে মোর মৃৎ-কাফন

ফেলিবে কি ছোট একটি শ্বাস ?
তিক্ত হবে কি মুখের গ্রাস ?"

গ্রন্থশেষে 'শহিদী-ঈদ' কবিতাটি অপূর্ব। এই ঈদের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,

"শহীদের ঈদ এসেছে আজ
শিরোপরি খুন-লোহিত তাজ
আল্লার রাহে চাহে সে ভিখ্ :
জিয়ারার চেয়ে পিয়ারা যে
আল্লার রাহে তাহারে দে,
চাহি না ফাঁকির মণিমানিক।"

এই ঈদ মুসলমানের কাছে ইসলামের ইজ্জত বাঁচাতে প্রাণেরই কোরবানী দাবি করে। অর্থসম্পদ প্রভৃতি গতানুগতিক ঐশ্বর্যের অঞ্জলি সে চায় না। পুণ্যপিশাচ স্বার্থপর বেহেশ্‌ত্ পায় না। কামাল আতাতুর্কও বলেছেন যে, নিজেকে কোরবানী দিলেই পরাধীন ইসলাম স্বাধীনতা লাভ করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কামাল নজরুলের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। অনেক কবিতা ও প্রবন্ধে এর উল্লেখ লক্ষণীয়।

"খেয়ে খেয়ে গোশ্‌ত্ রুটি তো খুব
হয়েছ খোদার খাসী বেকুব,
নিজেদের দাও কোরবানী।
বেঁচে যাবে তুমি, বাঁচিবে দীন,
দাস ইসলাম হবে স্বাধীন,
গাহিছে কামাল এই গানই !"

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—নজরুল শেলীর কবিতা কিছু কিছু পড়েছিলেন। শেলীর ভাবাদর্শে তিনি কিছু পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। শেলী যেমন ইংলণ্ডের দুরবস্থা দেখে আন্তরিকভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তেমনি নজরুলও প্রথমে যুদ্ধোত্তর পরাধীন দেশের নৈরাশ্য ও বেদনাকে অনুভব করে মর্মাহত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। 'Sonnet : England in 1819' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে শেলীর গভীর দেশাত্মবোধের স্বাক্ষর বর্তমান।

"Rulers who neither see, nor feel, nor know,
But leech-like to their fainting country cling,
Till they drop, blind in blood, without a blow,—
A people starved and stabbed in the untilled field,—"[১]

এই নৈরাশ্যজনক ও ঝঞ্ঝামত্ত অবস্থার মধ্যেও শেলী বিশ্বাস করেন,

"........a glorious Phantom may
Burst, to illumine our tempestuous day."[২]

শেলীর এই আশাবাদ নিঃসন্দেহে নজরুলকে উদ্দীপ্ত ও প্রভাবিত করেছিল।

'দোলন-চাঁপা'র মধ্যে প্রেমজীবনের যে সুরের আরম্ভ 'ছায়ানটে'র মধ্যে সেই সুর অধিকতর পরিস্ফুট। কল্পনামাধুর্যে, নিসর্গসম্ভোগে ও প্রেমের অন্তরঙ্গ আস্বাদনে 'ছায়ানট' 'দোলন-চাঁপা'র চেয়ে অধিকতর পরিণতিসম্পন্ন কাব্য। 'ছায়ানটে'র প্রথম প্রকাশকাল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ব্রজবিহারী বর্মন লিখেছেন, "কবির কাছে আমি রাজনৈতিক কবিতার একখানা বই চাই প্রকাশ করার জন্য। তার বদলে তিনি আমাকে '২৫ সালে প্রকাশের জন্য 'ছায়ানট' বইখানা দেন এবং পরে রাজনৈতিক সংক্রান্ত বই দেওয়ার আশ্বাস দেন। আমিও সেই আশ্বাসে প্রেমের কবিতা সংকলিত 'ছায়ানট' প্রকাশ করি। এখানা পঞ্চাশটি গীতি-কবিতা ও গানের সমষ্টি। 'কবির বেদনা-সুন্দর প্রকাশোন্মুখ মূর্তি এর প্রতি কবিতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।' "[৩]

'ছায়ানট' উৎসৃষ্ট হয়েছে শ্রমিকনেতা মুজফ্ফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদের নামে।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বিজয়িনী'র মধ্যে নজরুলের প্রেমধারণার মুখ্য রূপ নিহিত বলেই কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শুধু 'ছায়ানটে'র মূল সুরই কবিতাটির মধ্যে ফুটে ওঠে নি, বস্তুত নজরুলের মানবিকপ্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম মৌল সুর এর মধ্যে ধ্বনিত।

১৯২২ সালের প্রথমদিকে যখন নজরুল কুমিল্লায় ছিলেন, তখন সেখান থেকে 'মোস্‌লেম ভারতে' ছাপাবার জন্য তিনি 'বিজয়িনী' কবিতাটি আফজাল্-উল হক সাহেবের কাছে পাঠান। এই সময় নজরুল কুমিল্লায়

১ Shelley : Sonnet : England in 1819
২ Ibid
৩ ব্রজবিহারী বর্মন : আমার দেখা নজরুল (ফসল শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৪ : পৃ ২৭০)

বীরেন্দ্র সেনগুপ্তের বাসায় থাকাকালে তাঁর জেঠতুতো বোন প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের প্রণয় সঞ্চার হয়। তাই 'বিজয়িনী' কবিতাতে কবির ব্যক্তিগত প্রেমজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে—এমন মনে করা অযৌক্তিক নয়।

'বিজয়িনী' কবিতাটির অন্তরে ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিতপালিত নজরুলের প্রেমসাধনার একটি বিশেষরূপ চিত্রিত। কবির বিজয়িনী রাণী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানবিক প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা ব্যতীত কিছু নয়। বিদ্রোহী কবি যুদ্ধজয়ী তরবারির ভারবহনে অসমর্থ হয়ে তাঁর প্রেমপ্রতিমার কাছে ধরা দিয়ে শান্তিলাভ করতে ইচ্ছুক। যাঁরা নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দিয়ে তাঁর সংগ্রামশীল রূপকেই তাঁর চরম বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলতে চান, তাঁদের এই 'বিজয়িনী' কবিতাটি অন্তরঙ্গভাবে পাঠ করতে অনুরোধ করি। আমার মনে হয়, নজরুলের জীবনেও যেমন, কাব্যেও তেমনি প্রেমেই মুখ্য বস্তু। এই প্রেমলাভের জন্যেই তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রোহ। আবার এই প্রেমের মধ্যে অশ্রুকোমল রূপের প্রতিই কবির আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। তাঁর প্রেমাস্পদা তাঁকে দেখে সমব্যথায় অশ্রুবিসর্জন করায় বিশ্বজয়ীর দেউল টলমল করে উঠল, বিদ্রোহী কবির রক্তরথের চূড়ায় বিজয়িনীর নীলাম্বরীর আঁচল উড়ল, কবি তাঁর তূণ নিঃশেষ করে বিজয়িনীর জয়মাল্য রচনা করলেন। প্রেমাস্পদার প্রেমে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে কবি সত্যকার বিজয়ী হলেন।

"হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥
ওগো দেবি!
আমায় দেখে কখন্ তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল!
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥"

একটি মানবিক প্রেমকে কেন্দ্র করেই মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধার কর্ম চিন্তা সংগ্রাম ইত্যাদি আবর্তিত হয়, এই অনুভব ও ধারণাটি নজরুলের মত তুরস্কের বিদ্রোহী কবি নাজিম হিকমতও তাঁর 'Letters from Prison (1942-1946)' কবিতায় অতুলনীয়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"I am among men, I love mankind
I love action
I love thought
I love my struggle
You are a human being inside my struggle my beloved
I love you."[১]

প্রেমের বেদনাময় রূপই যে মানুষকে বেশী আকৃষ্ট করে একথা পৃথিবীর বহুপ্রখ্যাত কবির রচনায় পরিস্ফুট। ইয়েটস্ তাঁর প্রেমের মধ্যে শুধু নিজেরই নয়, পৃথিবীর সমস্ত বেদনার আস্বাদন করেন।

"And then you came with those red mournful lips,
And with you came the whole of the world's tears,
And all the sorrows of her labouring ships,
And all the burden of her myriad years."[২]

'চৈতী হাওয়া' এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাসের (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ) 'কালি-কলম' পত্রিকায় নজরুলের 'সঞ্চিতা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে কবি হেমচন্দ্র বাগচী 'চৈতী হাওয়া' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এই ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

"......কবি নজরুল সত্যকারের কবি-প্রতিভার অধিকারী। কোনো কবিতাতেই তাঁর কল্পনা ক্লিষ্ট নয়।...একটা সহজ উচ্ছ্বাস ও মধুর রসোচ্ছলতা তাঁর সব কবিতাগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।......

'ছায়ানট' থেকে আরও একটি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে, সেটি নজরুলের মধুরতম কবিতা বললেই চলে। সেটি 'চৈতী-হাওয়া'। এর ছন্দের এমন একটি বিষাদ-ক্লিষ্ট সুর, এমন একটি করুণ রাগিণী এর কাব্যশরীরের প্রতি অংশে রণিত হ'য়ে উঠেছে, যে, তা অতুলনীয়।"

---

১ Nazim Hikmet : Selected Poems ; Calcutta April 1952 : p. 34
২ W. B. Yeats : The Sorrow of Love

'চৈতী-হাওয়া' কবিতাটি ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসের (১৯২৫) কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবির প্রিয়া তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে-লে তিনি ব্যথিত ও মর্মাহত। এক বসন্তে কবির সঙ্গে প্রিয়ার পরিচয় হয়েছিল, আজ আর এক বসন্ত কেঁদে চলে যায়, তবুও প্রিয়ার দেখা নেই। বিরহাকুল কবি বলে ওঠেন,

"কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত—তোমার দেখা নেই।"[১]

এই কবিতার বিষণ্ণ বিরহের সুর শেলীর একটি কবিতাকে মনে করিয়ে দেয়।

"The world is dreary,
And I am weary
Of wandering on without thee, Mary;
A joy was erewhile
In thy voice and thy smile
And 'tis gone, when I should be gone too, Mary."[২]

কবি বিশ্বাস করেন যে, এই বিরহের অন্তে প্রিয়ার সঙ্গে তাঁর চিরমিলন হবে। তাই তিনি প্রিয়াকে বলেছেন, "এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ।"

বাৎসল্যরসের কবিতা হিসেবে এই গ্রন্থের 'শায়ক-বেঁধা পাখী,' 'পলাতকা' ও 'চিরশিশু' অত্যুৎকৃষ্ট। প্রথম দুটি কবিতায় শিশুর বিয়োগজনিত ব্যথা মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। 'চিরশিশু' কবিতাতে শৈশবের ঐশ্বর্য ও রহস্যে মুগ্ধ কবি বলে উঠেছেন, "ওরে যাদু ওরে মানিক আঁধার ঘরের রতন মণি।'

'শেষের গান' কবিতাটি আন্তরিকতায় মর্মগ্রাহী। এই কবিতাটি 'শেষের ডাক' নামে সামান্য পরিবর্তিত রূপে কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া'য় স্থান পেয়েছে। এই কবিতাটিতে 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের মূলসুর ঝঙ্কৃত। তাই 'পূবের হাওয়া'র প্রসঙ্গেই কবিতাটির আলোচনা করা হবে।

'আল্‌তা-স্মৃতি' একটি মনোরম কবিতা। এটি ১৩৩০ সালের পৌষ মাসের

---

[১] চৈতী-হাওয়া : ছায়ানট
[২] Shelley : To Mary Shelley

'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার প্রারম্ভে প্রিয়তমার কাছে কবির সেই নিত্যকালের প্রশ্ন—

"ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আল্‌তা প্রথম যেদিন পরেছিলে,
সেদিন তুমি আমায় কিগো ভুলেও মনে করেছিলে—
আল্‌তা যেদিন পরেছিলে ?"

এই সংখ্যার পরিচয়লিপিতে নজরুল ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে লেখা হয়,

"কবি নজরুল ইসলাম তাঁর চিঠিপত্র, গল্প, কবিতা সব লাল কালিতে লেখেন। এবার বুকের রক্ত দিয়ে আল্‌তা-স্মৃতি লিখেছেন। যারা এমনি ধারা একজনের বুকের রক্ত দিয়ে নিজের পায়ে আল্‌তা পরে, কবি তাদের হাসতে হাসতে বল্‌ছেন, আমারই বুকের রক্ত দিয়ে তুমি যুগে যুগে আল্‌তা পর্‌ছ নারী, রক্ত নিয়ে খেলা এবার সাঙ্গ কর।"[১]

নানাছন্দে রচিত 'ঝড়' কবিতার পূর্বতরঙ্গ 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবিতাটি হুগলী থাকাকালীন কবি কর্তৃক রচিত হয়। 'ঝড়' কবিতার পশ্চিমতরঙ্গ পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী'র অন্তর্গত। 'ঝড়-পূর্ব-তরঙ্গ' ১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসের (১৯২৪) 'কল্লোলে' প্রকাশলাভ করেছিল।

'মরমী' গানটি সত্যই মর্মস্পর্শী। গানটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসের (১৯২১) 'মোস্‌লেম ভারতে'। গানটির পুনঃপ্রকাশ ঘটে ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের (১৯২৩) 'কল্লোল' পত্রিকায়। ঐ সংখ্যাতেই মোহিনী সেনগুপ্ত-কৃত গানটির সুর ও স্বরলিপি আত্মপ্রকাশ করে।

"কোন মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্‌না হানে,
জানি,—সেও জানেই জানে।"

'বিদায়-বেলায়' কবিতাটির অন্তরে একটি বিষণ্ণ করুণ সুর বেজে উঠেছে। 'দূরের বন্ধু' কবিতাটি লেখা হয় কবির দৈনিক 'নবযুগে'র কাজ ছেড়ে দিয়ে দেওঘর যাওয়ার আগে। কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে'র পৃষ্ঠায় প্রকাশ লাভ করে (কার্তিক ১৩২৭ সাল)। কবিতাটিতে একটি বেদনাহত কণ্ঠের করুণ আর্তি ও অসহায়তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। নজরুলের কণ্ঠে কবিতাটির আবৃত্তি শুনে মোহিতলাল মজুমদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

"বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে ?

---

১ কল্লোল, পৌষ ১৩৩০

আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে ॥"

'দুপুর-অভিসার' কবিতাটিতে প্রেমের চাপল্য ও অস্থিরতা সুস্পষ্টরেখায় অঙ্কিত। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে রাধার অভিসারকে নিয়ে কবিতা আছে। দুপুর-অভিসারের পরিকল্পনায় নজরুল বৈষ্ণবসাহিত্যের অভিসার-মূলক কবিতার দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তবে এখানে প্রাকৃত প্রেম মানবিক দুর্বলতায় চপল ও রসরসিকতায় চটুল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের এই আন্তরিকতা ভারতীয় ঐতিহ্যলব্ধ।

"যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁজ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ি
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই
ওলো রঙ্ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ-বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি
পিক বধূ সব টিট্‌কিরি দেয় বুলবুলি চুম্‌কুড়ি
আহা বউল-ব্যাকুল মহুল তরুর সরস ঐ শাখে ॥"

'অ-কেজোর গানে'র প্রকৃতিপ্রেমরস উপভোগ্য। কবির প্রেম প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিচিত্রভাবে। তিনি প্রকৃতির সমারোহের গভীরে তাঁর অজানিতার সন্ধানে ব্যাকুল। বিরহী মনের নিবিড় ব্যথাবেদনায় প্রকৃতির অন্তরও রঙিন।

"আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলদে আঁচল চল্‌তে জড়ায় অড়হরের ফুলে !
ঐ বাব্‌লা ফুলে নাকছাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।"

'আশা' ও 'সন্ধ্যাতারা' কবিতা দুটির মধ্যেও কবি তাঁর প্রেমকে প্রকৃতির

সঙ্গে একাত্মতার বন্ধনে বেঁধেছেন। সন্ধ্যাতারা যেন তাঁর মত বিরহ-ব্যথায় অস্থির ও করুণ।

"এই যে নিতুই আসা যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা॥"[১]

প্রকৃতির অন্তঃপুরেই কবির সঙ্গে তাঁর প্রিয়ার মিলন হবে বলে তিনি আশান্বিত।

"ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে
আ'লের পথে বিজন ঘাটে,
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধ'রবে আমার হাতটি একা॥"[২]

'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের (১৯২৫) আশ্বিন মাসে। 'পূবের হাওয়া'র অনেক কবিতা, যেমন 'মরমী', 'দুপুর-অভিসার', 'বিজয়িনী','শেষের ডাক' ('শেষের গান' নামে) প্রভৃতি 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এ ছাড়াও আরও দু'একটি কবিতার নামের পরিবর্তন করা হয়েছে 'ছায়ানট' থেকে 'পূবের হাওয়া'য় সেগুলিকে সংকলিত করার সময়।

'পূবের হাওয়া'য় 'ছায়ানটে' ঝঙ্কৃত প্রেমের করুণমধুর আন্তরিক সুরই কবির কাছে ভেসে এসেছে। 'মরমী' (সর্বপ্রথম কবিতা) দেহস্পর্শসুখকামী প্রেমের একটি বেদনা-মুগ্ধ কবিতা। প্রেম দুইটি হিয়াকে একত্র করে, উভয়ের মধ্যে আনন্দিত বেদনা ও অমৃতময় যন্ত্রণার সেতু নির্মাণ করে। মনকে বাইরে বাঁধতে গেলে ভিতরকার ক্ষত বেড়েই চলে। উভয়ের মর্মব্যথা পরস্পরের কাছেই বোধগম্য, অপরের নিকটে তা অনুভবগ্রাহ্য নয়।

"দুইটী হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজ্‌লো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে॥"

---

১ সন্ধ্যাতারা : ছায়ানট
২ আশা : ছায়ানট

প্রেমিকের প্রেম তখনই মহত্বপ্রাপ্ত হয়, যখন তার কাছে কলঙ্কিনী বিপথগামিনী প্রিয়তমাও ক্ষমা পায়।

"হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ ব'লে
চির-সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে?"[১]

'হোলি' কবিতায় প্রেমের চাপল্য ও মুখরতার মাত্রাধিক প্রকাশ পেয়েছে। শ্যাম এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, তিনি সাধারণ মানবিক প্রেমের ব্যক্তিমূর্তি। কবিতার অন্ত্যমিলগুলি লক্ষণীয়। গানটি পরিবর্তিত আকারে কবির 'সুর-সাকী' গীতিগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ওলো সই খেলবো খেলা
ফাগের ফাজিল পিচ্‌কিরীতে
আজ শ্যামে জোর করবো ঘায়েল
হোরির সুরের গিট্‌কিরিতে॥
বসন-ভূষণ ফেল্‌লো খুলে,
দে দোল দে দোল দোদুল দুলে,
কর্ লালে লাল কালার কালো
আবির হাসির টিট্‌কিরিতে॥"

'ফুল-কুঁড়ি' ও 'পুলক' কবিতাদুটি প্রকৃতিপ্রেমের কবিতা হিসেবে অনবদ্য। বুকের মধ্যে প্রেমের অরুণস্পর্শ ফুল-কুঁড়ি অনুভব করেছে ব'লে স্বাভাবিক লজ্জায় সে কুণ্ঠিত ও নিজেকে উন্মোচিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত।

"আর পারিনে সাধ্‌তে লো সই এক ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুটবে না যে ফোটাবে কে বল্‌লো সে ফুল্‌-কুঁড়িকে॥
ঘোমটা-চাপা পারুল-কলি,
বৃথাই তারে সাধ্‌লো অলি
পাশ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে' যায় হুতাশ বাতাস চলি'।"[২]

মাঠে, ঘাটে, আকাশে, বাতাসে, বনে, নদীতে প্রকৃতি-প্রিয়ার অস্তিত্বকে কবি অনুভব করেছেন ব'লে তাঁর মন অজানিত পুলকে ভ'রে উঠেছে।

"মাঠঘাট তা'র উদাস-চাওয়ায় হুতাশ কাঁদে, গগন মগন,
বেণুর বনে কাঁপছে গো তা'র দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।

১ আশা : পুবের হাওয়া
২ ফুল-কুঁড়ি : পুবের হাওয়া

তা'র বেতসলতায় লুটায় তনু
দিঘলয়ে ভুরুর ধনু,
পাকা ধানের হীরক-রেণু নীল-নলিনীর নীলিম অণু
মেখেছে মুখ বুক ভরি।"[১]

বর্ষাকালে মানুষের মনে যে প্রিয়-বিরহ জেগে ওঠে তার কথা বৈষ্ণব কবিকুল থেকে শুরু করে আধুনিক কবিবৃন্দের অনেকেই ব্যক্ত করেছেন। নজরুলও তাঁদের ব্যতিক্রম নন। বিদেশস্থ প্রিয়তমের জন্যে প্রেমিকার বিরহকে 'বরষায়' কবিতায় নজরুল সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে রবীন্দ্রপ্রভাব খুব বেশী করে অনুভব করা যায়।

"ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে
সজনী! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-জনু পাখীসম
বরিষা-জরজর॥"

বর্ষার বিরহ রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই ফুটে উঠেছে। বর্ষার মধ্যে তিনি নিখিলবিরহকে অনুভব করেছেন।

"হেরি, চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম। ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান।
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ।
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।"[২]

গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতার আগের কবিতা 'শেষের ডাকে'র মধ্যে 'পূবের হাওয়া'র মূল সুরটি ঝঙ্কৃত। বিরহবেদনা, হতাশ্বাস, দুঃখস্মৃতি, মৃত্যুশোক ইত্যাদি যে সকল অনুভূতি 'পূবের হাওয়া'র অন্তরঙ্গ উপজীব্য, তাদের সবই

১ পুলক : পূবের হাওয়া
২ মেঘদূত : মানসী

এই কবিতায় ছত্রে ছত্রে উৎসারিত। কবি মরণের আগমন অনুভব করছেন।

"মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ঐ রে আমার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই নেমেছে পারুল বনে দীঘল শ্বাসে॥
ব্যথার কুসুম গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
গোরস্থানের মাটির বাসে তাই আমার আজ প্রাণ উদাসে॥"

কবির পৃথিবী কান্নায় ভরপুর। তাঁর দুচোখ বিরহাশ্রু-প্লাবিত। তাঁর সকল দাবি-দাওয়ার অন্তিমসময় উপাস্থত। নিঃসঙ্গ জীবনে মৃত্যুর রাত্রি আবির্ভূত। কিন্তু তবুও কবি মৃত্যুর পারে জীবনের কোন এক সঙ্গীর সঙ্গলাভের আশায় উদ্দীপ্ত।

"আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সাম্‌নে শুধু নিবিড় রাতি
আমায় দূরের মানুষ ডাক দিয়েছে রাখবে কে আর বাঁধন পাশে।"

'পূবের হাওয়া'র মধ্যে নজরুলের কয়েকটি বহুপঠিত ও বিখ্যাত কবিতা থাকলেও গ্রন্থটি তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'প্রবাসীর' পুস্তক-পরিচয়ে গ্রন্থকীটের সমালোচনায় তিরস্কৃত ও নিন্দিত হয়েছিল। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সমালোচনাটি উদ্ধৃত করছি।

"বইখানির বাঁধান এবং ছাপা বেশ ভাল। কবিতাগুলি একেই অর্থহীন, তাহার উপর ছাপার ভুলে কতকগুলি একেবারে অপাঠ্য হইয়াছে। কবি নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত অনেক কবিতা অর্থহীন হইলেও ছন্দগুণে সুখপাঠ্য ছিল, আলোচ্য কবিতাপুস্তকে ছন্দকে 'কোতল' করা হইয়াছে—একে অর্থহীন তাহার উপর ছন্দহীন অর্থাৎ গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং। যেখানে কোনো অনুপ্রেরণা নাই, সেখানে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কবিতার বই ছাপানোর মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?"[১]

'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থটি (প্রকাশ কাল—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে) 'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে' উৎসর্গীকৃত। ১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় (১৯২৫) দার্জিলিঙে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধান ঘটে। দেশবন্ধুর মৃত্যুশোকে উদ্বেল হ'য়ে নজরুল এই 'চিত্তনামা' গ্রন্থে তাঁর জীবনগাথা রচনা করেন।

[১] প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩২

এই পুস্তকে 'অর্ঘ্য', 'অকালসন্ধ্যা', 'সান্ত্বনা', 'ইন্দ্রপতন' ও 'রাজ-ভিখারী' নামে পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে। মহাকবি ফারদৌসী 'শাহনামা' কাব্যগ্রন্থে যেমন বাদশাহের জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন, তেমনি 'চিত্ত-নামা' গ্রন্থে নজরুল কর্তৃক চিত্তরঞ্জনের অমর জীবনকাহিনী কাব্যে কীর্তিত হয়েছে।

'চিত্তনামা'র 'অর্ঘ্য' কবিতাটি আবেগগাঢ় আন্তরিকতায় অপূর্ব।

"হায় চির-ভোলা! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু-গরল পিয়া!
কেন এত ভালো বেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি!"

কবিতাটি ৩রা আষাঢ় তারিখে অর্থাৎ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরদিনই রচিত।

'অকাল সন্ধ্যা' গানটি ৬ই আষাঢ় আরিয়াদহে লেখা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গানটি গীত হয়।

"সবারে বিলিয়ে সুধা
সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।
তাঁহারি অস্থি চিরে
দেবতা বজ্র গ'ড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো।"

কবি চিত্তরঞ্জনকে নীলকণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আত্মত্যাগে তিনি দধীচির তুল্য।

'সান্ত্বনা' কবিতায় স্বরাজদলের নায়ক চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেও কবি মরণোত্তীর্ণ অমৃতজীবনানুভূতির গভীরে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। মৃত্যুর ভিতরেই মৃত্যুহীনতার শুভ ইঙ্গিত বর্তমান, মৃত্যুমন্থন করেই অমৃতপ্রাণের আস্বাদন করা সম্ভবপর। মৃত্যু চিত্তরঞ্জনের অমর জীবনকে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর করে তুলেছে। মহামানবের মৃত্যু মুক্তির আলোকে উজ্জ্বল, জীবনের আশ্বাসে মুখর ও সৌন্দর্যঋদ্ধিতে মহনীয়।

"না ঝর্‌লে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুক্তি ব্যর্থ হ'ত, মুক্তি-মুক্তা ফল্‌ত না।
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মানিক ঝল্‌ত না যে।
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গল্‌ত না।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জল্‌ত না।"

কবিতার শেষ স্তবকে কবির অমৃতদৃষ্টি আরও স্বচ্ছ, আরও ব্যাপক এবং তাঁর সান্ত্বনা ও আশ্বাসের সুরটি আরও দৃঢ়, আরও নির্ভীক।

"কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আস্‌ত না!
ফলবে ফসল—নইলে নিখিল-নয়ন নীরে ভাস্‌ত না।
নেইক দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাস্‌ত না।
আস্‌বে আবার—নৈলে ধরায় এমন ভালো বাস্‌ত না!"

বাংলা সাহিত্যে মহাপুরুষের স্মরণসূচক কবিতাবলীর মধ্যে 'ইন্দ্র-পতন' একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু ও মানববন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিয়োগ-ব্যথায় কবি অস্থির। এই দধীচিতুল্য নবযুগের হরিশ্চন্দ্রকে কবি নানাভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবিতার প্রথমদিকে কবি শোকে মুহ্যমান হ'য়ে মৃত্যুর অমোঘশক্তি সম্পর্কে কয়েকটি চিরন্তন প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এই নৈরাশ্যকে কবি শীঘ্রই জয় করে নিয়েছেন ও বুঝেছেন যে, মর্ত্যের প্রিয়জনকে স্বর্গেরও প্রয়োজন।

"হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটীর পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?—
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে তা,—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!"

কবিতার শেষে কবি বলেছেন যে, চিত্তরঞ্জন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শুধু

অমরতাই লাভ করলেন না, তাঁর জীবনের অঞ্জলিদানে ভারতবর্ষের পবিত্রক্ষেত্রে দনুজ-দলনীর জাগরণ আসন্ন হয়ে উঠল।

"রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি!"

কবিতার উৎকর্ষ-বিচারে 'রাজ-ভিখারী'ই এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'ইন্দ্র-পতন' কবিতাটি অতিভাবণের জন্যে স্থানে স্থানে ক্লান্তিকর একঘেয়েমির দোষে ভারাক্রান্ত। 'রাজ-ভিখারী'তে বাক্‌সংযমের সঙ্গে আবেগের আশ্চর্য রাখি-বন্ধন ঘটেছে। কবির উদ্দীপ্ত কল্পনায় চির-বৈরাগী চিত্তরঞ্জন নিখিল-বেদনাভাগী নররূপে নারায়ণ ব্যতীত অন্য কেউ নন। চিত্তরঞ্জন রাজভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে যখন ব্যর্থ হলেন, তখন তিনি দেশের কাছে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাইলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত হলেন পরম যোগী। তখন মৃত্যুই তাঁর জীবনকে গ্রাস করে নিলে। এখানে দেশ যে চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ আদর্শ-নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে নি, সেই ট্র্যাজিডির কথাই কবি আবেগসিক্ত কণ্ঠে বলেছেন।

" 'দেহি ভবতি ভিক্ষাম' বলি' দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, 'দেবে না? লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ!'—
দিল না ভিক্ষা, নিলনাকো দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!
যে-জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'!"

'সর্বহারা' [প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (১৯২৬)] নজরুলের সর্বাধিক পরিচিত কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম।

পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণের [২০ শে ফাল্গুন, ১৩৫৯ সাল (১৯৫৩)] মুখবন্ধে রবীউদ্দীন আহমদ লিখেছেন।

"...এই 'সর্বহারা'র কবিতাগুলি এমন একযুগে রচিত, যখন সারা ভারতের রাজনীতি এক নূতনরূপে আবর্তিত হইতে চলিয়াছিল। সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আপোসহীন আন্দোলন ভারতীয় গণমানসে নূতনরূপে অঙ্কুরিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া কাজী নজরুল ইসলাম তখন বাংলাসাহিত্যে নূতন চোখ-ঝলসানো দীপ্তি। যাবতীয় শোষণের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিবাদী কবিতা বাংলার যুবমানসে তখন বারুদের

কাজ করিতেছিল। তাই এই নূতন রাজনৈতিক আন্দোলন কবি-চিত্তেও নূতন পরিবর্তন আনিতে সাহায্য করিল।...

সাম্রাজ্যবাদী শোষণমুক্তির কথাই শুধু তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাই নয়, শ্রেণীহীন সর্ব-শোষণ শাসন-মুক্ত সমাজের বাস্তবছবিও তাঁহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। তাই তিনি নিজেকে সর্বহারাদের কবিরূপে পরম আগ্রহে চিত্রিত করিয়াছেন। কৃষাণ, শ্রমিক, ধীবর ইত্যাদি যাহারা আমাদের সমাজের বুনিয়াদ তাহাদের সার্বিক প্রতিষ্ঠার আয়োজনে তাঁহার কাব্য মুখরিত।

বাংলা ১৩৩৩ সালে 'সর্বহারা' প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন ইহাতে সর্বসমেত ২১টি কবিতা ছিল। নানান কারণে বর্তমান সংস্করণে পূর্বের কিছু কবিতা বর্জন করা হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে কিছু নূতন কবিতা ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৯২৫ সালে সাপ্তাহিক লাঙল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের' সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়। 'সর্বহারা'র বহু কবিতা এই লাঙলেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি ৩৭নং হ্যারিসন রোডে, লাঙলের অফিসে বসিয়াই তিনি 'সর্বহারা'র দু-একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। 'সর্বহারা'র অধিকাংশ কবিতারই রচনা কাল ১৩৩২ সাল থেকে ১৩৩৩ এর মধ্যে। বর্তমান সংস্করণে নূতন কবিতাগুলির রচনাকাল অবশ্য ভিন্ন।"

'সর্বহারা'র 'সাম্যবাদী' কবিতাসমষ্টি এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার এক বছর আগে (১৯২৫) স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বের হয়েছিল।

'সর্বহারা'র মধ্যে নজরুলের সাম্যবাদী ধারণা প্রকাশিত হওয়াতে এই গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব বর্তমান। এ কথা ঠিক যে নজরুল মার্ক্সীয় তত্ত্ব কখনও ভালভাবে পাঠ করেন নি। এবং যেহেতু মার্ক্সীয় তত্ত্ব ভালভাবে আয়ত্ত না করলে সত্যকার কমিউনিস্ট হওয়া যায় না সেই কারণে নজরুলকে কমিউনিস্ট বলা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁকে বহু দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করতে হয়। মুজফ্ফর আহ্মদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাহচর্যও তিনি লাভ করেছিলেন। তার উপর রুশবিপ্লবের সাফল্যমণ্ডিত ঘটনাবলী তাঁর কবি-মানসকে উদ্দীপিত করেছিল। তাই তাঁর পক্ষে 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ লেখা সম্ভব হয়েছিল। নজরুলের সাম্যবাদ তাঁর অন্তরেরই প্রেরণালব্ধ জিনিস ও নিজস্ব কবি-কল্পনার রঙে তা রঙিন। গভীর ও ঘনিষ্ঠ মানবতাবোধ এই সাম্য-

-বাদের ভিত্তি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। নরনারীর মধ্যে অধিকার-বৈষম্যের তিনি বিরোধী। তিনি সর্বধর্মের উপরে মানবধর্মকেই উচ্চতম স্থান দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সাম্যবাদ ঈশ্বরকে অস্বীকার করে না। এক ভগবানের অস্তিত্বসম্পর্কে দৃঢ় আস্থা নজরুলের সাম্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'সাম্য' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন,

"হেথা স্রষ্টার ভজন-আলয় এই দেহ এই মন,
হেথা মানুষের বেদনায় তাঁর দুখের সিংহাসন।
সাড়া দেন তিনি এখানে তাঁহারে যে-নামে যে-কেহ ডাকে,
যেমন ডাকিয়া সাড়া পায় শিশু যে নামে ডাকে সে মা'কে!"

নজরুলের সাম্যবাদ সর্বধর্মের মহামিলন।

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।"[১]

কবি মানবতার জয়গানে মুখর। মানুষকে ঘৃণা করা অন্যায়, কেননা মানুষের মধ্যেই ভগবান প্রকাশিত।

"বন্ধু, তোমার বুকভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।"[২]

কবি বারাঙ্গনাকে মা বলে সম্বোধন ক'রে তাকে সতীসাধ্বী নারীর সম্মান দিতে চেয়েছেন।

"কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে।"[৩]

কবি পুরুষ ও রমণীর কোন ভেদাভেদ স্বীকার করেন নি। নরনারীকে তিনি সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে অভিলাষী।

"সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।"[৪]

১ সাম্যবাদী : সর্বহারা
২ মানুষ (সাম্যবাদী) : সর্বহারা
৩ বারাঙ্গনা (সাম্যবাদী) : সর্বহারা
৪ নারী (সাম্যবাদী) : সর্বহারা

সভ্যতার অগ্রগতিতে কুলিমজুরের ঐতিহাসিক ভূমিকা কবি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি জানেন, 'এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।'

১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের (১৯২৭) 'শনিবারের চিঠি'তে সাহিত্যের আদর্শের বিষয়ে আলোচনায় মোহিতলাল নজরুলের সাম্যবাদ, বিশেষ করে বারাঙ্গনা সম্পর্কে তাঁর উক্তিকে আক্রমণ করেন। মোহিতলালের মন্তব্যের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধারযোগ্য।

"সম্প্রতি একটি কবিতায় নব-সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে একপ্রকার Nihilism বা নাস্তিক্য-নীতির উল্লাস আছে। ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠকপাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর ও কামুক; অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস, আমরা সকলে ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য-মৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা?' বিদ্রোহের চরম হইল বটে, কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কি? এই উক্তিতে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই।...

এই যে মনোভাব ইহা কেবল সমাজবিদ্রোহ নয়, ইহা মানুষের মনুষ্যত্ব-বিরোধী। ইহা সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা বলবান্ মনুষ্যহৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়, যে প্রজ্ঞার বলে পরিকল্পনার সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায় সেই প্রজ্ঞা বা শক্তি এখানে একেবারেই নাই। ইহা অলস অবশ মাংসপিণ্ডের আক্ষেপ, রিপুর তাড়না—ইহারই নাম বিদ্রোহ-ঘোষণা!"

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে মোহিতলাল নজরুলের প্রতি সুবিচার করেন নি। নজরুলের সাম্যবাদ হৃদয়লব্ধ বস্তু। প্রজ্ঞার চেয়ে আবেগের প্রাধান্য তার মধ্যে বেশি, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। অনেক জায়গায় উচ্ছ্বাসের মুখে নজরুল ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। এতৎসত্ত্বেও নজরুলের সাম্যবাদের মধ্যে যে সমাজসচেতনতা, যে সংস্কারমুক্তিপ্রবণতা, যে সাম্যপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে, তা অনন্যসাধারণ। নজরুলের সাম্যবাদে ঈশ্বরের অস্বীকৃতি নেই। নজরুলের সাম্যবাদী উক্তি তাদের সম্পর্কেই, যারা মানুষের সমাজে কৃত্রিম ভেদাভেদ

রচনা করে নিজেদের স্বার্থ-সাধনে রত। এই জগতে সকলেই অসাধুভণ্ড নয়, কেননা 'অর্ধেক এর ভগবান্, আর অর্ধেক শয়তান।' কাম, প্রলোভন ইত্যাদি মানবিকপ্রবৃত্তি তো দেহধারী মাত্রের মধ্যেই উপস্থিত, কিন্তু এদের জয় করার সাধন-স্পৃহাও সকল হৃদয়ে বর্তমান। নজরুলের সাম্যবাদে মানবিক দুর্বলতা স্বীকৃত এবং সেই সঙ্গে এই দুর্বলতাকে জয় করে নবসমাজ গঠনের ইঙ্গিতও পরিস্ফুট। 'বারাঙ্গনা' কবিতাটিকে নজরুল পতিতা নারীর মাতৃত্বকেই মা বলে সম্বোধন করেছেন। পতিতা-বৃত্তিকে তিনি সতীকর্ম বলেন নি। কামনার পথেই সন্তান আসে। পতিতার ক্ষেত্রে এই কামনা অবৈধ সন্দেহ নেই। কিন্তু পতিতার ভাল হবার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়াকে নজরুল সমর্থন করেন নি, কেননা 'পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার?' অসৎ চরিত্রের জন্যে যেমন নারী পতিতা হয়, তেমনি চারিত্রিক দোষের জন্যে নরকেও পতিত করা উচিত। নরনারীকে সমান সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই নজরুলের 'বারাঙ্গনা', 'নারী' প্রভৃতি কবিতার জন্ম।

সাম্যবাদী ধারণায় নজরুলের পূর্বসূরী সত্যেন্দ্রনাথ, যদিও সত্যেন্দ্রনাথের চাইতে নজরুলের সাম্যবাদ অধিকতর বাস্তববোধপ্রসূত, অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও জীবনঘনিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের 'হোমশিখা' কাব্যগ্রন্থের 'সাম্য-সাম' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথ মহাসাম্য ও মহামিলনের গান রচনা করেছেন।

"মানি না অন্ধবিধি ও বিধান মানি না অন্ধধারা,
মানিনা তাদের সংসারে যারা করেছে দুঃখকারা।
প্রেমের আদর জানি গো আমরা জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি যখন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি;
আমরা মানি না শিখা, ত্রিপুণ্ড্র, উপবীত, তরবারি,
জাব্দা খাতার ধারিনাক ধার, মোরা শুধু মমতারি।
মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুষ্ক নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।"

সত্যেন্দ্রনাথ দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করেন,

"মানি না গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর।"

এই কণ্ঠে সুর মিলিয়ে নজরুলকেও বলতে শোনা যায়,

"এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।"[১]

সত্যেন্দ্রনাথও মানবিক দুর্বলতাকে ক্ষমা করে মানুষকে পঙ্কমুক্ত করবার পক্ষপাতী।

"করতে হবে নূতন বোধন জাগিয়ে তারে তুলতে
মানুষ দোষে গুণেই মানুষ পারব না সে ভুলতে।"[২]

নজরুলের সাম্যবাদেও এই সুরের প্রতিধ্বনি।

'গানের দেবতা, প্রাণের দেবতা, ধ্যানের দেবতা নারী'কে সত্যেন্দ্রনাথ পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ।

"অপরাধে নারী, পুরুষেরি মত দণ্ড যদি গো পায়,
তবে পুরুষের স্বাধীনতা হতে কেন বঞ্চিবে তায়?"[৩]

নজরুলের সাম্যবাদও এইভাবে ভাবিত।

সত্যেন্দ্র-কাব্যে মজুরকৃষাণের জয়গান ও তাদের নিরলস কর্মের গরিমাও গীত হয়েছে। সভ্যতার নির্মাণে তাদের অবদান সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ সচেতন।

যতীন্দ্রনাথের মধ্যেও দুর্গত কৃষকজীবনের ব্যথা-বেদনার অশ্রুসিক্ত আলেখ্য পাওয়া যায়। হতভাগ্য ক্ষেত-মজুরদের ব্যথায় কবি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়েছেন। শ্রমজীবী চাষী-মজুরদের সত্যকার মানুষের মর্যাদা দেবার জন্যে কবি স্বার্থপর লোভী ক্ষমতামদমত্ত ধনিকশ্রেণীকে ডাক দিয়েছেন,

"ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের কর গো স্নেহ—
তারা মানুষেরই ছেলে।
... ...
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা করো না তাদের শ্রদ্ধা করো,
তারা মানুষেরই ভাই।"[৪]

১ সাম্যবাদী : সর্বহারা
২ নষ্টোদ্ধার : কুহু ও কেকা
৩ সাম্য-সাম : হোমশিখা
৪ মানুষ : মরীচিকা

এই নবমানবতাবোধ নজরুল-কাব্যে তীব্রতরভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং এর প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নজরুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অমিতবিক্রম। সত্যেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের চাইতে নজরুল অনেক বেশী সংগ্রামশীল মনোভাবাপন্ন ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবনবোধের অধিকারী।

১৯২৬ সালে যখন নজরুল সপরিবারে কৃষ্ণনগরে ছিলেন, তখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সময় নজরুল 'কাণ্ডারী হুশিয়ার!' শীর্ষক সুবিখ্যাত কোরাসটি রচনা করেন। ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের 'বঙ্গবাণী'তে কোরাসটি প্রকাশিত হলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

'কাণ্ডারী হুশিয়ারে'র কাণ্ডারী জনগণমনঅধিনায়ক। তিনিই জাতীয় জীবনতরণীকে স্বাধীনতার কূলে নিয়ে যাবেন সময়ের দুরন্ত দুর্যোগকে অতিক্রম ক'রে। এই অধিনায়কের মাতৃমুক্তিপণ সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বিরাজিত। ভ্রাতৃত্ববোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহায় তরণীর যাত্রীরা উদ্দীপ্ত। নিরাভরণ ভাষায় রচিত এই গানটিতে গভীর দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রধ্বনির মতো বেজে উঠেছে।

'ছাত্রদলের গান' ছাত্রশক্তির বন্দনা-মানসে রচিত। ছাত্রেরাই অসাধ্য সাধন করতে পারে। কবিতাটির উপর সত্যেন্দ্রনাথের 'ছেলের দল' প্রভৃতি কবিতার প্রভাব অনুভূত হয়।

নজরুল 'কৃষাণের গান'-এ বুভুক্ষু অত্যাচারিত কৃষকদের ঘুম-ভাঙার ডাক শুনিয়েছেন।

"আজ জাগ রে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।"

'শ্রমিকের গান'-এ শ্রমিক-জাগরণের আহ্বান ধ্বনিত।

"আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥"

William S. Villiers Sankey তাঁর 'To Working Men of Every Clime' কবিতায় শ্রমিকশক্তির এই যুগধর্মী জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছেন।

"Kings and nobles may conspire,
God will pour on them his ire;

Workmen shout, for ye are free,
Yours is now the victory."[১]

'ধীবরের গান'-এ ধীবরদের আত্মসচেতনার বাণী পরিস্ফুট।

"আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্ রে ও ভাই জেলে
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে!
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠ্‌ল সবাই রে
ঐ মুটে মজুর হেলে।
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে॥"

শেলীও ইংলণ্ডের কৃষাণ, তাঁতী প্রভৃতি নির্যাতিত ও প্রবঞ্চিত শ্রমজীবীদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ ক'রে তাদের নবজাগরণের মহাসংগীত গেয়েছেন। তিনি তাদের ডাক দিয়েছেন সমস্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে।

"Sow seed,—but let no tyrant reap;
Find wealth,—let no impostor heap;
Weave robes,—let not the idle wear;
Forge arms,—in your defence to bear,"[২]

'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থে [প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)] নজরুলের বিদ্রোহীরূপ এক বিশেষ মূর্তিতে প্রকটিত। এই গ্রন্থের 'প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়,' 'রক্তপতাকার গান,' 'শ্রমিকমজুর,' 'জাগরূ-তূর্য,' 'সাবধানী ঘণ্টা,' 'বাঙলায়-মহাত্মা,' 'সব্যসাচী,' 'অন্তর ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত,' 'পথের দিশা,' 'হিন্দু-মুসলিম্ যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়' কবিতার মধ্যে ছন্দ ও ভাবের হরগৌরী-মিলনে যুগান্তরের আগমনী গীত হয়েছে।

"যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়

১ An Anthology of Chartist Literature : p. 77

২ Shelley : Song to the Men of England (The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley Edited by Thomas Hutchinson : London 1935 : p. 568)

যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর্-চাকায়।”

শেলীর ভাবাবলম্বনে ‘জাগরু-তূর্য’ কবিতায় কবি শ্রমিকশক্তিকে বন্দনা করেছেন।

“ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তরঅধিকারী!
অলিখিত যত গল্পকাহিনী তোরা যে নায়ক তারি॥
... ...
নিদ্রোত্থিত কেশরীর মতো
ওঠ্ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥”

‘শ্রমিকমজুর’ কবিতাটিতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত কল্পনা-সমৃদ্ধ কবিদৃষ্টি দিয়ে নজরুল মজুরশ্রমিকের সামাজিক ভূমিকাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ধনী ও ভদ্রসমাজকে কবি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

‘‘শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অণুপরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খেতে টাকা গিলে নোট ছিঁড়ে?”

শ্রমিক-মজুরদের জাগরণ শুরু হয়েছে। তারা ধনীদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ ক’রে তাদের প্রাপ্য আদায় করে নেবে।

“মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্,
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর্!”

প্রথম দিকে কবি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী চরকায় সুতো কেটে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাতেও তাঁর আন্তরিক আস্থা ছিল। একাধিক কবিতায় গান্ধীজীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। বাংলায় গান্ধীজীর আগমনে কবি নূতন জীবন ও জাগরণের সাড়া অনুভব করেছেন ‘বাঙ্‌লায়-মহাত্মা’ শীর্ষক গানে।

কিন্তু পরে অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি অহিংস কর্মপদ্ধতির উপর বিশ্বাস হারিয়ে কবি বিপ্লববাদের দিকে অধিকতর ঝুঁকে পড়েন। তাই ফাল্গুনীকে কবি আহ্বান করেছেন জাতিকে সশস্ত্র

বিপ্লবের দীক্ষা দিতে। অহিংস আন্দোলনের শান্তিবাণীকে কবি তীব্র শ্লেষের সঙ্গে আক্রমণ করেছেন 'সব্যসাচী' কবিতায় (প্রথম প্রকাশ—লাঙল, ৮ই জানুয়ারী ১৯২৬)।

"সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুনি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!"

১৯২৬ সালে কলকাতায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হলে নজরুল 'পথের দিশা' ও 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' শীর্ষক কবিতা দু'টি রচনা ক'রে এই দাঙ্গার আত্মঘাতী রূপকে ফুটিয়ে তোলেন। এই দাঙ্গার পিছনে রাজশক্তির উসকানিও কবির চোখ এড়ায় নি। 'পথের দিশা'য় তাঁর প্রশ্ন—

"চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েসির আখ্‌ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চল্‌তে কি তুই পার্‌বি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?"

'হিন্দু-মুসলিম্ যুদ্ধ' কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার আত্মক্ষয়কারী অবস্থার মধ্যেও কবি জাগ্রত চেতনার টের পেয়েছেন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাজশক্তির প্ররোচনায় তারা পরস্পর হানাহানি করলেও উভয়ের মধ্যে সজীবতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট। উভয়ের জীবন-মন্থনে এখন হলাহল উঠলেও অমৃত ওঠার আর দেরি নেই। এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকেই জাগ্রত জনশক্তি প্রকৃত শত্রুকে চিনে নিয়ে তার ধ্বংস সাধন করতে সমর্থ হবে।

"করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয়-কেতন উড়া!
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া॥"

'সাবধানী ঘণ্টা' কবিতাটির গুরুত্ব প্রধানত ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে। ১৯২৪ সালের ৪ঠা অক্টোবরের সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে নজরুলের 'বিদ্রোহী'কে উপহাস করার উদ্দেশ্যে 'ব্যাঙ' শীর্ষক একটি ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হয়। নজরুল সেটিকে মোহিতলালের রচনা বলে মনে করে তার উত্তরস্বরূপ ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসের (১৯২৪) 'কল্লোলে' 'সর্বনাশের ঘণ্টা' ('সাবধানী ঘণ্টা'র পূর্বনাম) কবিতাটি লেখেন। মোহিতলাল তখন 'দ্রোণগুরু' কবিতা লিখে এর জবাব দেন।

এই কবিতাটিতে কাব্য সম্পর্কে নজরুলের কয়েকটি মূল্যবান মতামত ব্যক্ত হয়েছে। তবে স্থানে স্থানে অসহিষ্ণু উক্তি ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তাঁকে অকাব্যিক ভাষা প্রয়োগে প্ররোচিত করায় তিনি সর্বত্র ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। নজরুলের ধারণা—শত্রুরা মিত্রের বেশে মোহিতলালকে বিভ্রমের

পথে সর্বনাশের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে রণে মোহিতলালকে উৎসাহিত করছে। কবি জানেন—যুদ্ধে তাঁরই জয় হবে। তবুও তিনি মোহিতলালের দুরবস্থার জন্যে সহানুভূতিসম্পন্ন। মোহিতলালের ধারণা ছিল যে, বিদ্রোহ-বিপ্লবের বাণী আর্টকে ক্ষুণ্ণ করে এবং সুরের পূজারীর পক্ষে অসুরের বিদ্রোহ বড়ই অসোয়াস্তিকর। প্রেমের পূজারী মোহিতলালকে পৃথিবীর বিদ্রোহ-অসন্তোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বলে নজরুল ঘোষণা করেছেন যে, ক্ষুধাতুর মানবসমাজ শুধু প্রেমের বাঁশির সুরেই সব কিছু বিস্মৃত হতে পারে না, তাদের কাছে প্রকৃত প্রয়োজন বিদ্রোহের বাঁশের।

"ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে নেড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভাল নাহি লাগে, ভালো ছেলে হ'য়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!"[১]

'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীভুক্ত মোহিতলাল সজনীকান্তের প্ররোচনায় কবিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে তাঁর বিশ্বাস। নজরুল এখানে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আপোসহীন সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।

"আমি বলি—সখা জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীরই মত হাতছানি দিয়ে ডাকে!
যত বিদ্রূপই কর সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবে না পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত!"[২]

'সিন্ধু-হিন্দোল' [প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪ সাল (১৯২৭)] কাব্যগ্রন্থের স্থায়ীভাব প্রেম। এই গ্রন্থের 'সিন্ধু' (প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ ও তৃতীয় তরঙ্গ), 'গোপন-প্রিয়া,' 'অনামিকা,' 'দারিদ্র্য,' 'ফাল্গুনী,' 'বধূ-বরণ', 'মাধবী-প্রলাপ' প্রভৃতি কবিতাগুলি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'সিন্ধু' কবিতাগুচ্ছ ভাবসম্পদ, বর্ণনাবৈচিত্র্য ও আবেগঘনতায় নজরুল-

১ সাবধানী ঘণ্টা : ফণি-মনসা
২ ঐ

কাব্যে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। কবি সিন্ধুর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে নিজের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে চিত্রিত করেছেন। চন্দ্র-প্রিয়াহারা সিন্ধু কবির কাছে চিরবিরহ-বেদনার প্রতীক। তার মহাবিদ্রোহও এই মহাবেদনা-সঞ্জাত। বিদ্রোহী কবিও বিরহযন্ত্রণা-বিদ্ধ। তাই সিন্ধুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সেতু সহজেই নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছে। কবির সঙ্গে তাঁর প্রিয়ার মিলন হচ্ছে না। তাই কবির প্রিয়াও বিরহাকুল। কবি সিন্ধুর উদ্দেশে বলছেন,

"এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।"[১]

সিন্ধু কবির বিদ্রোহ বেদনা বিরহ সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রতীক বলে তিনি তাকে নমস্কার জানাতেও দ্বিধা করেন নি।

"হে মহান! হে চির-বিরহী;
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!"[২]

সমুদ্রের সঙ্গে মানবের আত্মীয়তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। Matthew Arnold সমুদ্রের গভীরে অনন্ত ব্যথা-বেদনার সুর শুনতে পেয়েছেন।

"Listen! you hear the grating roar
Of pebbles which the waves draw back, and fling,
At their return, up the high strand,
Begin, and cease, and then again begin,
With tremulous cadence slow, and bring
The eternal note of sadness in."[৩]

সমুদ্র বায়রণেরও একান্ত স্বজন। তিনি সমুদ্রকে বলেছেন তাকে তাঁর ভালবাসার কারণ।

সিন্ধু প্রথম তরঙ্গ : সিন্ধু-হিন্দোল
২ সিন্ধু তৃতীয় তরঙ্গ : সিন্ধু হিন্দোল
৩ Matthew Arnold : Dover Beach

"......I was as it were a child of thee

And trusted to thy billows far and near,

And laid my hand upon thy mane—as I do here".[১]

সুইনবার্ণও সমুদ্রের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তায় একাকার হয়ে যেতে চেয়েছেন।

"I will go back to the great sweet mother,

Mother and lover of men, the sea.

I will go down to her, I and none other,

Close with her, kiss her and mix her with me ;"[২]

'গোপন-প্রিয়া'র মধ্যেও প্রিয়া-বিরহের সুর বেজে উঠেছে। দূরের প্রিয়াকে কবি পান নি বলেই তার প্রতি তাঁর ভালবাসা আজও অম্লান হয়ে আছে। মিলনে প্রেমের সঙ্কোচন, বিরহে সম্প্রসারণ। কবি বিরহে মুহ্যমান নন, কেননা তাঁর কাব্যে প্রিয়ার মূর্তি ধরা পড়েছে। কবির গান কাব্য সবই প্রিয়ার প্রেমে একাকার। কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই কবি শুধু প্রেম দান করে যাবেন আজীবন।

"শিল্পী আমি আমি কবি,

তুমি আমার আঁকা ছবি,

আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।

চাইব নাক, পরাণ ভ'রে ক'রে যাব দান।"[৩]

'গোপন-প্রিয়া' কবিতাটি 'কালি-কলমে'র প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়।

'মাধবী-প্রলাপ' ও 'অনামিকা' কবিতাদুটি 'কালি-কলমে'র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) প্রকাশিত হয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই কবিতা দুটিতে কবি ইন্দ্রিয়গত প্রেমের নূতন ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন। 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকা কবিতাদুটির প্রচণ্ড বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। বস্তুত এই রকম Sensuous কবিতা নজরুল-সাহিত্যেও বিরল। কবিতাদুটিতে নজরুলের প্রেম সর্বসংস্কারমুক্ত, দেহস্পর্শ-

১ Byron : Childe Harold's Pilgrimage Canto IV

২ Swinburne : The Sea

৩ গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল

মুখর, আবেগপ্রতপ্ত ও যৌবনমদমত্ত। 'মাধবী-প্রলাপে' 'আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি' প্রভৃতি পংক্তিতে ভোগোন্মুখ জীবনোৎসুক কামনাতুর প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। 'অ-নামিকা' কবিতাটিতে অনাগত প্রিয়ার যে রূপ চিত্রিত হয়েছে, তার মধ্যে নজরুলের তীব্র জীবনপিপাসা ও দেহকামনা প্রকাশিত।

"তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরি
লো আমার অনাগত প্রিয়া
আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া!
তোমার বন্দনা করি...
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী!"[১]

দেহগত প্রেমের এই তীব্রতা Ben Jonson, Robert Herrick, Robert Burns, John Keats প্রভৃতি কবির কাব্য মনে করিয়ে দেয়।

Ben Jonson দেহস্পর্শপ্রতপ্ত প্রেমের জন্যে উন্মুখ।

"Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss but in the cup
And I'll not look for wine."[২]

Herrick তাঁর জীবনসর্বস্ব প্রিয়ার প্রেমে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ঘোষণা করেছেন,

"Thou art my life, my love, my heart,
The very eyes of me,
And hast command of every part,
To live and die for thee."[৩]

Burns প্রেমের মাধুর্য ও সৌন্দর্যে আত্মহারা।

১ অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল
২ Ben Jonson : To Celia
৩ Robert Herrick : To Anthea Who May Command Him Any Thing

"O my Luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June :
O my Luve's like the melodie
That's sweetly play'd in tune."[১]

Keats-এর প্রেম প্রবল ও উষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে বিশিষ্ট।

"Pillow'd upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest ;
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever,—or else swoon to death."[২]

'দারিদ্র্য' (প্রথম প্রকাশ—'কল্লোল' অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কবিহৃদয়ের তীব্রতম জ্বালাযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। যুক্তাক্ষরের সার্থক যোজনায়, শব্দনির্বাচন-দক্ষতায় ও সফল চিত্রকল্পসৃষ্টিতে কবিতাটি শুধু নজরুল-সাহিত্যেরই নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি স্মরণীয় কবিকর্ম। আবেগের সঙ্গে অলংকরণের চমৎকার সংগতি হয়েছে এই কবিতায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে নজরুলের স্বাভাবিক রোমান্টিক-তার সঙ্গে বাস্তববোধের হরগৌরী মিলন ঘটেছে। কবিতাটির এই সব গুণ সত্ত্বেও ভাবপ্রবাহের দিক থেকে একটি বৈষম্য লক্ষণীয়। কবিতাটির সূচনায় কবি দারিদ্র্যকে বহুমহৎগুণসম্পন্ন ব'লে উচ্চকণ্ঠে তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন।

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !"

কিন্তু তারপরেই কবির কাছে দারিদ্র্য এক তীব্রতম যন্ত্রণাদায়ক মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

১ Robert Burns : O My Luve's Like a Red, Red Rose
২ Keats : Bright Star, Would I Were Steadfast as Thou Art

"দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!"

ভাবের এই বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্নতা কবিতাটির মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করেছে সন্দেহ নেই। সমগ্র কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় যে, কবি দারিদ্র্যের রূঢ়, নির্মম যন্ত্রণাময় ও বাস্তব রূপকেই কবিতাটিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অনেকের রচনায় জীবনের দুঃখদারিদ্র্যের যে সুর ফুটে উঠেছিল এই কবিতাটির মধ্যে সেই সুর তীব্রতর এবং বোধহয় তীব্রতম ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত কবি আর্তনাদ করে উঠে আক্ষেপের সুরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলেন,

"পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি?"

দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবনের এই দুঃসহ মর্মজ্বালার এক সার্থক প্রকাশ দেখা যায় Sandburg-এর 'Mag' কবিতায়।

"I wish the kids had never come
And rent and coal and clothes to pay for
And a grocery man calling for cash,
Everyday cash for beans and prunes.
I wish to God I never saw you, Mag.
I wish to God the kids had never come."[১]

'বধূ-বরণ' কবিতাটিতে কবি নারীত্বের নবজাগরণ চেয়েছেন। বিবাহের রঙিন স্বপ্নে জীবন রঙিন হ'য়ে ওঠে। এরকম রঙিনতার মধ্যে নবজীবনের উদ্বোধন হোক, এই কবির একান্ত কামনা। বিবাহিত প্রেমের যে রূপ নজরুল চিত্রিত করেছেন, তার মধ্যে নারীর স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার উচ্চারিত।

১ Carl Sandburg : Complete Poems : New York 1950 : p. 13

"বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন রাঙা আভরণ,
বল নারী—'এই রক্ত আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!'
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হয়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী
বেঁধো না নয়নে আবরণ,
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ॥"

যুগধর্মের অনিবার্য প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথও প্রেমের ক্ষেত্রে নরনারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেছিলেন। নারী পুরুষের ছায়ানুসারিণীমাত্র নয়, সে পুরুষের সহগামিনী। নারীর প্রেম শক্তির সাধনা, ভীরুতার আরতি নয়। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে বলেছে,

"যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী.
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' কবিতাতেও নারীর সুদৃঢ় আত্মঘোষণা রয়েছে।

"যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী.
আমাকে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।"[১]

'প্রতীক্ষা' কবিতায় পুরুষের জবানীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।"[২]

১ সবলা : মহুয়া
২ প্রতীক্ষা : মহুয়া

'জিঞ্জির' [প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)] কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি কবিতা কবিত্বে উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট।

'অঘ্রাণের সওগাত', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'অগ্রপথিক', 'ভীরু' প্রভৃতি সৎকবিতা হিসেবে সম্মানার্হ। চরিত্র-পূজা হিসেবে 'মিসেস্ এম্ রহমান্' ও 'চিরঞ্জীব জগ্‌লুল' প্রশংসার দাবি রাখে।

'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতাটি যেন 'নবীন ধানের আঘ্রাণে' ভরপুর। নূতন সোনার ফসলের উজ্জ্বল আশা ও আনন্দে উচ্ছলিত গ্রাম্যজীবনের মধুর ঘটনাগুলিকে নজরুল সার্থক শিল্পীর মত বর্ণনা করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগসিক্ত ভাষায়। অঘ্রাণের বুকেই কবি উজ্জ্বল আগামীর রোমাঞ্চকর উদ্বোধনকে অনুভব করছেন।

"নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়।
'মুজদা' এনেছে অগ্রহায়ণ—
আসে নৌ-রোজ খোল গো তোরণ
গোলা ভ'রে রাখ সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়।
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়।"

'ঈদ মোবারক'-এ কবি ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য ও ইসলাম ধর্মের সত্যকার প্রকৃতি ব্যক্ত করেছেন। ভোগ নয় ত্যাগ, সঞ্চয় নয় ব্যয়ই হবে ঈদের আনন্দিত ঘটনা।

"ঈদ্-অল্-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপ্‌চায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পিয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর, দেদার॥"

'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়' ও 'নওরোজ' কবিতা দুটিতে চির-তারুণ্যের কবি নজরুলকে নূতনভাবে অনুভব করা যায়। আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য লক্ষণীয়। ওমর খৈয়ামের সুরই এই কবিতা দুটির প্রেরণা হয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কবিতা দুটির চরিত্র নজরুল-

চরিত্রের অনুসারী হওয়াতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় মন খুশিতে ভরে ওঠে।

কবির বেহেশ্‌তে যাবার ডাকে যৌবনের অমৃতসংগীত ঝংকৃত।

"যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরী-পরীর
শরাব সাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥"

'নওরোজ' যৌবনের জয়গানে মুখর ও আনন্দে উচ্ছল।

"ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবৎ ঢাল্ উপুড়,
রণ্-ঝনায় পা'য় নূপুর।
কিস্‌মিস্-ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ 'মোখ্‌তসর'!
কার পায়ে পড়ে কার চাদর,
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর,
আজ দিলের নাই সবুর।"

'অগ্র-পথিক'-এ যৌবনের জয়যাত্রা বন্দিত। কবি অগ্র-পথিক যুবকদের সামনে তাদের কর্তব্য তুলে ধরেছেন।

"তরুণ তাপস! নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্।
করুণায় নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল্।
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর্।
রক্ত-পিয়াসী অচঞ্চল
নির্মম-ব্রত রে সেনাদল।
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥"

'চক্রবাক' [প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)] নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থগুলির অন্যতম।

নলেজ হোম কর্তৃক পরিবেশিত বর্তমান সংস্করণে (১৩৬১) কর্মাধ্যক্ষ

গ্রন্থ-সূচনার পূর্বে তার মূল সুরটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। সেটি এখানে চয়নযোগ্য। *

"প্রেম আর প্রকৃতি নিয়েই কবির কারবার, কবি নিজের প্রিয়াকে দেখেছেন প্রকৃতির ভিতরে। প্রকৃতি আর প্রিয়া একাকার হয়ে যায়। 'চক্রবাকে'র মূল সুরও তাই। এখানে বিপ্লবী কবির বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায় না, শোনা যায় না তাঁর সোচ্চার উক্তি। এখানে ওঠে সারেঙ্গীর টুংটাং, গজলের গুনগুনানি; আছে সজল মেঘের ছায়া, কর্ণফুলীর ছলছল ব্যথা, চক্রবাক-চক্রবাকীর মুখর বিরহ। এ কবিতা সেদিক থেকে নতুন শুধু নয়, অভিনব।

কবির উদ্বেল যৌবনে একদিন চট্টল ভূমিতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেদিন 'তলোয়ার আর শিঙা' ফেলে রেখে গিয়েছিলেন নগরীর কোলাহলে, সংগ্রামেরও ক্ষণিক বিরতি ঘটেছিল। চট্টল প্রকৃতির লোভন মোহে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, ভেসে গিয়েছিলেন বিরহের স্বর্গলোকে। সেইদিনের স্মরণে এই গীতিকবিতার গুচ্ছ।"

'চক্রবাকে'র মূল সুর প্রেমবিরহ। কবি তাঁর প্রিয়াকে প্রকৃতির মধ্যে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন। পুরাতন স্মৃতি তাঁর চিত্তকে মথিত করছে। তাঁর হৃদয়চক্রবাক চক্রবাকীর জন্যে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণশীল। চক্রবাকীর উদ্দেশে গ্রন্থের নাম-কবিতায় কবি বলছেন,

> "যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
> ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
> খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি—
> খুঁজিবে সাগর মরুপ্রান্তর গিরি দরী বনভূমি।
> তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি—
> এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!"

প্রেমের এই রোমান্টিক বিষণ্ণতা (romantic melancholy) বাংলা কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীই প্রথম আমদানী করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই বিষণ্ণতার সুর চরম শিল্পোৎকর্ষ লাভ করে। পরবর্তী বাংলা কাব্যে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহকামনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে এই সুর বিশেষ প্রাধান্য পায়। বিষণ্ণ ব্যথার সকরুণ রাগিণী নজরুলের অনেক প্রেমের কবিতাতেই ঝংকৃত। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দুঃসহ বেদনা তাঁর বহু কবিতাকে বিরহের দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে দিয়েছে।

'তোমাকে পড়িছে মনে' কবিতায় বর্ষার বর্ষণমুখর বিরহকাতর রাত্রিতে প্রিয়াকে কবির মনে পড়েছে। স্মরণপারের প্রিয়া, যাকে কবি জীবনে পাবেন না তার উদ্দেশে গান রচনা করছেন। কবির বিরহ-ব্যথা শতগীতসুরে নিখিল বিরহীকণ্ঠে ধ্বনিত। 'তোমাকে পড়িছে মনে' কবিতাটি কবির বিরহের হতাশ্বাসে তীব্রমধুর। কবি ও তাঁর প্রিয়া এই উভয়ের বিরহব্যথায় নিখিল-বিরহের মহাসংগীত বিধৃত।

"আমার বেদনা আজি রূপ ধরি' শতগীত সুরে
নিখিল বিরহী-কণ্ঠে—বিরহিণী—তব তরে ঝুরে!
এ-পারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল!
তুমি দাও আঁখিজল, আমি দিই ফুল।"

এই প্রসঙ্গে বিহারীলালের বিরহীমনের একটি বিষণ্ণ করুণ সুর মনে পড়ে।

"মাঝেতে উথলে নদী দুপারে দুজন—
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন।"[১]

কবির ধারণা—আনন্দকোলাহলে প্রেমের সত্যকার মূর্তি ফোটে না। তাই কবি বিরহের গভীরে প্রেমের ধ্যান করতে উৎসুক। তিনি বাদল রাতের পাখীকে বলেছেন বিরহলোকে উড়ে যেতে।

"বাদল রাতের পাখী,
উড়ে চল্—যেথা আজো ঝরে জল, নাহিক ফুলের ফাঁকি।"

এই সুরটিই তীব্রতরভাবে ধ্বনিত হয়েছে পরবর্তী কবিতা 'স্তব্ধ-রাতে'র মধ্যে। সুখবাদীদের উদ্দেশ করে কবির ভাষণ যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নজরুলের উক্তি—

"ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তারে আজি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্ত-হীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?"

'দুঃখবাদী' যতীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন,

"মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।"[২]

---

১ বিহারীলাল চক্রবর্তী : সারদামঙ্গল
২ দুঃখবাদী : মরুশিখা

'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' প্রকৃতিপ্রেমের কবিতা হিসেবে স্মরণীয়। আবেগের গাঢ়তা, আন্তরিকতার গভীরতা এবং সর্বোপরি স্মৃতিস্বপ্নের বর্ণবিন্যাস কবিতাটিকে এক আশ্চর্য অপূর্বতায় মণ্ডিত করেছে। কবির প্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হ'য়ে যাওয়াতে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। গুবাক তরুর সারির সঙ্গে কবি অন্তরঙ্গভাষণে রত। একে ছেড়ে যেতে হবে বলে তিনি ব্যথায় অভিভূত। তারি উদ্দেশে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দিঘল তাহার দেহের রেখা।
তব ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ যে তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ীর আঁচলখানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া।"

'কর্ণফুলী' কবিতাটিতেও বিরহের সুর ঝংকৃত। কবি কর্ণফুলীকে তাঁর প্রিয়ার সঙ্গে এক ক'রে ফেলেছেন।

"তুমি কি পদ্মা, হারানো গোমতী, ভুলে-যাওয়া ভাগীরথী –
তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?"

কবির কাছে—এই পার্বতী উদাসিনীর স্রোত কোনো পাহাড়ের হাড় গলা আঁখিজল। কর্ণফুলী নদী নারী বলেই পাষাণনরের ক্লেশ অনুভব করতে অক্ষম। 'কর্ণফুলী'র নামকরণের একটি রোমাণ্টিক ইতিহাস দিয়েছেন কবি।

"ওগো ও কর্ণফুলী!
তোমার সলিলে পড়েছিল কবে কার কান-ফুল খুলি?
তোমার স্রোতের উজান ঠেলিয়া কোন্ তরুণী কে জানে,
"সাম্পান" নায়ে ফিরেছিল তার দয়িতের সন্ধানে!
আনমনা তার খুলে গেল খোঁপা, কান-ফুল গেল খুলি,
সে ফুল যতনে পরিয়া কর্ণে হলে কি কর্ণফুলী?"

'পথচারী' এই গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। পথচারী নদীর গতির মধ্যে নজরুলকবিমানসের গতিশীলতা স্পন্দিত। নদীর ভাষণের অন্তরে কবিকণ্ঠের মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কবিতাটির প্রবাহমানতা লক্ষণীয়। প্রতি ছত্র কবির আবেগে উদ্বেলিত। মহাবেদনা-সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে

কবিজীবনের প্রতীক নদী ছুটে চলেছে পৃথিবীর পঙ্কিল ব্যথাশ্রুকে বহন করে। এই কবিতাটির গতিশীলতা Bergson-প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র গতিবাদকে মনে না করিয়ে দিয়ে পারে না। বার্গসঁ অবিরাম গতিপ্রবাহের পিছনে কোন সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টির গতিপ্রবাহ এক তীর্থদেবতার অভিসারে ধাবিত। নজরুলের গতিপ্রবাহও রবীন্দ্রনাথের মত একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অভিমুখে চালিত।

রবীন্দ্রনাথ 'চঞ্চলা'কে উদ্দেশ করে বলেছেন,

"শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও;
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।" [১]

নজরুলের 'পথচারী'ও নিরন্তর ছুটে চলেছে—

"ওরে বোনাজল, চল্ চল্ চল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্!
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি।"

'গানের আড়াল' ও 'এ মোর অহঙ্কার'-এ প্রেমিকহৃদয়ের বিচিত্র ভাবকল্পনা ব্যক্ত হয়েছে। 'গানের আড়াল' কবিতায় প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের চিরন্তন আবেদন ভাষা পেয়েছে। কবির গানকে লোকে গ্রহণ করে, কিন্তু সে গান-সৃষ্টির পিছনে তাঁর ব্যথাবেদনা ও ক্রন্দনকে কেউ লক্ষ্য করে না। কবির গান বহু লোকের ভূষণ হলেও তা তাদের হৃদয়ের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে না। কবির তাই মিনতি—তাঁর গানের ভিতর দিয়ে যেন তিনি প্রেমিকার অন্তরের কাছাকাছি হন।

"তোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি।"

'এ মোর অহঙ্কার'-এর মধ্যে প্রেমের একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশিত। প্রেমিকের কল্পনা প্রেমিকাকে নূতন রূপে মণ্ডিত করে। প্রিয়া নিখিল

[১] চঞ্চলা: বলাকা

রূপের রাণীমূর্তিতে কবির স্বপ্নে প্রতিভাত হয়। কবির কাব্যে প্রিয়ার শাশ্বত যৌবনরূপ ধরা পড়ে। কবি প্রিয়াকে নিয়ে মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। কবির সঙ্গে প্রিয়ার সম্পর্ক নিত্যকালের। যদি পৃথিবীতে চিরকালের প্রিয়া পূর্ণভাবে ধরা নাও দেয়, তবুও প্রিয়ার স্মৃতি তাঁর পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল ক'রে রাখবে। প্রিয়া তখন তাঁকে ভুলে গেলেও কিছু যায় আসে না; কেননা কবি প্রিয়ার জন্যে গান রচনা করে যাবেন, এই অহঙ্কারের আনন্দেই তিনি উল্লসিত।

"নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ংবর-সভায়!
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন!
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার,
আমি তোমার গাঁথ্‌ছি মালা এ মোর অহঙ্কার!"

'হিংসাতুর-'এ কবি প্রিয়াকে বলেছেন যে, তাঁর আঘাত-অভিমানের অন্তরে কোন বিদ্বেষ বা হিংসা ছিল না; বেদনাতুর মানুষের কথাই তাঁর অন্তরে গুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে।

"কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না, রাণী,
কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্‌বুদ-বাণী!
তুমি কি বুঝিবে, কত ক্ষত হ'য়ে বেণুর বুকের হাড়ে
সুর ওঠে হায়, কত ব্যথা কাঁদে সুর-বাঁধা বীণা-তারে!"

'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' নজরুলের শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতামালার অন্যতম পুষ্প। এখানে কবির ধ্যানদৃষ্টিতে প্রেম ও মৃত্যু অভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। তাঁর চিরজনমের প্রিয়া আজ মিলন-গোধূলি-লগ্নে রাঙামৃত্যুর রূপে আবির্ভূতা। এই ব্যর্থ গোধূলিলগ্ন শুধু এই জন্মেই আসে নি, বারে বারে জন্মজন্মান্তরে এসেছে।

"ব্যর্থ মোদের গোধূলি-লগন এই সে জনমে নহে,
বাসর-শয়ন হারায়ে তোমায় পেয়েছি চির-বিরহে!
কত সে লোকের কত নদনদী
পারায়ে চলেছি মোরা নিরবধি,
মোদের মাঝারে শতজনমের শত সে জলধি বহে।
বারে-বারে ডুবি বারে-বারে উঠি জন্ম-মৃত্যু-দহে!"

এজন্যে কবি মৃত্যুর উৎসবে বর সেজে অভিসারে এসেছেন। কবির আশা—তাঁর প্রিয়া সমস্ত পথধূলি মুছে মরণের পারে তাঁকে বুকে তুলে নেবে। মরণের মধ্যে বিবাহের নহবত শুনতে পাচ্ছেন কবি। নবজীবনের বাসরদ্বারে প্রিয়া বধূবেশে আসবে, এই আনন্দেই তিনি মৃত্যুর উৎসবে বর সেজেছেন।

"নব-জীবনের বাসর-দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' বধূ হবে—
সেই সুখে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে।"

প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় রূপ ব্যক্ত হয়েছে দেশী ও বিদেশী বহু প্রখ্যাত কবির রচনায়। এই প্রসঙ্গে Edmund Spenser-এর একটি সনেটাংশ আহর্তব্য।

'My verse your virtues rare shall eternize,
And in the heavens write your glorious name:
Where, whenas Death shall all the world subdue,
Our love shall live, and later life renew." [১]

'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থ [প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)] অর্পিত হয় মাদারিপুর "শান্তি সেনা"র করশতদলে ও বীর সেনানায়কদের শ্রীচরণাম্বুজে। এই গ্রন্থে নজরুলের বিদ্রোহী ও সমাজসচেতন সুরেরই অনুবৃত্তি।

ভারতের পরাধীনতার জ্বালায় কবি জর্জরিত। তাই তিনি দশভুজাকে আহ্বান করেছেন প্রলয়ঙ্করী বেশে আবির্ভূতা হতে। পরাধীনতার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। সন্ধ্যা ভারতের স্বাধীনতাসূর্যহীন সময়ের প্রতীক। ভারতের এত সন্তান আত্মবলিদান দিচ্ছে, তবুও কি স্বাধীনতার সূর্য পুনরুদিত হবে না? তরুণ তাপসের কণ্ঠে কবি বলেন,

"যে পরাজয়ের গ্লানি মুখে মাখি ডুবিল সন্ধ্যা-রবি,
সে গ্লানি মুছিতে শতশতাব্দী দিতেছি মা প্রাণ-হবি।
... ...
সন্ধ্যা কি কাটিবে না?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা?
কোটি কর ভরি' কোটি রাঙা হৃদি-জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস আশিস্, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভুজা!
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর ভীরুর ভারত লয়!"

[১] Edmund Spenser : One Day I Wrote Her Name

চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ছন্দে রচিত 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির অসামান্য শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়েছে।

"নব ঋত্বিক নবযুগের!
নমস্কার! নমস্কার!
আলোকে তোমার পেনু আভাস
নওরোজের নবউষার!
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
দরদ্-ই-দিল্, নীলমানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা-ঋক্।"

নজরুল যৌবনের কবি। তিনি যৌবনের অমিত শক্তি ও সর্ববাধামুক্ত গতিতে বিশ্বাসী। যৌবনের দুর্বার জয়যাত্রাকে রোধ করবার সাধ্য পৃথিবীর কোন শক্তিরই নেই।

"এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?" [১]

শেলীও পশ্চিমা ঝড়ের মধ্যে এই অপ্রতিহতগতি যৌবনশক্তিকে আহ্বান করেছেন।

"Be thou, Spirit fierce.
My spirit! Be thou me, impetuous one!" [২]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর মধ্যে একটি গানে আছে,

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

'আমি গাই তারি গান' ও 'জীবন-বন্দনা' কবিতা দুটিতে নজরুল নবযুগ-নির্মাতাদের বন্দনা করেছেন। জীবন ও যৌবনের অগ্রদূতদের হাতে জরামৃত্যু পরাজিত হওয়াতে পৃথিবী নূতন রূপ ধরেছে। তাই কবি তাদের জয়গানে মুখর।

"আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।"

১ যৌবন-জল-তরঙ্গ : সন্ধ্যা
২ Shelley : Ode to the West Wind

পৃথিবীর শ্রমশক্তি এই জীবন ও যৌবনের প্রতীক, কেননা এই শক্তিই ধরণীর মাটি মন্থন করে অমৃত তুলে আনে। 'জীবন-বন্দনা'য় কবির ঘোষণা—

"গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে-ফলে!"

কার্ল স্যাণ্ডবার্গও তাঁর 'I am the People, the Mob' কবিতায় বিশ্বের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে দুর্জয় শ্রমশক্তির জয়যাত্রা ও তার মহৎ কার্যকলাপের অমৃতরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন।

"I am the people—the mob—the crowd—the mass.
Do you know that all the great work of the world
is done through me?
I am the workingman, the inventor,
the maker of the world's food and clothes.
I am the audience that witnesses history." [১]

'চল্ চল্ চল্' কোরাস গানটি ঢাকা সফর কালে (১৯২৮ সাল) রচিত হয়েছিল। 'অরুণ প্রাতের তরুণ দলে'র অগ্রগতির পদধ্বনি গানটির ছত্রে ছত্রে অনুরণিত। তারুণ্যের এমন বন্দনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

"ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।"

তারুণ্যের এই জয়গান রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতার স্পিরিটকে মনে করিয়ে দেয়।

১ Carl Sandburg : Complete Poems : New York 1950 : p. 71

"আপদ আছে, জানি আঘাত আছে—
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই, পুঁথিপোড়োয় কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥"

'অন্ধ স্বদেশ-দেবতা' কবিতায় নজরুলের দেশাত্মবোধ তীব্র আন্তরিকতায় প্রকাশিত। শহীদদের রক্তরঞ্জিত পথেই কবি স্বাধীনতার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন।

"সেই পথে চলে অন্ধদেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,
"ওরে ওঠ্ ত্বরা করি'
তোদের রক্তে-রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী!""

এই গ্রন্থের 'না-আসা-দিনের কবির প্রতি', 'জীবন' ও 'পাথেয়' এই তিনটি কবিতা শিশিরবিন্দুর মত উজ্জ্বল, সুন্দর ও নিটোল। এখানে নজরুল অনেক সংযতবাক, স্থিতপ্রাজ্ঞ ও দীপ্তআশাবাদী।

'না-আসা-দিনের কবির প্রতি' কবিতায় আশাবাদী নজরুল স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর।

"জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রাঙা অরুণ রবি
তোমরা উঠিছ; না-আশা দিনের তোমরা কবি।
যে রাঙা প্রভাত দেখিবার আশে আমরা জাগি
তোমরা জাগিছ দলে দলে পাখি তারির লাগি।
স্তব-গান গাই আমি তোমাদেরি আসার আশে,
তোমরা উদিবে আমার রচিত নীল আকাশে।
আমি রেখে যাই আমার নমস্কারের স্মৃতি—
আমার বীণায় গাহিও নতুন দিনের গীতি!"

'জীবন' কবিতায় কবি জাগরণের সাড়া অনুভব করেছেন প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রে।

"জাগরণের লাগ্‌ল ছোঁয়াচ মাঠে ঘাটে তেপান্তরে,
এমন বাদল ব্যর্থ হবে তন্দ্রা-কাতর কাহার ঘরে?
তড়িৎ ত্বরা দেয় ইশারা, বজ্র হেঁকে যায় দরজায়,
জাগে আকাশ, জাগে ধরা—ধরার মানুষ কে সে ঘুমায়?

মাটির নীচে পায়ের তলায় সেদিন যারা ছিল মরি,
শ্যামল তৃণাঙ্কুরে তারা উঠ্‌ল বেঁচে নতুন করি ;
সবুজ ধরা দেখছে স্বপন আস্‌বে কখন ফাগুন-হোলি
বজ্রাঘাতে ফুটল না যে, ফুটবে আনন্দে সে কলি !"

'পাথেয়' কবিতাটি হার্দ্য যন্ত্রণায় বিদ্ধ। উপক্ষিত জনসমাজের সঙ্গে কবি আত্মীয়তা উপলব্ধি ক'রে প্রলয়ের অগ্রদূত শনিকে আহ্বান করছেন অত্যাচারীদের ধ্বংস ক'রে নুতন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করতে।

"দরদ দিয়ে দেখ্‌ল না কেউ যাদের জীবন যাদের হিয়া,
তাদের তরে ঝড়ের রথে আয় রে পাগল দরদিয়া।
শূন্য তোদের ঝোলাঝুলি, তারি তোরা দর্প নিয়ে
দর্পীদের ঐ প্রাসাদ চূড়ে রক্ত-নিশান যা' টাঙিয়ে।
মৃত্যু তোদের হাতের মুঠায়, সেই ত তোদের পরশ-মণি,
রবির আলোক ঢের সয়েছি, এবার তোরা আয় রে শনি !"

'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রজবিহারী বর্মন এই কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন,

". ৯৩০ সালে কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয়-শিখা' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করি। ইচ্ছাকৃত ভাবেই, গরম গরম কবিতা তাতে রাখা হয়। 'রাজদ্রোহে'র ভয়ে যে সব কবিতা পূর্বে কোন বইয়ে দেওয়া হয় নি সেগুলো এবং কয়েকটি নয়া কবিতাও এতে সংযোজিত হয়। বর্তমান প্রকাশিত বইয়ে সে-গুলোর সব নেই।" [১]

'প্রলয়-শিখা'র প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ লাভ করে ১৩৫৬ সালের ভাদ্র মাসে (১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই এর মূল সুর গুঞ্জরিত। প্রলয়ের দেবতা নটনাথের তাণ্ডবলীলায় বিশ্ব জুড়ে সর্বনাশের তরঙ্গ উঠেছে। এই প্রলয়-কালে যারা শত্রুর চক্রান্ত ধ্বংস করতে পারবে, তারাই এই প্রলয় শেষে হবে স্বর্গীয় শান্তিসুখের অধিকারী।

"বিশ্ব জুড়িয়া প্রলয়-নাচন লেগেছে ঐ
নাচে নটনাথ কালভৈরব তাথৈ থৈ।

১ কসল, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৫ : পৃ ২৭৫

মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ
দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়-বহ্নি
সর্ব-নাশ !
উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা
অনির্বাণ
জতুগৃহদাহ অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে
মহাপ্রয়াণ।"

'চাষার গান'-এ কৃষকজাগৃতির কথা পরিস্ফুট। আন্তরিকতায় কবিতাটি অভিষিক্ত। 'ঘরের বেটী'র সঙ্গে 'জমির মাটী'র রূপক চিত্তগ্রাহী।

"আমাদের জমির মাটী ঘরের বেটী,
সমান রে ভাই।
কে রাবণ করে হরণ
দেখ্‌ব রে তাই॥

যে লাঙল-ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে,
আছে সে লাঙল আজও
রুখবো তাতেই রাজার সেপাই॥"

শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পরাধীন দেশে বিদ্রোহ-চেতনা ও মুক্তি-পিপাসা জাগবে। যতীন দাস দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই 'যতীন দাস' কবিতায় কবি শত্রুজয়ী বিপ্লবী শক্তিকে উদ্বোধন করতে তৎপর।

"মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো,
জাগ্‌ এইবার, খড়্গ ধর।
দিয়াছি 'যতীনে' অঞ্জলি—
নবভারতের আঁখি-ইন্দীবর।" [১]

'খেয়ালী' কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশী করে অনুভূত হলেও নজরুলের কবিমানসের আপন-ভোলা সুরটি চিত্তাকর্ষক।

১ যতীন দাস : প্রলয়-শিখা

"আয় রে পাগল আপন-বিভোল খুশীর খেয়ালী
হাতে নিয়ে রবাব-বেণু রঙীন পেয়ালী
ভোজ-পুরীদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়
আঙিনাতে জাল্ রে তোরা অরুণ দেয়ালি
স্বপন-লোকের পথিক তোরা ধরার হেঁয়ালি।"

'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম কবিতা 'নতুন চাঁদে'র মধ্যে গ্রন্থের মূল সুর ঝংকৃত। কবি নূতন যুগের চাঁদকে স্বাগত জানিয়েছেন।

"চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে একসাথে গলে গলে
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে।
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার,
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।"

নিত্য অভেদ উদারপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয় নৌজোয়ানদের বুকে নূতন চাঁদ দুরন্ত জোয়ার আনে, জরার বাঁধ ভেঙে ফেলে। নৌজোয়ানদের পথ দেখাতেই নূতন চাঁদের অভ্যুদয়।

"এদেরেই পথ দেখাতে ঐ
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে। ভীরুরা যাসনে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ।"

'চির-জনমের প্রিয়া' একটি অশ্রুদীপ্ত সুন্দর রোমান্টিক কবিতা। এই প্রিয়াই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ অন্বিষ্টা। কবি এই প্রিয়াকে পেয়েও হারিয়েছেন। এখন তার অন্বেষণে তিনি ব্যাকুল।

"কোন্ সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন শেষে, প্রিয়া,
বেদনা সাগরে চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া
পালাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে! নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হ'তে!"

কবির গতজন্মের যে অশ্রু নিদারুণ বেদনায় মুক্তা হয়ে উঠেছে তাই তিনি গানে গেঁথে প্রিয়ার উদ্দেশে অঞ্জলি দিচ্ছেন। কিন্তু কবি জানেন—বহুবারের মত এবারকার আগমনও প্রিয়া ভুলে যাবে। কবির তৃষ্ণা মেটানোর সাধ্য প্রিয়ার নেই। তাই বিরহ-তপ্ত আকাশই অক্ষয় হোক—এই কবির প্রার্থনা।

"কহিলাম যত কথা প্রিয়তমা মনে করো সব মায়া,
সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া!
মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল!"

বিরহই সত্য। মিলনের মধ্যেও তৃষিত বিরহের আশঙ্কা যায় না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও এই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। বৈষ্ণবকবি তাই লিখেছেন, "দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" বস্তুত প্রেমপূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়ে জীবনতৃষ্ণা মেটানো অসম্ভব, কেননা এ ক্ষেত্রে তৃষ্ণা বেড়েই চলে। প্রিয়ার প্রেমে জীবনের পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভবপর নয়, কারণ, আরও বড় পিপাসায় সে পিপাসিত।

'আমার কবিতা তুমি' কবিতায় কবির কবিতা প্রিয়ারূপ ধ'রে আবির্ভূতা। কবির মরুভূমি মুহূর্তে হ'য়ে উঠেছে বনভূমি, আর গোলাপ-দ্রাক্ষাকুঞ্জে সেই বনভূমি হয়েছে আকীর্ণ। কবির যৌবনোন্মাদনা, বিদ্রোহ, জাতির চারণ-সংগীত, সবই প্রিয়ার প্রেমকে পাবার আকুলতা থেকে উৎসারিত।

"জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মদ বেগ, হে প্রিয়া, তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি'।
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,
মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোন্‌খানে!"

'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথের অশীতিবার্ষিকী জন্মোৎসবে তাঁর চরণারবিন্দে অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। কবি 'বসন্ত' নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন—এই ঘটনার উল্লেখও রয়েছে এই কবিতায়।

"হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তে'র পুষ্পিত মালিকা।"

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে নজরুল তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচছেন।

"মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন,
'তরবারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হ'লে পুচ্ছ-কেতু?'
হাসিয়া কহিলে পরে, 'এই যশ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন!
এ মজা না পেলে মন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করে
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?'"

নজরুলের প্রেরণার উৎস যে রবীন্দ্রনাথ একথা তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি তাঁর নবজন্মের কাহিনী শুনিয়েছেন এই কবিতায়। তাঁর কবিজীবনের রূপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদেই।

"অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছে'য়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা!
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি!
দ্রষ্টা তুমি দেখেছিলে আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণ-ঘন-রূপে!
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে।"

এই কবিতাটি একাধিক কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমত, কবিতাটিতে নজরুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা-বিষয়ক স্পষ্ট উক্তি আছে। দ্বিতীয়ত, নজরুলের বিদ্রোহী রূপ থেকে প্রেমিক মূর্তিতে রূপান্তরের ইঙ্গিতও রয়েছে এই কবিতায়। নজরুল এই রূপান্তরকে যে একান্ত কাম্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার শেষাংশে। নজরুলের কবিমানসবিচারে কবিতাটি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই।

'ওঠ্ রে চাষী' কবিতায় নজরুল চাষীদের জাগরণের গান গেয়েছেন। চাষীদের অবস্থা-বর্ণনায় নজরুলের কবিদৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা পাঠককে মুগ্ধ করে। নজরুল চাষীদের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন। তাহলে অত্যাচারী লুণ্ঠনকারীদলের স্বার্থসাধন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

"জাগে নাকি শুক্‌নো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর?
চোখ বুজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর?

হাত তুলে তুই চা'দেখি ভাই, অম্‌নি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভর্‌বে খামার নড়বে খোদার কল!"

'শিখা' কবিতায় পরাধীন ভারতের তদানীন্তন মর্মজ্বালা আবেগদীপ্ত ভাষায় প্রকাশিত। অতীতের দাসত্ব, চাকরির মোহ, যৌবনহীনতা ও সস্তা রাজনীতিই ভারতের দুর্দশার জন্যে দায়ী। জনগণ-পতিদের বিষয়ে নজরুলের মনোভাব লক্ষণীয়।

"হায়রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার!
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরীর মোহ
যৌবনের টীকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে
যৌবনে বাহন করি' পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতের জন-গণ-পতি!
যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়!—রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু'হাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?"

মুসলমান ধর্মের সত্যস্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে 'আজাদ' কবিতায়।

"অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে
আসে নিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন ক'রে?

ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ

এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ?”

‘মরু-ভাস্কর’ [প্রথম প্রকাশ—১৩৬৪ সাল (১৯৫৭)] বিশ্বনবী হজরত মোহম্মদের জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমীলা নজরুল ইস্‌লাম গ্রন্থটি সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানে আহরণযোগ্য।

“অনেকদিন আগে দার্জিলিং-এ বসে কবি এই কাব্যগ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিক ভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হজরত মোহম্মদের জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে তিনি বইখানি শেষ করেন।

এই গ্রন্থখানির মুদ্রণ-স্বত্ব প্রথমে শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী কিনে নেন। সুদীর্ঘ দিন ধরে তাঁর কাছে গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত অবস্থায়ই পড়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সেই দরদী বন্ধু গ্রন্থখানির সর্বস্বত্ব আবার আমাদেরই ফিরিয়ে দেন।”

সমগ্র জীবনীকাব্যগ্রন্থখানি তিনটি সর্গে বিভক্ত। কাব্য হিসেবে এটি মোটেই উঁচুদরের নয়। তবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু সুন্দর মধুস্বাদী পংক্তি সংগ্রহ করা সম্ভবপর। ভক্তিসিক্ত আবেগাপ্লুত হৃদয়ের স্পর্শ মাঝে মাঝে দোলা দেয়।

প্রথম সর্গের অবতরণিকার আরম্ভটি চিত্তাকর্ষক।

“জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখি
নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।” ১

হজরতের স্ত্রী খদিজার উক্তির মধ্যে মানবেতিহাসে হজরতের অমূল্য কল্যাণকর্মের কথা উচ্চারিত।

“সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে—
‘দূর কর ঐ লাত্ মানাতেরে পূজে যাহা সব-জনে!
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।’” ২

‘শেষ সওগাত’ কাব্যগ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫)

১ প্রথম সর্গের অবতরণিকা : মরু-ভাস্কর
২ তৃতীয় সর্গ : মরু-ভাস্কর

নজরুলের পুরনো স্বর ও সুরেরই রোমন্থন রয়েছে। সর্বসমেত বিয়াল্লিশটি কবিতার মধ্যে মাত্র চারপাঁচটি কবিতার বুকেই নজরুলকাব্যের পুরনো উত্তাপ ও স্পন্দন নূতন করে অনুভূত হয়। এই প্রসঙ্গে 'চিরবিদ্রোহী', 'নবযুগ', 'কবির মুক্তি', 'ছন্দিতা' ও 'পার্থ-সারথি' কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

'শেষ সওগাত'-এর ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন,

"নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ।

ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান।

নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সংকলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।"

কিন্তু 'পরিণত প্রতিভার দানে' নজরুল-কবি-মানসের বিশেষ কোন পরিণতির স্বাক্ষর দেখা যায় না।

'চিরবিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নি-বীণা'র 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতার সঙ্গে পঠনীয়।

"হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধ্‌তে তুমি পারবে না।
তোমার সর্বশক্তি আমায়, বাঁধতে গিয়ে
হার মেনে যায়!
হায় হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।

ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ।
সে জাল ছিঁড়ে এ ধূমকেতু
বিনাশ ক'রে বাঁধার সেতু
সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ।"

কবি এখানে তাঁর বিদ্রোহী হবার কারণ উল্লেখ করেছেন স্পষ্টভাবেই। বিধাতার প্রতি গভীর অভিমান থেকেই তাঁর বিদ্রোহ জেগেছে। পৃথিবীর দুঃখ ও সৃষ্টির বিশৃঙ্খলায় কবি গভীরভাবে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ।

"বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন ?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই ত কাঁদে আমার প্রাণ।
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান !"

কবি কবে শান্ত হবেন তার নির্দেশও দিয়েছেন এই কবিতায়।

"বিদ্রোহ মোর আস্‌বে কিসে, ভুবনভরা দুঃখশোক !
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়
শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখে মুক্ত হোক।"

'নবযুগ'-এর মধ্যে 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের বিদ্রোহী কবিসত্তাকে অনুভব করা যায়।

"মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নব-জাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে ?
আর দেরী নাই ওদের কুঞ্জ ধূলিলুণ্ঠিত হবে !"

'কবির মুক্তি'তে আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু ও রীতি সম্পর্কে কবির মন্তব্য পরম উপভোগ্য। ব্যঙ্গের সুরটি গদ্যচ্ছন্দের চালে চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। শব্দচয়নে অতিআধুনিকতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট।

"মিলের খিল খুলে গেছে !
কিল্‌বিল্‌ করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল—
কেঁচোর মতন—
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু !
কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে ?
তালতলা দিয়ে যেতে হ'লে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে !
এই যাঃ ! মিল হয়ে গেল !
ও তাল-তলার কেরদানী—দুত্তোর !"

'কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন? ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও!', 'কবিতা-লেখার মসলা পেলেই হ'ল তা না-ই হল গরমমসলা।'—প্রভৃতি উক্তিতে নজরুলের বিদ্রূপ শাণিত হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার তথাকথিত মিলহীনতা ও বিষয়বস্তুর দৈন্য তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

'পার্থ-সারথি' কবিতায় জীবন ও যৌবনের অমরত্বে পূর্ণবিশ্বাসী কবির উজ্জ্বল আশাবাদ উচ্চারিত।

"মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে
শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি
অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে॥
দুরন্ত দুর্মদ যৌবন-চঞ্চল
ছাড়িয়া আসুক মা'র স্নেহ-অঞ্চল
বীর সন্তান দল
করুক সুশোভিত মাতৃ অঙ্ক॥"

ছন্দ-বৈচিত্র্যে 'ছন্দিতা' উপভোগ্য।

॥ ৩ ॥

এ যাবৎ নজরুলের কাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার লক্ষ্য প্রধানত তাঁর কাব্যের ভাবপ্রবাহ ও কবিধর্মের বিচার। কবিতার নির্মিতি-নৈপুণ্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু কিছু আলোচনা করা হলেও সে ব্যাপারের কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয় নি। প্রত্যেক কবিতারই শুধু নয়, যে কোন রচনারই একটি স্বকীয় পূর্ণাঙ্গ রূপ থাকে। ভাববস্তু ও আঙ্গিক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভাববস্তুকে কবিতার অন্তরঙ্গ বললে, আঙ্গিককে বলা যায় বহিরঙ্গ। এ থেকে একথা ভাবলে ভুল হবে যে, কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বলে দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নিয়ে যে অবিভাজ্য কেন্দ্রিত ঐক্য, তাই কবিতার আত্মা। অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ-রচনায় যেমন ক্রিয়াশীল, বহিরঙ্গ তেমনি অন্তরঙ্গ-গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে একথা ঠিক যে, সোজাসুজি অন্তরঙ্গে প্রবেশের কোন পথ নেই, বহিরঙ্গের দরজা দিয়েই রসের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়। তাই বহিরঙ্গের পরিচয় অপরিহার্য। শব্দ, ছন্দ এবং

উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকার কাব্যের বহিরঙ্গ গঠন করে।

অনেক সময় বহিরঙ্গের মন-ভোলানো চাকচিক্য পাঠকের হৃদয়ে মহৎ কাব্যের প্রতীতি সৃষ্টি করে। কিন্তু সত্যকার সমালোচক-পাঠক বহিরঙ্গের বর্ণাঢ্যে বিভ্রান্ত হন না। তিনি দেখতে চান—বহিরঙ্গের পথে সমৃদ্ধ অন্তরঙ্গে প্রবেশ করা যাচ্ছে কিনা। মনে রাখতে হবে—বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গে প্রবেশের সহায়স্বরূপ, আপনাতে আপনি শেষ হলে তা কাব্যসৃষ্টির অন্তরায়। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কবিতার অন্তরঙ্গে যেমন আবেগের প্রাধান্য, তার বহিরঙ্গ-গঠনে তেমনি প্রজ্ঞা কার্যকরী। নজরুল আবেগপ্রধান কবি, তাই কাব্যের বহিরঙ্গ-গঠনে তাঁর কৃতিত্ব অন্তরঙ্গ-নির্মাণ-নৈপুণ্যের তুলনায় কম। বস্তুত নজরুলকাব্য যতটা ভাবসমৃদ্ধ সেই অনুপাতে প্রযুক্তিভূষিত নয়। প্রযুক্তিশিথিলতার জন্যে নজরুলের অনেক কবিতা ভাবৈশ্বর্যশালী হয়েও উন্নত শিল্পলোকে পৌঁছতে পারে নি।

নজরুলের ভাষা লক্ষণীয় পরিমাণে বেগবান, শাণিত, সংগ্রামমুখর ও বলিষ্ঠ। বাংলা ভাষায় নজরুল যে অসীম বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছেন তা তাঁর কবিমানসের শক্তিশালী ও সংগ্রামশীল রূপেরই পরিচায়ক। নজরুলের পূর্বে ভাষার ঠিক এই ধরনের সংগ্রামশীল মূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম না। তবে এ কথা তাঁর বিদ্রোহবোধক কবিতাগুলির বিষয়েই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁর প্রেম প্রকৃতি ও ধর্মমূলক কবিতাগুলিতে ভাষা সাধারণত রবীন্দ্রানুসারী। ইংরেজী সহিত্যের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না থাকার দরুন তাঁর পদবিন্যাস-রীতিতে ইংরেজী বিধান নেই বললেই চলে। তবে আরবী ও ফারসী ভাষার বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে অবহিত হওয়ার ফলে তাঁর ভাষায় আরবী ও ফারসী বাক্য-বন্ধ-রীতি আবিষ্কার করা সুকঠিন নয়। গ্রাম্যজীবন ও সমাজের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রাবলীর সঙ্গে যেমন তাঁর আন্তরিক পরিচয় ছিল, তেমনি তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি। এইজন্যে নজরুলের শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য অনেক কবির তুলনায় অধিক। তবে নজরুল আবেগপ্রধান ও অসতর্ক কবি হওয়ার ফলে তাঁর ভাষা বহুস্থলে অযত্নসাধিত।

শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে নজরুল দেশীবিদেশী তৎসমতদ্ভব প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। তাঁর কবিতায় পারসী বা ফারসী

শব্দের বাহুল্য লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। 'আমার কৈফিয়ৎ' (সর্বহারা) কবিতায় নজরুল এ বিষয়ে লিখেছেন, 'হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত-নেড়ে।" আরবীফারসী শব্দের ব্যবহার বহুপূর্বেই বাংলা সাহিত্যে আরম্ভ হয়েছিল। মুকুন্দরাম, আলাওল, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলাল প্রভৃতি কবির কাব্যে আরবীফারসী শব্দের বাহুল্য চোখে না পড়ে পারে না। তবে এ বিষয়ে নজরুলের উপর সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের 'তাজ' (অভ্র-আবীর), 'কবর-ই নূরজাহান্' (অভ্র-আবীর), 'সাল্-পহেলী' (বেলাশেষের গান), 'সাল্-তামামী' (বেলাশেষের গান), 'ইন্‌সাফ্' (বিদায় আরতি) প্রভৃতি আরবী-ফারসী-শব্দবহুল কবিতা 'মোহর্‌রম' (অগ্নি-বীণা), 'ঈদ মোবারক' (জিঞ্জীর), 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়' (জিঞ্জীর), 'নওরোজ' (জিঞ্জীর), 'নতুন চাঁদ' (নতুন চাঁদ) ইত্যাদি নজরুলের কবিতার আরবীফারসী শব্দবহুল ভাষাকে যে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"বাদশাজাদা দেখল তোমায়—দেখল প্রথম নওরোজে,
খুসী দিলের খুস্‌রোজে তার জীবন মরণ দুই যোঝে।"[১]

নজরুলের রচনার নমুনা হিসাবে একটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক।

"হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্
নওরোজের নও-ম'ফিল।
সাহেব গোলাম, খুনী আশেক,
বিবি বাঁদী,—সব আজিকে এক।
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক সামিল!
বেপর্‌ওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল-ত'বিল।
নওরোজের নও-ম'ফিল।"[২]

একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতাবলীর আরবীপারসী শব্দবহুল ভাষাতে প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ ও স্থানবিশেষে মোহিতলালের ঐ জাতীয় কাব্যভাষার প্রভাব উপলব্ধি করা

১ কবর-ই-নূরজাহান্ : অভ্র-আবীর
২ নওরোজ : জিঞ্জীর

গেলেও সমাজ রাজনীতি দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ক বিদ্রোহময় কবিতাবলীর শিল্পসিদ্ধ রূপসজ্জায় আরবীফারসী শব্দ প্রয়োগে নজরুল যে প্রাণময়তা, ওজস্বিতা ও বলিষ্ঠতার সঞ্চার করেছেন তা অপূর্বই বলা চলে। এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'কামালপাশা' (অগ্নি-বীণা), 'শাত-ইল্-আরব' (অগ্নি-বীণা), 'শহিদী-ঈদ' (ভাঙার গান) প্রভৃতি কবিতা স্মর্তব্য। প্রেম ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতাতেও পূর্বসূরীদের প্রভাব সত্ত্বেও নজরুল আরবীফারসী শব্দ ব্যবহার করে ভাষার মাধুর্য-সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নজরুলের কবি-চেতনার সঙ্গে এইসব শব্দ যেমন স্বাভাবিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রসমূর্তি লাভ করেছে, সত্যেন্দ্রনাথ বা মোহিতলালের কাব্যে তেমনটি বহু স্থলেই হয় নি। এর কারণ বাল্যকাল থেকেই আরবীফারসী ভাবভাবনার সঙ্গে পূর্বসূরীদের চেয়ে নজরুল অনেক বেশী পরিচিত ছিলেন্। কোন কোন স্থলে অবশ্য আরবীফারসী শব্দ ভাষালক্ষ্মীর ভূষণ না হয়ে দূষণ হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

> "উর্‌জ্ য়্যামেন নজ্‌দ হেযাজ্ তাহামা ইরাক্ শাম
> মেসের্ ওমান্ তিহারান 'স্মির' কাহার বিরাট নাম
> পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্‌লাম্!" "[১]

রসসৃষ্টির প্রয়োজনে নজরুল-কাব্যে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার বিরল নয়। রঙ্গব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনাতেই এর ব্যবহার বেশী। তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট।

ক ॥ " 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুষি।"[২]

খ ॥ " এ 'মক্ ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয় নি লয়!"[৩]

গ ॥ "এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই!"[৪]

বাস্তবজীবন থেকে সংগৃহীত নানা আটপৌরে খাঁটি গ্রাম্য ও কথ্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল তৎসম ও তদ্ভব শব্দেরও দুঃসাহসিক প্রয়োগ করেছেন। এতে অনেক স্থলে ভাষায় নূতন ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে। গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য শব্দের প্রয়োগ এত বেশী যে তার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১ ফাতোহা-ই-দোয়াজ দহম্ : বিষের বাঁশী
২ আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা
৩ হিন্দু-মুস্‌লিম যুদ্ধ : ফণি-মনসা
৪ অগ্র-পথিক : জিঞ্জীর

ক ॥ "লুকিয়ে দেখে তা 'চোখ গেল' ব'লে চেঁচায় পাপিয়া **ছুঁড়ি** !"[১]

খ ॥ "আরাম করিয়া **ভুঁড়োরা** ঘুমায় ?"[২]

গ ॥ "হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত-**নেড়ে**।'"[৩]

ঘ ॥ "কমল-কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির **ডামাডোল**"[৪]

ঙ ॥ "তেরিয়াঁ হইয়া হাঁকিল মোল্লা—"**ভ্যালা** হ'ল দেখি লেঠা,..."'[৫]

কবিতার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে এতে শব্দের স্থান সম্পর্কে Sandburg লিখেছেন,

"Poetry is the capture of a picture, a song, or a flair, in a deliberate prism of words."[৬]

কবির মানসপ্রকৃতি অনুসারে এই 'prism of words' গঠিত হয়। এর গুণের উপর কবিতার উৎকর্ষ ও স্বরূপ নির্ভর করে। নজরুল দেশী ও বিদেশী, তদ্ভব ও তৎসম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শব্দ চয়ন করে শব্দের যে প্রিজ্‌ম তৈরী করেছেন তাতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুল যৌগিক বা তান-প্রধান ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি-প্রধান ছন্দ ও স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। যৌগিক ছন্দকে পয়ারজাতীয় ছন্দ ও শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দকে ছড়ার ছন্দ, স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ বা লৌকিক ছন্দও বলা হয়। নজরুলের প্রথম দিককার অধিকাংশ কবিতা স্বরবৃত্ত মুক্তক ও মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত। এই দুই ছন্দেই তাঁর উপর রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভূত হলেও তিনি এই দুই ছন্দে যে ওজস্বিতা সৃষ্টি করেছেন তা অভূতপূর্ব। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত নজরুলের সুবিখ্যাত কবিতাবলীর মধ্যে 'ধূমকেতু' (অগ্নিবীণা), 'শাত-ইল্‌-আরব' (অগ্নি-বীণা), 'ফরিয়াদ' (সর্বহারা), 'আমার কৈফিয়ৎ' (সর্বহারা), 'সব্যসাচী' (ফণি-মনসা) প্রভৃতি অনেক কবিতাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব কবিতায় নজরুল যে দীপ্তি, যে শক্তি, যে বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছেন, তা বাংলা

১ চাঁদিনী-রাতে : সিন্ধু-হিন্দোল
২ অগ্র-পথিক : জিঞ্জীর
৩ আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা
৪ মিসেস্ এম্ রহমান্ : জিঞ্জীর
৫ মানুষ-(সাম্যবাদী) : সর্বহারা
৬ Carl Sandburg : Complete Poems : p.319

ভাষায় পূর্বে এমন তীব্রভাবে দেখা যায় নি। সমিল মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত কবিতাবলীর মধ্যে ‘বিদ্রোহী’ (অগ্নি-বীণা) সবচেয়ে স্মরণীয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দে নজরুল যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ‘অভিশাপ’ (দোলন-চাঁপা), ‘চৈতী হাওয়া’ (ছায়ানট), ‘গোপন প্রিয়া’ (সিন্ধু-হিন্দোল) ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত কবিতাই এই ছন্দে লেখা। এইছন্দ-ব্যবহারে নজরুলের স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কবি-মানসের বিচিত্র গঠন থেকে উদ্ভূত। নজরুল এই ছন্দ-ব্যবহারে স্থানে স্থানে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। স্বরবৃত্ত মুক্তক ছন্দে রচিত কবিতানিচয়ের মধ্যে ‘কামাল পাশা’ (অগ্নি-বীণা) সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত।

যৌগিক ছন্দে নজরুলের শক্তি সীমিত। এর কারণ তাঁর মত আবেগ-প্রধান কবির উদ্দামতা যৌগিক ছন্দের কঠিন বন্ধনে বাঁধা পড়তে চাইত না। তাঁর উচ্ছ্বাসময় গতিশীলতা প্রকাশের পক্ষে মাত্রাবৃত্ত এবং তারপরেই স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রধান অবলম্বন হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। ‘দারিদ্র্য’ (সিন্ধু-হিন্দোল), ‘শিখা’ (নতুন চাঁদ) প্রভৃতি কবিতা নজরুলের যৌগিক ছন্দ রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ‘বলাকা’র অনুসরণে নজরুল মুক্তক ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশংসার্হ শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে ‘মুক্ত-পিঞ্জর’ (বিষের বাঁশী), ‘ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)’ (বিষের বাঁশী), ‘অনামিকা’ (সিন্ধু-হিন্দোল) প্রভৃতি কবিতা বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

আরবী ছন্দের অনুসরণে নজরুল বাংলায় কয়েকটি ছন্দের প্রবর্তন করেন। প্রসঙ্গত আরবী মোতাকারিব্ ছন্দে লেখা ‘দোলন চাঁপা’র ‘দোদুল দুল’ কবিতাটির উল্লেখ করা যায়।

> “স্বরূপ তার
> অতুল তুল,
> রাতুল ভুল,
> কোথায় তুল
> দোদুল দুল্
> দোদুল দুল !!”[১]

সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রদর্শিত পথে নজরুল তোটক ইত্যাদি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তোটক ছন্দে লেখা ‘জাগৃহি’ (বিষের বাঁশী) কবিতাটি অনবদ্য। চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত-ছন্দে রচিত ‘শরৎচন্দ্র’ (সন্ধ্যা) কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

১ দোদুল দুল : দোলন-চাঁপা

মিলের ব্যাপারে নজরুলের সফলতাকে উপেক্ষা করা চলে না। অপ্রত্যাশিত মিল দিয়ে চমক সৃষ্টি করা কবিদের সাধারণ লক্ষ্য। নানা প্রকারের মিল বাংলা ছন্দে লক্ষিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলির ছন্দে এরকম মিল দেখা যায় না। আধুনিক ভাষার ধ্বনি-প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ার জন্যে ছন্দে মিল না থাকলে শ্রুতিসুখকরতার অনটন ঘটে। ফারসী শব্দে মিলের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ফারসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মিলের প্রতি নজরুলের প্রবণতা তীব্র হয়েছিল—এ কথা মনে করা যেতে পারে। নজরুল কাব্যে মিলের স্বাভাবিকতা পাঠককে মুগ্ধ করে। দেশীবিদেশী শব্দ ব্যবহার করে নজরুল মিলের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি মনোহর। কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করা যেতে পারে।

ক ॥ "বাদ্‌লা-কালো স্নিগ্ধ আমার কান্ত এলো **রিমঝিমিয়ে**,
বৃষ্টিতে তার বাজ্‌লো নূপুর পায়্‌জোরেরই **শিঞ্জিনী যে**।"[১]

খ ॥ "নলিন্‌ নয়ান্‌ ফুলের বয়ান্‌ মলিন্‌ **এ-দিনে**
রাখতে পারে কোন্‌ সে কাফের্‌ আশেক্‌ **বেদীনে**?"[২]

গ ॥ "কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি **মাল্লা**,
দাঁড়ি মুখে সারি গান—লা শরীক **আল্লাহ্‌**।"[৩]

ঘ ॥ "রণে যায় কাসীম ঐ দু'ঘড়ির **নওশা**,
মেহেদীর রঙ্‌টুকু মুছে গেল **সহসা**!"[৪]

ঙ ॥ "ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ **কাঁথা**!
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি বকিছে প্রলাপ **যা-তা**!"[৫]

চ ॥ "বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার **মত কি**
ঝুর্‌বে তুমি একলা মনে, বনের **কেতকী**?"[৬]

ছ ॥ "ওরে চল্‌ চল্‌ ছল্‌ ছল্‌ কি হবে ফিরায়ে **আঁখি**?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে **চক্রবাকী**!"[৭]

---

১ নিকটে : পুবের হাওয়া
২ মানিনী : পুবের হাওয়া
৩ খেয়াপারের তরণী : অগ্নি-বীণা
৪ মোহর্‌রম : অগ্নি-বীণা
৫ হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ : ফণি-মনসা
৬ গোপন-প্রিয়া : সিন্ধু-হিন্দোল
৭ পথচারী : চক্রবাক

জ ॥ "গাইতে ব'সে কণ্ঠ ছিঁড়ে আস্‌বে যখন কান্না,
বল্‌বে সবাই—"সেই যে পথিক, তার শেখানো গান না ?""[১]

ঝ ॥ "প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী !
এখানে সিংহ থাকে ! অহিংস সব মহাত্মাকে দাও গিয়ে ঐ
হরিনামের হরতকী !"[২]

ঞ ॥ ""…যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেল বাণী কই, কবি ?"
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।"[৩]

ট ॥ "কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি কিছুই দেখি না যে ?"[৪]

সাহিত্যস্রষ্টা শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রয়োগ ক'রে কাব্যদেহকে ভূষিত করেন। এই অলংকার কাব্যদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ইচ্ছামত তার অদলবদল করা চলে না। অলংকার কাব্যদেহের বাহ্যিক সজ্জামাত্র নয়, তা কাব্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী। নজরুলও সার্থক কবির মত তাঁর কাব্যদেহকে অলংকারে ভূষিত করেছেন তাকে শ্রুতিমধুর, রসাপ্লুত ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে।

শব্দালংকারের মধ্যে ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি এবং অনুপ্রাসের ব্যবহার নজরুল-কাব্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ইংরেজীতে ধ্বন্যুক্তিকে Onomatopoeia এবং অনুপ্রাসকে Alliteration বলা চলে। এই সব অলংকার প্রয়োগে অধিকাংশস্থলেই রচনার সৌন্দর্যবিধান ঘটেছে। বলাবাহুল্য শব্দালংকার শব্দের উপর নির্ভরশীল।

ধ্বন্যুক্তির কয়েকটি উদাহরণ সঞ্চয়ন করা যেতে পারে।

ক ॥ "ওরে বেনোজল, ছল্‌ ছল্‌ ছল্‌ ছুটে' চল্‌ ছুটে' চল্‌ !"[৫]

খ ॥ "আমি বয়ে যাই—বয়ে যাই আমি কুলুকুলু কুলুকুলু,"[৬]

গ ॥ "ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর্‌
শুনি কাহার আসার খবর,"[৭]

১ অভিশাপ : দোলন চাঁপা
২ চিরবিদ্রোহী : শেষ সওগাত
৩ আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা
৪ শারক-বেঁধা পাখী : ছায়ানট
৫ পথচারী : চক্রবাক
৬ ঐ
৭ বাঙলায়-মহাত্মা : ফণি-মনসা

ঘ ॥ "অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু।"[১]

ঙ ॥ "আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল্-দোল্!"[২]

অনুপ্রাসের কয়েকটি ব্যবহার উদ্ধৃত করা যাক।

ক ॥ "নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে।"[৩]

খ ॥ "জরিদার নাগ্‌রা পায়ে গাগ্‌রা কাঁখে ঘাগ্‌রা ঘিরা
বেহুইন-বৌরা নাচে মৌ-টুস্‌কির মৌমাছিরা।"[৪]

গ ॥ "ঘুম জড়ালো ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়!"[৫]

ঘ ॥ "যন্ত্রী যেথানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,"[৬]

ঙ ॥ "কাজল ছিল গো জল ছিল না ও উজল আঁখির তীরে।"[৭]

চ ॥ "তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।"[৮]

অর্থালংকারের মধ্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে নজরুলকাব্যে প্রযুক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগে উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই সব অলংকারের মধ্যে কবির কল্পনা ও চেতনা ঘনীভূত হয়। অনেক সময় একসঙ্গে একাধিক অলংকার জড়িয়ে থাকতে পারে; যেখানে যেটি প্রধান, সেখানে সেটিরই উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত। কয়েকটি অর্থালংকার নজরুল-কাব্য থেকে এখানে চয়ন ক'রে দেওয়া গেল। আশাকরি কৌতূহলী রসিক পাঠক শুধু এদের আস্বাদনেই তৃপ্ত না থেকে নিজেই আরও অলংকার-সংগ্রহে তৎপর হবেন। এই ধরনের অনেক অলংকারই নজরুল-কাব্যে ছড়িয়ে আছে।

১ ইন্দ্রপতন : চিত্তনামা
২ বিদ্রোহী : অগ্নি-বীণা
৩ পিছু-ডাক : দোলন-চাঁপা
৪ প্রথম সর্গ : মরুভাস্কর
৫ চৈতী হাওয়া : ছায়ানট
৬ দ্বীপান্তরের বন্দিনী : ফণি-মনসা
৭ ভীরু : ঝিঙ্গের
৮ সর্বহারা : সর্বহারা

ক ॥ "উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মতন প'ড়ে—"[১]

খ ॥ "বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন।"[২]

গ ॥ "জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠ জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি,"[৩]

ঘ ॥ "বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম।"[৪]

ঙ ॥ "ময়ূরের মত কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া—"[৫]

চ ॥ "—কোন গ্রহ হ'তে ছিঁড়ি'
উল্কার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি।"[৬]

উৎপ্রেক্ষা

ক ॥ "ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।"[৭]

খ ॥ "জোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্‌চিল।"[৮]

গ ॥ "বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত।"[৯]

---

১ ওঠ রে চাষী : নতুন চাঁদ
২ সিন্ধু (তৃতীয় তরঙ্গ) : সিন্ধু-হিন্দোল
৩ ভীরু : ঝিঙেফুল
৪ দারিদ্র্য : সিন্ধু-হিন্দোল
৫ ফরিয়াদ : সর্বহারা
৬ পথচারী : চক্রবাক
৭ দারিদ্র্য : সিন্ধু-হিন্দোল
৮ চৈতী হাওয়া : ছায়ানট
৯ সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ) : সিন্ধু হিন্দোল

ঘ ॥ "উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব!"[১]

রূপক

ক ॥ "মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি"[২]

খ ॥ "চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফ্‌রি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।"[৩]

গ ॥ "কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খু'লে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে উঠে কুতূহলে।"[৪]

ঘ ॥ "কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।"[৫]

ঙ ॥ "সেথা হর্দম খুশির মৌজ্‌
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ্‌,"[৬]

চ ॥ "—মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!"[৭]

ছ ॥ "—সারে সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!"[৮]

সমাসোক্তি

ক ॥ "লাল হয়েছে দিগন্ত আজ চাষার রক্ত শুষি'!"[৯]

১ সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ): সিন্ধু-হিন্দোল
২ নিরুদ্দেশের যাত্রী: পূবের হাওয়া
৩ আর কতদিন: নতুন চাঁদ
৪ ঐ
৫ চাঁদিনী-রাতে: সিন্ধু-হিন্দোল
৬ আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়: জিঞ্জীর
৭ গানের আড়াল: চক্রবাক
৮ সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ): সিন্ধু-হিন্দোল
৯ ওঠ রে চাষী: নতুন চাঁদ

খ ॥ "দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
তুলিয়ে তরু-কর।"[১]

গ ॥ "কূলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে,
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে!"[২]

ঘ ॥ "সাগর ঊর্মি-মঞ্জীর পায়ে ধরা নেচে নেচে চলে।"[৩]

ঙ ॥ "মেঘের ছিন্ন কাঁথায় শুয়ে যে আজিকে ঈদের চাঁদ
স্বপ্ন হেরিছে লক্ষ টাকার, আমামা পাগ্‌ড়ী বাঁধ্‌!"[৪]

চ ॥ "বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে;"[৫]

ছ ॥ "হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গা রৌদ্র পোহায় শীত!"[৬]

বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চিত্রকল্প রচিত হয়। চিত্রকল্প শব্দে-গড়া ছবি বইত অন্য কিছু নয়। চিত্রকল্পে কবিমানসের বিশেষ প্রবণতা ধরা পড়ে। প্রত্যেক চিত্রকল্প কবির কল্পনার রঙে রঙিন ও তাঁর চেতনার জ্যোতিতে ভাস্বর। হার্বার্ট রীড স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন, "......word-music, image and metaphor are the blood-stream of poetry,..."[৭] নজরুল-কাব্যে অনেক আশ্চর্যসুন্দর চিত্রকল্প দেখা যায়। চিত্রকল্পসৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় বলে কাব্যোৎকর্ষ বিচারে তার পরিচয় আবশ্যক। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উজ্জ্বল চিত্রকল্প নজরুল-কাব্য থেকে সংকলিত হল।

ক ॥ "সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
শেহেলী 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি মশারি টানি।
দিক-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারি—ওকি বর্ডার তারি?"[৮]

১ সর্বহারা : সর্বহারা
২ শীতের সিন্ধু : চক্রবাক
৩ প্রথম সর্গের অবতরণিকা : মরু-ভাস্কর
৪ কাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ : সর্বহারা
৫ ইন্দ্রপতন : চিত্তনামা
৬ অঘ্রাণের সওগাত : জিঞ্জীর
৭ Herbert Read : Form in Modern Poetry, Third Impression : London 1957 : p. 65
৮ চাঁদিনী-রাতে : সিন্ধু-হিন্দোল

খ ॥ "মরু-নটী তার সোনার ঘুমুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি'
হলুদ খেজুর-কাঁদিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি।"[১]

গ ॥ "ঘূর্ণি-বাঁদীরা 'নীল' দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি'
ছিটাইছে বারি, মেঘ হ'তে মাগি' আনিছে বরফ-পানি।"[২]

ঘ ॥ "অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি'
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি'!"[৩]

ঙ ॥ "চাঁদ নয়, ও যে কমলালেবুর কোয়া তৃষিতের তরে
একটি নিমেষ, তবুও রসনা উঠিবে তো রসে ভ'রে।"[৪]

চ ॥ "সূর্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন।"[৫]

ছ ॥ "তোমার আদরে মুকুলিতা হয়ে উঠিল যে বল্লরী
তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি।"[৬]

জ ॥ "নিটোল আকাশ টোল খেয়ে যাক
হাজার পাখীর গানের দোলে,"[৭]

১ চিরঞ্জীব জগ্‌লুল : জিঃ
২ ঐ
৩ চিরজনমের প্রিয়া : নতুন চাঁদ
৪ জাকাত লইতে এসেছে ডাকাত্‌ চাঁদ : সর্বহারা
৫ চিরঞ্জীব জগ্‌লুল : জিঞ্জীর
৬ বর্ষা-বিদায় : চক্রবাক
৭ রঙিন খাতা : প্রলয়-শিখা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুসাহিত্যে নজরুল

গত প্রায় দেড়শ বছর ধরে বাংলা দেশে বালক-বালিকাদের জন্যে ছাপার অক্ষরে সাহিত্য প্রকাশিত হ'য়ে আসছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক সর্বপ্রথম এই জাতীয় সাহিত্য সীমাবদ্ধ অর্থে 'শিশুসাহিত্য' নামে চিহ্নিত হয়। তিনি ছেলে-ভুলানো ও ঘুমপাড়ানো ছড়াগুলিকেই 'ছড়া-সাহিত্য' বা 'শিশু-সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছিলেন। এখন ব্যাপক অর্থে 'শিশু-সাহিত্য' বলতে ১১ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্যে রচিত যে কোন সাহিত্যপদবাচ্য রচনাকেই বোঝায়। বয়সের যে মাপকাঠির কথা বলা হল তা বালকবালিকাদের গড়পড়তা মানসিক উৎকর্ষ-বিচারের উপর সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে অনেকে কিশোরকিশোরীদের (১১ থেকে ১৫ বৎসর বয়স-বিশিষ্ট) জন্যে রচিত রচনাকেও শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত। বাংলাসাহিত্যে শিশুসাহিত্য-বিভাগ নজরুলের পূর্বে যাঁদের অসামান্য দানে ধন্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রযুগের পূর্বে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীষীদের রচনা ছিল নীতি ও উপদেশ-মূলক এবং পাঠ্যপুস্তকোপযোগী। অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' [প্রথম ভাগ, ৪ শ্রাবণ ১৭৭৫ শক (১৮৫৩), ২য় ভাগ, শ্রাবণ ১৭৭৬ শক (১৮৫৪) ও ৩য় ভাগ, ২২ আষাঢ় ১৭৮১ শক (১৮৫৯)], বিদ্যাসাগরের 'শিশুশিক্ষা' চতুর্থভাগ বা 'বোধোদয়' (এপ্রিল ১৮৫১) ও 'কথামালা' (ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬), মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' (১ম-২য় ভাগ ১৮৪৯, ৩য় ভাগ ১৮৫০) প্রভৃতি গ্রন্থ শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণের জন্যে বিশেষভাবে রচিত। 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগ কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সভাপতি বীটন সাহেবকে উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গ-পত্রে মদনমোহন তো স্পষ্টভাবেই লিখেছেন,

"অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশায় যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।"

এই সব পুস্তক পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণের জন্যে কতকটা উদ্দেশ্যমূলক ধরাবাঁধা নিয়মে প্রণীত হলেও এদের রচনা যে কিছু পরিমাণে সাহিত্যসৌন্দর্য-সমন্বিত ছিল, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে শিশুসাহিত্য-রচনায় বিশেষ-ভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগের লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' (১৯০৩), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২), 'খাপছাড়া' (১৯৩৬), 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭)প্রভৃতি পুস্তক শিশুসাহিত্যে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। অবনীন্দ্র-নাথ তাঁর তুলির লেখনে 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৫), 'ভূতপত্‌রীর দেশ' (১৯১৫), 'খাজাঞ্চির খাতা' (১৯১৬) প্রভৃতি রচনা ক'রে শিশুসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার-সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' (১৯১০), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) ও ঠাকুর-দাদার ঝুলি' (১৯১০), সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর 'শিশুকবিতা' (১৯২২ সালে কবির মৃত্যুর পরে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত), সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' (১৯২৩) প্রভৃতি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাসাহিত্যে শিশুবিভাগের রচনাগুলি ভালভাবে বিচার করলে ভাবের দিক দিয়ে দুটি মুখ্যশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। এক, শিশুদের সাহস, উদারতা, ত্যাগ ইত্যাদি মহৎগুণ সম্পর্কে প্রেরণা ও শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত বাস্তববোধসম্পন্ন রচনা। দুই, শিশুদের আনন্দদানের অভিপ্রায়ে প্রণীত কল্পনাপ্রধান লেখা। প্রথমশ্রেণীর রচনা উনবিংশ শতাব্দীতে বেশী করে সৃষ্টি করার রেওয়াজ ছিল। রবীন্দ্রযুগে দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার উপর জোর পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়শ্রেণীর রচনাসৃষ্টিই দুরূহতর কাজ। এখানে শিশুমনের জন্যে আনন্দসৃষ্টিই মুখ্য, কোন সৎগুণ সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া গৌণ। দ্বিতীয়শ্রেণীর রচনাকার হ'তে হ'লে যথার্থ শিশুমনের খবর জানতে হবে। আর শিশুমনের সংবাদ জানা বয়স্কের পক্ষে অতিশয় জটিল কাজ

সন্দেহ নেই। শিশুমনের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মবোধ না জন্মালে, শিশুভাবে ভাবিত না হলে প্রকৃত শিশুসাহিত্যরচনা অসম্ভব। শিশুর মন খেয়ালী ও কল্পনাপ্রবণ। তাই শিশুসাহিত্য অবাধ কল্পনার রঙেরেখায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অবগুণ্ঠনাবীরূপে। শিশুসাহিত্যে যে শিশু দেখা যায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবিক শিশু নয়, সাহিত্যিকের মন-গড়া শিশু। তাই প্রকৃত শিশু-সাহিত্য রচনার প্রশ্নটি এখনো বাংলা সাহিত্যে সমাধান লাভ করে নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিশুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তব শিশুর কাছাকাছি গেলেও তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে অপারগ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শিশুর মধ্যে অনুভব করেছেন ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-রহস্য। অনেক সময় তাঁর শিশু মহাকালেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর আত্মবিস্মৃত, নির্লোভ, খেয়ালী ও নিরাসক্ত জীবনের মধ্যে কবি নিজের বস্তুগ্রাসমুক্ত সত্তাকে আস্বাদন করতে উৎসুক। 'যাত্রী' গ্রন্থের একজায়গায় কবি লিখেছেন,

"ঐ শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসলুম। সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিতান্ত নিজের গরজে। আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে।............প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু-লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম—মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

'শিশু ভোলানাথে'র বহুপূর্বে রচিত 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই একটি বিশেষ পরিবেশে রচিত। কবিপত্নীর পরলোক গমনের পর দশবছরের কন্যা মীরা ও আট বছরের শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবির বাৎসল্য এক নূতন গভীরতা ও দীপ্তি লাভ করে। এর পর শমীন্দ্রনাথ রোগাক্রান্ত হ'য়ে অন্তিমশয্যায় শয়ন করলে কবি পুত্রের আনন্দবিধানের জন্যে কবিতা রচনা করে শোনাতেন। এইভাবে 'শিশু'গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার জন্ম। তাই অনিবার্যভাবে এই সব কবিতার কোন কোন জায়গায় দার্শনিক-চিন্তা ও জীবনরহস্য জড়িত হয়ে আছে।

'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ও অন্যান্য শিশুগ্রন্থের অনেক স্থলেই জীবন-রহস্য, দার্শনিকজিজ্ঞাসা ও স্বর্গীয় অনুভূতিজাল দুরূহ অপরূপতার সৃষ্টি করেছে। তবে কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে শিশু-মনের সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'শিশু' গ্রন্থের 'বীরপুরুষ' ও 'শিশু ভোলানাথ'-এর 'মনে পড়া', 'খেলাভোলা', 'ইচ্ছামতী' ইত্যাদি অনেক কবিতারই নাম করা যায়।

পূর্বেই বলেছি—শিশুমন অতিমাত্রায় খেয়ালী, স্বপ্নময় ও কল্পনাপ্রবণ। তাই রূপকথার রাজ্যে তার অবাধ সঞ্চারণ। সে অদ্ভুত ও রহস্য-রসের রসিক। আবোল-তাবোল চিন্তায়, বাস্তবতার বৈপরীত্যজনিত কাল্পনিক ভাবনায় ও প্রকৃতির রহস্যরঙের বিষয়বস্তুতে তার অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল। সেইজন্যে এইসব রচনায় তার আনন্দের পরিমাণও বেশী। সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই ধরনের রচনায় শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নজরুলের শিশুসাহিত্যরচনায় যাঁদের প্রভাব অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন ও সুকুমার রায়ের নামই উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিশুসাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ স্বল্পই। 'ঝিঙেফুল' ও 'সাতভাই চম্পা' কাব্যগ্রন্থ, 'পুতুলের বিয়ে' নামক নাটক ও কবিতার সংকলন, 'শেষ সওগাত' ও 'সঞ্চয়নে'র অন্তর্গত কতকগুলি রচনা এবং কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী নিয়েই নজরুলের শিশুসাহিত্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে 'সাতভাই চম্পা' বইটি আমার চোখে পড়ে নি। অবশ্য অনেকে এ বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থে উক্ত নামের একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। তবে সেটিতে সকল ভাইয়ের কথা নেই। কবিতাটির বিষয়ে শামসুন নাহার মাহমুদ তাঁর 'শিশুসাহিত্যে নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন, "...নজরুল 'সাতভাই চম্পা'র কবিতা তাঁর ত্রিশ বছর আগেকার চট্টগ্রাম সফরের সময় আমাদের বাড়িতে বসে লেখেন।......সেখানে এত হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তাঁর দিনগুলো কেটেছিল যে, চম্পা ভাইদের সকলের কথা বলে শেষ করা আর হয়ে ওঠে নি তাঁর।"[১]

শিশুদের জন্যে পূর্বোল্লিখিত দুই শ্রেণীর রচনাই নজরুল-সাহিত্যে দেখা যায়।

১ নজরুল-পরিচিতি : পৃ ৫৪

শিশুসাহিত্য-রচনায় নজরুলের অসাধারণ সাফল্য অবশ্যস্বীকার্য। এর প্রধান কারণ—নজরুলের কবিমানসের একদিকে একটি শৈশবলোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের শিশুসুলভ খামখেয়ালীপনা, ভাবালুতা, বাধাবন্ধনহীনতা ও হাস্যপরিহাসের লঘুতা তাঁর শিশুমনেরই অভ্রান্ত অভিব্যক্তি। এই শিশুমনের জন্যে নজরুল বড়দের রচনার অনেক জায়গাতেই ভারসাম্যহীনতা, অসংযম, উচ্ছ্বাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই সবস্থানে তাঁর সাহিত্যের রস-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই শিশুমনের অবস্থানের জন্যেই নজরুল সত্যকার শিশুভাবে ভাবিত হয়ে সার্থক শিশুসাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন। পরিমাণে স্বল্প হলেও উৎকর্ষের বিচারে নজরুলের শিশুসাহিত্য বাংলাসাহিত্যের দুর্লভ সম্পদ। আমার মনে হয়—শিশুসাহিত্যের কোন কোন জায়গায় নজরুল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শিশুশিক্ষামূলক কবিতায় নজরুল কখনো শিশুকে তার কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কখনো তাকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন, আবার কখনো তাকে মহৎকর্ম ও জ্ঞানের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। 'ঝিঙে ফুলে'র 'প্রভাতী' কবিতায় প্রভাতের বর্ণনাটি কী সুন্দর, কী মনোমুগ্ধকর! উপলমুখর ঝর্নাধারার মত কবিতাটির অবারিত গতি।

"ভোর হোলো
দোর খোলো
      খুকুমণি ওঠ রে!
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
      ফুল-খুকী ছোট রে!
      খুকুমণি ওঠ রে!
রবি মামা
দেয় হামা
      গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান
গায় গান
      শোনো ঐ, 'রামা হৈ!'"

খুকু জেগে উঠলে কবি তাকে প্রাভাতিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

"নাই রাত

মুখ হাত

ধোও, খুকু জাগো রে!

জয়গানে

ভগবানে

তুষি' বর মাগো রে!"

কবি শিশুকে আত্মশক্তিতে সচেতন হতে বলেছেন,

"তুমিই সর্বশক্তি লভিয়া পূর্ণ হইতে পারো,

"আমি ছোট" এই ভাবো নিশিদিন, তাই সব কাজে হারো।

দারোগা কেরানী হবার ক্ষুদ্র সাধনা তোমার নহে,

তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান্ কহে।

বল ভগবানে, তুমি হতে চাও সর্ব-শক্তিমান্,

তুমি অনন্ত যশ খ্যাতি চাহ, চাহ অনন্ত প্রাণ।"[১]

'অমৃতের সন্তান' কবিতাতেও এই একই সুর।

"কে বলে তোমরা বালকবালিকা? তোমরা উর্ধ্ব হ'তে

নামিয়া এসেছ শুদ্ধ শক্তি দিব্য জ্যোতি স্রোতে।

হৃদয়-কমণ্ডলু হ'তে তব অমৃতধারা ছিটাও,

ঈর্ষা-ক্লান্ত জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি দাও।"[২]

কবি তাকে ডাক দিয়েছেন মহৎ মুক্ত ও উদার জীবনের সাধনায়।

"ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো,

তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।

তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি মহৎ ও মহীয়ান্

জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট্, অমৃতের সন্তান।"[৩]

শিশুশিক্ষামূলক কবিতা রচনার চাইতে শিশুদের আনন্দবিধানবিষয়ক সাহিত্যসৃষ্টিতে নজরুল-প্রতিভার স্ফূর্তি হয়েছে বেশী।

'ঝিঙেফুলে'র বর্ণনা ও ছন্দঝঙ্কার সত্যেন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দিলেও

১ মায়া মুকুর: সঞ্চয়ন

২ অমৃতের সন্তান: শেষ সওগাত

৩ মায়া-মুকুর: সঞ্চয়ন

এটি একটি নিটোল মিষ্টি কবিতা। কবিতাটি 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা।

"ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল—
ঝিঙে ফুল।
গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল—
ঝিঙে ফুল॥"

'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা ছাড়াও অপর তেরটি কবিতার প্রত্যেকটিই অনবদ্য।

'খুকু ও কাঠবেরালী' কবিতায় কাঠবেরালীর উদ্দেশে নিবেদিত খুকুর উক্তির মধ্যে শিশুহৃদয়ের কল্পনাবিলাস এবং জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কে তার অসীম কৌতূহল ও আত্মীয়তাবোধ প্রকাশিত। কবিতার ভাষা ও ছন্দ শিশুসুলভ চাপল্যে ভরা।

"কাঠ্‌বেরালি! কাঠ্‌বেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবিনেবু? লাউ?
বেরাল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?—
... ...
কাঠ্‌বেরালি! তুমি আমার ছোড়দি' হবে? বৌদি হবে? হুঁ
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঃ!"

মামার বিয়েতে খোকার উল্লাসের আর সীমা নেই। বিয়ের মজাতে শিশুমন স্বাভাবিকভাবেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাই শিশু চায় রোজ বিয়ে ক'রে এই মজা উপভোগ করতে।

"কি যে ছাই ধানাই পানাই—
সারাদিন বাজ্‌ছে শানাই,
এদিকে কারুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে!
বিবাহ! বাস্, কি মজা!

সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাও না সোজা
দেয়ালে ঠেসান্ দিয়ে॥

... ...

মামীমা আস্‌লে এ ঘর
মোদেরও কর্‌বে আদর?
বাস্, কি মজার খবর!
আমি রোজ কর্‌ব বিয়ে॥"[১]

দাদুর সঙ্গে খোকাখুকুর সম্পর্ক যেমন মধুর তেমনি সহজ ও গভীর; কেননা, বার্ধক্য তো দ্বিতীয় শৈশবই। 'খাঁদু-দাদু'তে দাদুর নাক সম্পর্কে শিশুর গবেষণা কৌতুককর।

"আ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা—নাক্ ডেঙাডেং ড্যাং!"[২]

মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতম। মায়ের স্নেহের চাইতে বড় শিশুর কাছে আর কি হতে পারে? সুতরাং মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রকাশ করা শিশুর অন্যতম স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। 'মা' কবিতায় মাকে ঘিরেই শিশুমনের নিবিড়তম প্রকাশ ঘটেছে। 'মা' কবিতাটি ১৩২৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রচার লাভ করে।

"যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।

ছিনু খোকা এতটুক্,
একটুতে ছোট বুক
যখন ভাঙিয়া যেতো, মা-ই সে তখন

১ খোকার খুশী: ঝিঙে ফুল
২ খাঁদু-দাদু: ঝিঙে ফুল

বুকে ক'রে নিশিদিন
আরাম-বিরাম-হীন
দোলা দিয়ে শুধাতেন, "কি হলো খোকন ?"

আয় তবে ভাইবোন্,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান, পদধূলি শিরে লয়ে মা'র,
মা'র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই !
নতি করি' বল্ সবে "মা আমার ! মা আমার !" "

'খোকার বুদ্ধি' কবিতায় নজরুল শিশুমনের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন ক'রে রঙ্গরসের পরিবেষণে তার আনন্দ-বিধানের আয়োজন করেছেন। কবিতাটি ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় পত্রস্থ হয়।

"চুন ক'রে মুখ প্রাচীর 'পরে বসে শ্রীযুত খোকা,
কেননা তার মা বলেছেন সে এক নীরেট বোকা।
ডাংপিটে সে খোকা এখন মস্ত একটা বীর,
হুংকারে তাঁর হাঁস-মুর্গীর ছানার্ চক্ষুস্থির !"

শিশুর কাছে কবিদার 'চিঠি' একটি অপূর্ব কবিতা। এই কবিতার ছন্দ— এই পথটা কাট্‌বো পাথর ফেলে মার্‌বো। কবিতাটি ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় আত্মপ্রকাশ করে।

"মা মাসীমা'য় পেন্নাম
এখান হতেই করলাম,
স্নেহাশিস্ এক বস্তা,
পাঠাই, তোরা লস্ তা
সাঙ্গ পত্ত সবিটা,
ইতি। তোদের কবিদা !"

'খোকার গপ্‌প বলা' কবিতায় শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার রূপকথা প্রকাশিত হ'য়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। কবিতাটি ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়।

"একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা,
রাণী গেলেন তুল্‌তে কল্‌মী শাক্‌
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক্‌।
রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘুরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার ক'রে।"

'লিচু-চোর' কবিতাটিতে শিশুমনের উত্তেজনাময় কাজ করবার প্রবৃত্তি ব্যক্ত হয়েছে। ছন্দের গতিঝংকার উপভোগ্য। 'হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন', 'ঠ্যাং-ফুলী' ও 'পিলে-পটকা' কবিতা তিনটিতে শিশুমনের উদ্ভট কল্পনার বর্ণবৈচিত্র্য খুবই মজার বস্তু সন্দেহ নেই।

'হোঁদল-কুঁৎকুঁতে'র বিজ্ঞাপনটি আকর্ষণীয়। অন্ত্যমিলগুলি চমৎকার।

"মিচ্‌কে-মারা কয় না কথা মনটি বড় খুঁৎখুঁতে।
ছিঁচ্‌-কাঁদুনে ভ্যাবিয়ে ওঠেন একটু ছুঁতেই না ছুঁতে॥"[১]

'ঠ্যাং-ফুলী'র বর্ণনাটি ভারী মজার।

"হো-বাবা! ঠ্যাং ফুলো যে!
হাসে জোর ব্যাংগুলো সে
ভ্যাং তুলো তার
ঠ্যাংটি দেখে!
ন্যাং ন্যাং ম্যাগ্‌গোদা ঠ্যাং
আঁৎকে ওঠায় ডান্‌পিটেকে!
এক ঠ্যাং তালপাতা তার
যেন বাঁট হাল্‌কা ছাতার!
আর-পা'টা তার
ভিট্‌রে ডাগর!
যেন বাপ্‌! গোব্‌দা গো-সাপ
পেট-ফুলো হুস্‌ এক অজগর!"

'পিলে-পটকা' কবিতায় শিশুমনের রঙ্গপ্রবণতা সুস্পষ্ট।

"উট্‌মুখো সে সুঁটকো হাশিম
পেট যেন ঠিক ভুট্‌কো কাছিম!

---

[১] হোঁদল-কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন: ঝিঙে ফুল

চুলগুলো সব বাবুই দড়ি—
ঘুস্‌কো জ্বরের কাবুয় পড়ি!"

'সাতভাই চম্পা'তে নজরুল শিশুমনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্তবকে স্তবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতায় শিশুর আবাধ রঙিন কল্পনাকে কবি বহুদূরে প্রসারিত করে দিয়েছেন। সাত ভাইয়ের মধ্যে একটি ভাই হবে সকাল-বেলার পাখী, একটি সিন্ধুপতি, একটি গাঁয়ের রাখাল ছেলে, আর একটি ভাই সওদাগর হয়ে সাগর পাড়ি দেবে, অপর একটি ভাই হবে দিনের সহচর। কবিতাটির পংক্তিতে পংক্তিতে শিশুস্বপ্নের রামধনু-রং ছড়িয়ে আছে। জীবনকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করবার ইচ্ছে থেকেই কবিতাটির উদ্ভব। নজরুল নিপুণ ও সার্থক শিল্পীর মত শিশুমনের নিভৃত রহস্যময় অন্দরমহলে আলোক-সম্পাত করতে সমর্থ হয়েছেন।

'সঞ্চয়নে' কতকগুলি মনোরম শিশুকবিতা সংকলিত হয়েছে। 'ঘুম-পাড়ানী গান'-এ বাংলাদেশে বহুপ্রচলিত লৌকিক গ্রাম্য ছড়ার মেজাজ ও পরিবেশটি সুন্দর ও সার্থকভাবে বিধৃত।

"ঘুম-পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।
ঘুম আয় রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা!
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম।"[১]

এই সংকলনের 'আমি যদি বাবা হতাম বাবা হ'ত খোকা', 'বর প্রার্থনা' ইত্যাদি প্রত্যেকটি শিশুকবিতাতেই যে শিশুমনের আনন্দের খোরাক রয়েছে, এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন।

'জাগো সুন্দর চির-কিশোর' ('সঞ্চয়ন'-এ সংকলিত) ও 'পুতুলের বিয়ে' এই দুটি ছোটদের অভিনয়োপযোগী নাটিকাতে নজরুল শিশুদের জন্যে যথেষ্ট আনন্দ পরিবেষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। 'জাগো সুন্দর চির-কিশোরে'র মধ্যে কল্পনার সঙ্গে কঙ্কন, কামাল, ওঙ্কার, চাকাম ফুসফুস যার আসল নাম স্যাড়া ও বেণু এই পাঁচটি শিশুর কথোপকথন এবং তার পুষ্পকরথে চড়ে তাদের সাগর-গর্ভ ও আকাশে অভিযান যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি মজার।

১ ঘুমপাড়ানী গান: সঞ্চয়ন

নজরুল এখানে সর্ববাধামুক্ত কল্পনার সঙ্গে শিশুমনকে ছুটিয়ে দিয়েছেন। একটি রূপকের রঙিন আবরণে নাটিকাটি মুড়ে দেওয়াতে শিশুকল্পনার বিকাশ হয়েছে বেশী। কঙ্কন কল্পনাকে উদ্দেশ করে যা বলেছে তাই নজরুলের শিশুসাহিত্যের অমৃতইঙ্গিত।

"ওদের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চল না কল্পনা-দি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে আনব অমৃত পৃথিবীতে, জরামৃত্যু থাকবে না—থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।"[১]

১ জাগো সুন্দর চির-কিশোর: সঞ্চয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ

॥ ১ ॥

গদ্য-রচয়িতা হিসেবে নজরুল বাংলাসাহিত্যে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থানের দাবিদার নন। সাহিত্যকর্মের মধ্যে কবিকৃতিই তাঁর প্রধান। তবে তাঁর গদ্যরচনা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। তাঁর গদ্যে বুদ্ধি ও মননশীলতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই বেশী। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটক—গদ্যের এই চারিটি প্রধান বিভাগেই নজরুল লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু কোন বিভাগেই তেমন কোন স্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে এই সকল বিভাগে তাঁর প্রতিভার মোহরাঙ্কন যে একেবারে অনুপস্থিত, এ কথা বলা চলে না। তাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যধারার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ে এই সব গদ্যরচনার আলোচনা অপরিহার্য।

॥ ২ ॥

উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে নজরুল বিশেষ কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন নি।

'বাঁধন-হারা' নজরুলের প্রথম উপন্যাস। এটি ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাস (১৯২০) থেকে 'মোস্‌লেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রথম বের হয়। পুস্তকাকারে এর প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)। গ্রন্থটি সুর-সুন্দর নলিনীকান্ত সরকারকে উৎসৃষ্ট।

'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাস। 'মোসলেম ভারতে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকা (ভাদ্র ১৩২৭) লিখেছিলেন,

"'বাঁধন-হারা' বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস—অবিবাহিত দ্বিপদ; বিবাহিত চতুষ্পদ। 'বাঁধন-হারা'র বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে উজ্জ্বল ও

মোহনীয়। মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তারপর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন-জলতরঙ্গ আছে—উপমাগুলি মনমাতান।"

এই পত্রোপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা। সে বাঁধন-হারা। মিস্ সাহসিকা বোস্, যে এই উপন্যাসের অন্যতম স্ত্রীচরিত্র, সে এই নূরুল হুদার বাঁধন-হারা জীবন সম্পর্কে যা বলেছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"সৃষ্টির আদিম দিনে এরা সেই যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, আর তারা ঘর বাঁধলো না। ঘর দেখলেই এরা বন্ধন-ভীতু চখা হরিণের মতন চ'মকে ওঠে! এদের চপল চাওয়ায় সদাই তাই ধরা প'ড়বার বিজুলি-গতি ভীতি নেচে বেড়াচ্চে! এরা সদাই কান খাড়া ক'রে আছে, কোথায় কোন গহন-পারের বাঁশী যেন এরা শুন্‌ছে আর শুন্‌ছে! যখন সবাই শোনে মিলনের আনন্দরাগ, এরা তখন শোনে বিদায়-বাঁশীর করুণ গুঞ্জরন! এরা ঘরে বারে বারে কাঁদন নিয়ে আসছে আবার বারে বারে বাঁধন কেটে বেরিয়ে যাচ্চে! ঘরের ব্যাকুল বাহু এদের বুকে ধরেও রাখতে পারে না। এরা এমনি করে চিরদিনই ঘর পেয়ে ঘরকে হারাবে আর যত পরকে ঘর ক'রে নেবে! এরা বিশ্ব-মাতার বড় স্নেহের দুলাল, তাঁর বিকেলের মাঠের বাউল-গায়ক চারণ-কবি যে এরা! এদের যাকে আমরা ব্যথা ব'লে ভাবি, হয়তো তা ভুল! এ খ্যাপায় কোনটা যে আনন্দ কোনটা যে ব্যথা তাই যে চেনা দায়। এরা সারা বিশ্বকে ভালবাসছে, কিন্তু হায় তবু ভালবেসে আর তৃপ্ত হচ্চে না! এদের ভালবাসার ক্ষুধা বেড়েই চ'লেছে, তাই এরা অতিসহজেই স্নেহের ডাকে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু স্নেহকে আজও বিশ্বাস করতে পারলো না এরা। তার কারণ ঐ বন্ধন-ভয়।"

সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচী সেনানিবাসে নূরুল হুদার চলে যাওয়ার পূর্বে এই সাহসিকা বোস্ তাকে রাত-দিন "পাগল-ভাই আমার" ও "পথিক ভাই আমার" বলে খেপিয়ে তুলেছিল এবং "দোলা দিয়ে তার জীবন-স্রোতকে আরো চল-চঞ্চল ক'রে তাতে হিন্দোলের উদ্দাম দোল" এনে দিয়েছিল। উপন্যাসের আর একটি স্ত্রী-চরিত্র রাবেয়া তার বাপ-মা-মরা অনাথ ছোটভাই মনুয়রের সঙ্গে নূরুল হুদাকেও আরও একটি ছোট ভাই বলে গ্রহণ করেছিল। তার ননদ সোফিয়ার বান্ধবী মাহবুবার সঙ্গে নূরুলের বিয়ের সব যখন ঠিকঠাক, তখন হঠাৎ সে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে করাচী চলে যায়। নূরুলের এই এড়িয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে নূরুলকে-লেখা চিঠিতে তার বন্ধু মনুয়রের মন্তব্য চয়নীয়।

"তোর এ এড়িয়ে-যাওয়ার দু'রকম মানে হ'তে পারে; প্রথম, হয়ত তাকে ভালোবাসিস নি,—দ্বিতীয়, হয়ত তাকে মন দিয়ে ফেলেছিলি বলেই নিজের এই দুর্বলতা ধরা পড়ার ভয়ে এমন করে ভেসে গেলি। কোনটা সত্য? আমার বোধহয়, দ্বিতীয় ঘটনাটাই ঘটা খুব সম্ভব আর স্বাভাবিক।"

এরপর মাহ্‌বুবার বিয়ে হয় বীরভূম জেলার শোভানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে। সোফিয়াও মনুয়রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বাঁধা পড়ে।

বোগদাদ থেকে সাহসিকাদিকে-লেখা নূরুলের যে চিঠি দিয়ে উপন্যাসের শেষ হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে সে দূরে চলে এসে বুঝতে পেরেছে—শুধু মাহ্‌বুবা নয়, সোফিয়াও তাকে ভালবাসে।

"আচ্ছা সাহসিকা-দি, পুরুষগুলো মেয়েদের চেয়ে একটু চোখে খাট, না? অন্তত, ওদের প্রত্যেকেরই শর্ট-সাইট—কাছের দৃষ্টিটা খারাপ। কাছের জিনিসকে ওরা উপচক্ষু ছাড়া দেখতে পায় না। কিন্তু দূরের জিনিস দিব্যি সাদা চোখে দেখতে পায়। সোফিটাকে দেখেছি—মাহ্‌বুবার চেয়েও কাছে ক'রে, কিন্তু পাতার আড়ালে যে বেদনার কুঁড়ি ধরেছিল তা আমার এই হাজার মাইল চলে আসার আগে আর চোখে পড়ে নি, কিন্তু দূরের এ দৃষ্টিটা হয়ে উঠেছে আমার বরে শাপ।"

এই অনুভব করার পরবর্তী অবস্থা ও ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থার বিষয়ে সে নিজেই উক্ত পত্রে ইঙ্গিত দিয়েছে।

"এক সূর্য আলো দেয়, কিন্তু দুটো সূর্য দগ্ধ করে। আমার মন পুড়ে যাচ্ছে—তাই বিষের ওষুধ বিষ মনে ক'রে এই দগ্ধীভূত মরুভূমিতে এসে পড়েছি। মনে করেছি—এই পোড়া দেশের মরুভূমি দেখে সান্ত্বনা খুঁজব। আমি আজ এই মনের অগ্নিকুণ্ডে আত্মস্থ হয়ে তপস্যা করবার চেষ্টা করছি। প্রার্থনা করো যেন বিফল না হই।"

তার এই চিঠিতেই জানা যায় যে, সোফিয়ার ভীষণ অসুখ, হয়ত বা সে আর বাঁচবে না। আর মাহ্‌বুবা হতভাগী বিধবা হয়েছে। পবিত্র স্থানসমূহ পর্যটনের পথে বোগদাদ শরীফে তার আসার সম্ভাবনা জানতে পেরেও নূরুল আপত্তি করে নি। কেননা, তার মহৎজীবন পাছে বিবাহের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়—এই ভেবে সে নিজেই তাকে মরণের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ তাকে সন্দেহ করলে তার ইহকালে পরকালে কোথাও মুক্তি হবে না। উপন্যাসের শেষচিঠিতে নূরুল হুদা লিখেছে,

"আমার বাঁধন-হারা জীবন-নাট্যের একটা অঙ্ক অভিনীত হয়ে গেল। এর পর কি আছে, তা আমার জীবনের পাগ্‌লা নটরাজই জানেন।

আশীর্বাদ ক'রো তোমরা সকলে, আবার যখন আসব রঙ্গমঞ্চে—তখন যেন আমার চোখের জলে আমার সকল গ্লানি সকল দ্বন্দ্বদ্বিধা কেটে যায়—আমি যেন পরিপূর্ণ শান্তি নিয়ে তোমাদের সকলের চোখে চোখে তাকাতে পারি।"

নূরুলের জীবনে দুঃখই সত্য, সুখ মিথ্যা। দুঃখকে পাবার জন্যেই সে ঘর-ছাড়া। বন্ধু মন্থয়রকে সে একটি পত্রে জানিয়েছে, "যদি দুঃখই না পাওয়া গেল জীবনে, তবে সে জীবন যে বে-নিমক, বিস্বাদ! এই বেদনার আনন্দই আমাকে পাগল ক'রলে, ঘরের বাহির ক'রলে, বন্ধন-মুক্ত রিক্ত ক'রে ছাড়লে, আর আজো সে ছুটেছে আমার পিছু পিছু উল্কার মত উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে। দুঃখও আমায় ছাড়বে না, আমিও তাকে ছাড়বো না।" এই পত্রে সুখ সম্পর্কে তার উক্তি লক্ষণীয়। তার মতে, "মৃগ-তৃষ্ণিকার মত সুখ শুধু দুবতৃষিত মানবাত্মার ভ্রান্তি জন্মায়, কিন্তু সুখ কোথাও নেই—সুখ বলে কোন চীজের অস্তিত্বও নেই, ওটা শুধু মানুষের কল্পনা, অতৃপ্তিকে তৃপ্তি দেবার জন্যে কান্নারত ছেলেকে চাঁদ ধ'রে দেবার মত ফুসলিয়ে রাখা!—আত্মা একটু সজাগ হলেই এ প্রবঞ্চনা সহজেই ধরতে পারে।"

এই দুঃখবাদ ছাড়া নূরুল-চরিত্রেব আর একটি বড় দিক স্রষ্টার প্রাত তার বিদ্রোহ। ভাবীসাহেবাকে (রাবেয়া) সে স্পষ্টই জানিয়েছে,

"... আপনি মাহ্‌বুবার কথা লিখেছেন। সে অনেক কথা। এর সব কথা খুলে' বলবার এখনও সময় আসে নি। তবে এখন এইটুকু বলে রাখছি আপনাকে যে, মানুষকে আঘাত করে হত্যা করেই আমার আনন্দ! আমার এ নিষ্ঠুর পাশবিক দুশমনি মানুষের ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার ওপর!...আমাকে লক্ষ জীবন জাহান্নমে পুড়িয়েও আমায় কবজায় আনবার শক্তি ঐ অনন্ত অসীম শক্তি-ধারীর নেই। তাঁর স্পর্ধা, তাঁর বিশ্বগ্রাস করবার মত ক্ষুদ্র শক্তি আমারও অন্তরে আছে! আমি তাকে ভয় করব কেন?"

এই বিদ্রোহ কি নাস্তিকতার নামান্তর? না। এই বিদ্রোহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে রাবেয়াকে সাহসিকা একটি পত্রে যা লিখেছে তা এই প্রসঙ্গে চয়নযোগ্য।

"...বিদ্রোহটা তো অভিমান আর ক্রোধেরই রূপান্তর। ছেলে যদি রেগে বাপকে বাপ না বলে, বা মাকে মা না বলে, কিংবা বলে যে এরা তার বাপ

মা নয়, তাহলে কি সত্যি-সত্যিই তার পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব মিথ্যা হয়ে যায়? যে ক্ষুব্ধ অভিমান তার বুকে জাগে, তার শেষ হলেই মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে ফের মায়ের কোলেই কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! কিন্তু এই যে অভিমান, এই যে আক্রোশের অস্বীকার, তা দিয়ে হয় কি?—না, সে তার বাপ-মাকে আরো বড় করে চেনে, বড় করে পায়।"

নূরুল হুদার চরিত্রে নিঃসন্দেহে নজরুল-সত্তার ছায়াপাত ঘটেছে। এই কারণে নূরুল-চরিত্রটির ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নূরুলের বোহেমিয়ানিজম্, তার পরার্থপরতা, তার 'নির্বিকার ঔদাস্যের ভাসা-ভাসা করুণকোমল দৃষ্টি আর শিশুর মন', 'অনাড়ম্বর সহজ সরল ব্যবহার', 'গল্পের রহস্যালাপ', 'অনাবিল ঝর্ণাধারার মত উদ্দাম হাসি' ইত্যাদি নজরুলের ব্যক্তিচরিত্রকে ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দেয়। এই জন্যেই এই পত্রোপন্যাস প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধন-হারা বিশেষণটি নজরুলের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত নূরুল হুদার চরিত্রের দুঃখবাদ, বিদ্রোহ ও বন্ধনহীনতার মধ্যে নজরুল-কাব্যের কয়েকটি মূলসূত্র নিহিত। নজরুলের উপর শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র বোহেমিয়া-নিজমের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

নূরুলের 'জীবনের পাগলা নটরাজে'র সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয় শিবের সমধর্মিতা সুস্পষ্ট। নূরুলের বিদ্রোহ, বিশেষ ক'রে তার দুঃখবাদ যতীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

> "সুখের দেবতা মরে যুগে যুগে, তুমি চির-দুখময়,
> সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
> বিরাট বক্ষে চিরনিরুপায় বিশ্বের ব্যথা বহি',
> মাঝে মাঝে বুঝি ববম্ ববম্ জেগে ওঠে বিদ্রোহী!"[১]

নজরুলের দুঃখবাদ ও বিদ্রোহের কবিতাগুলি পাঠ করবার ভূমিকাস্বরূপ নূরুলের চরিত্রটি বিশেষ মূল্যবান। জীবন ও প্রেমের ক্ষেত্রে দুঃখের রূপই যে তাঁকে আকর্ষণ করত, তার নিদর্শন তাঁর কাব্যের বহুস্থলেই উপস্থিত। বিদ্রোহী কবিকে যে বিজয়িনী (বিজয়িনী : ছায়ানট) জয় করলে, তার মূর্তিও অশ্রু-কোমল। আবার কবির বিদ্রোহ যে নাস্তিকতা না হয়ে অভিমান ও ক্রোধের রূপান্তরজনিত এক বৃহত্তর আস্তিকতা তারও স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' (অগ্নি-বীণা) কবিতায়।

---

১ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : মরুশিখা

নজরুল-কবি-মানসের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে নূরুল-চরিত্রের কতকটা সার্থকতা থাকলেও 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের নায়কচরিত্র হিসেবে এটি রসোত্তীর্ণ নয়। নূরুল-চরিত্রের কোন বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ নেই। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মুখর ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে এই চরিত্র কোন বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় নি। উপন্যাসের প্রথমে বাঁধন-হারা নূরুলের যে পরিচয়, উপন্যাসের শেষেও তার কোন রূপান্তর নেই। উপন্যাসের আখ্যানভাগ বা প্লটটি শিথিল ও সংহতিহীন। নায়কচরিত্রের ক্রমবিকাশের প্রয়োজনানুসারে বাইরেকার ঘটনাস্রোত যথার্থভাবে সন্নিবিষ্ট হয় নি। এতে উপন্যাসের গুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কারণ, হাডসনের মতে—

"Incident is···rooted in character, and is to be explained in terms of it."[১]

নায়কচরিত্রে বাস্তব-মুখিতার অভাব পীড়াদায়ক। শুধু মাত্র সাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও ব্যক্তিসত্তার একটি দুর্লক্ষ্য ছায়াভাস নায়কচরিত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় গৌরবান্বিত।

এই পত্রোপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র চারটি—মাহ্‌বুবা, সোফিয়া, রাবেয়া ও সাহসিকা। সবদিক বিবেচনা করলে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র মাহ্‌বুবা, কেননা মাহ্‌বুবাকে কেন্দ্র করেই অন্য নারী চরিত্রগুলি অনেক পরিমাণে বিবর্তিত। মাহ্‌বুবাই নূরুলকে ভালবেসে 'নিজের হাতে মরণের মুখে' যুদ্ধে পাঠিয়েছে আর তাই এই পত্রোপন্যাসের মূলসূত্র। মাহ্‌বুবার প্রেম রহস্যময়। তার প্রসঙ্গে সাহসিকার অভিমত দুরূহ।

"সে (মাহ্‌বুবা) সহজিয়া। সে সহজেই এই ক্ষ্যাপাটাকে ভালবেসেছিল, আর এমনি সহজ হ'য়েই সে তাকে চিরজনম বাসবে। তার বুকে যদি কখনো যৌবনের জলতরঙ্গ ওঠে তবে সে খুব ক্ষণস্থায়ী। এই সহজ আনন্দে তার সমস্ত কিছু দিতে পেরেছে ব'লেই তো মাহ্‌বুবা আজ ছোট্ট মেয়ে হয়েও নিখিল সন্ন্যাসিনীর চেয়েও বড়। তাই সে বৈরাগিনীও হ'ল না, সন্ন্যাসিনীও হ'ল না ; ক্রুদ্ধা জননী যখন তাকে এক বুড়ো বরের হাতে স'পে দিল, তখনো সে সহজেই তাতে সম্মতি দিল। এই সহজিয়ার কিন্তু এতে কোন দুঃখই নেই, সে যে জানে, যে, তার যা দেবার তা অনেক আগেই যে নিবেদিত হ'য়ে

১ William Henry Hudson : An Introduction to the Study of Literature, Second Edition Reprinted ; London 1958 : p. 153

গিয়েছে। অর্ঘ্য নিবেদিত হ'য়ে যাওয়ার পর শূন্য সাজি বা থালাটা যে ইচ্ছে নিয়ে যাক, তাতে তার আসে যায় না।"

প্রেমের এই সহজিয়াতত্ত্ব অসাধ্য বলেই মনে হয়। সাহসিকাকে শোভান থেকে মাহবুবা যে পত্র লিখেছে তাতে তার বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনার কথাই প্রকাশিত। স্বামী সম্পর্কে তার উক্তিগুলি থেকে মনে হয়—তার অভিশপ্ত জীবনকে সে কিছুতেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। বস্তুত মনটা দেহ থেকে আলাদা করে নেওয়া অসম্ভব, কেননা এই মনেরই বাস্তবমূর্তি দেহ। মন একজনকে দিয়ে দেহ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়া প্রেমের ক্ষেত্রে অবাস্তব; কারণ, মনের আস্বাদন হয় দেহের ভিতর দিয়েই।

নূরুলের পত্রে যেমন সৈনিকজীবনের কিছু কৌতূহলোদ্দীপক খবর পাওয়া যায়, তেমনি রাবেয়া, সোফিয়া, মাহবুবা ইত্যাদির পত্রাবলীতে মুসলিম সমাজের একটি ঘরোয়া পরিবেশের খুঁটিনাটি উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে। কিন্তু এইসব নানা অবান্তর বিষয়ের ভিড় থাকায় উপন্যাসের যোগসূত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া কঠিন; ভাষার কাব্যধর্মিতা ও উচ্ছ্বাসাধিক্য উপন্যাসের ভারসাম্য ও মূল সুরকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্যতাদোষযুক্ত। পূর্বেই বলেছি, গঠনকৌশলের দিক দিয়ে আখ্যানভাগের ঐক্যহীনতা এই উপন্যাসের প্রধান দোষ। কোন চরিত্রেই কোন উল্লেখযোগ্য ঘাতপ্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই।

এই উপন্যাসের কোন কোন জায়গায় কাব্যধর্মী প্রকৃতিবর্ণনা বিশেষ উপভোগ্য। উদাহরণস্বরূপ করাচী সমুদ্রতীরের বর্ণনাটি আহরণ করা যাক।

"কা'ল সমস্ত রাত্রি ধ'রে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মত ভিজে চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার যোগাড় ক'রেছিল, তা' তার এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানী রং-এর ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবী-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাহনিতে চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজু চুলগুলি বেয়ে এখনো দু-এক ফোঁটা ক'রে জল ঝ'রে প'ড়ছে, আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁয়ায় সেগুলি সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মত ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠছে!"

'বাঁধন-হারা'র মধ্যে লেখকের রঙ্গরসিকতার স্পর্শ স্থলবিশেষে মন্দ লাগে না। অবশ্য এই রসিকতা অনেক জায়গায় গ্রাম্যতাদুষ্ট ও স্থূল। মার্জিত রসিকতার উদাহরণ হিসেবে বিবাহতত্ত্বটির উল্লেখ করা অসংগত নয়।

"মানুষ যতদিন বিয়ে না করে, ততদিন তার থাকে দুটো পা। সে তখন স্বচ্ছন্দে যে কোন দ্বিপদ প্রাণীর মত হেঁটে বেড়াতে পারে, মুক্তআকাশের মুক্তপাখীর মত স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতেও পারে;—কিন্তু যেই সে বিয়ে করলে, অমনি হয়ে গেল তার দু-জোড়া বা একগণ্ডা পা। কাজেই সে তখন হয়ে গেল একটি চতুষ্পদ জন্তু। বেচারার তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার ক্ষমতা ত গেলই (কারণ চার-চারটে পা নিয়ে ত কোন জন্তুকে উড়তে দেখলাম না!) অধিকন্তু সে হয়ে পড়ল একটা স্থাবর-জমি-জমারই মত। একেবারে মাটির সঙ্গে 'জয়েন'! তারপর দৈবক্রমে যদি একটি সন্তান এসে জুটল, তা'হলে হল সে একটি ষট্‌পদ মক্ষিকা—সর্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশবৃদ্ধি হলেই—অষ্টপদ পিপীলিকা, দিন নেই, রাত নেই,—ছোটো শুধু আহারের চেষ্টায়। তারপর, এই বংশবৃদ্ধি যখন বংশ-ঝাড়েরই মত চরম উন্নতিলাভ করল, অর্থাৎ কিনা নিতান্ত অর্বাচীনের মত গিন্নী যখন একবস্তা সন্তানপ্রসব করে ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হয়ে গেল একেবারে বহুপদবিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো! বেশ একটা হতাশ—নির্বিকারভাব! কোন বস্তু নেই—ছুঁলেই জড়সড়।"

'মৃত্যু-ক্ষুধা' (প্রথম প্রকাশ—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসের জন্যে নজরুল সৎঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গতভাবেই কতকটা দাবি করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থকশিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন।

'মৃত্যুক্ষুধা'র পটভূমিকা কৃষ্ণনগরে। উপন্যাসের সময় খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। বিত্তশালী মুসলমান পরিবারের যুবক আনসার এই উপন্যাসের নায়ক। যুবকের চেহারা ও পোষাকের বর্ণনার মধ্যেই তার অন্তঃপ্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় অনেকটা স্পষ্ট। কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে আনসার তার 'খালেরা বহিন্' বা মাসতুতো বোন লতিফা বেগম ওরফে বুঁচির বাসায় এসে উঠলে সারা শহরে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়। গ্রন্থকার আনসারের বেশভূষা ও চেহারার বর্ণনায় লিখেছেন,

"যুবকের গায়ে খেলাকতী ভলান্টিয়ারের পোশাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে। খদ্দরেরই জামা-কাপড়—কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মত টুপি; তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি ক্রুস। তরবারি ক্রুসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাত্মক একটা লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মত কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকোর মত এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ। শরীরের রং যেমন ফরশা, তেমনি নাক-চোখের গড়ন! পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন মাপ করে করে তৈরী—গ্রীক-ভাস্করের এ্যাপোলো মূর্তির মত—নিখুঁত সুন্দর।

কিন্তু এমন চেহারাকে লোকটা অবহেলা করে করে পরিত্যক্ত প্রাসাদের মর্মর-মূর্তির মত কেমন ম্লান করে ফেলেছে। সর্বাঙ্গে ইচ্ছাকৃত অবহেলা অযত্নের ছাপ।"

আনসার দেশকর্মী। তার বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি, বাপ-মা, ভাই-বোন, এসব কিছুরই অভাব নেই। তবুও সে কেন দেশের কাজে সব ছেড়ে চলে এল তার কারণ স্বরূপ সে লতিফাকে জানিয়েছে,

"দুনিয়ার সব মানুষই একই ছাঁচে ঢালা নয় রে বুঁচি। এখানে কেউ ছোটে সুখের সন্ধানে, কেউ ছোটে দুঃখের সন্ধানে। আমি দুঃখের সন্ধানী। মনে হয় যেন আমার আত্মীয়-পরিজনের কেউ নই। আমার আত্মীয় যারা, তাদের সুখের নীড়ে আমার মন বসল না। অনাত্মীয়ের অপরিচয়ের দলের নীড়-হারাদের সাথী আমি! ওদের বেদনায়, ওদের চোখের জলে আমি যেন আমাকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। তাই ঘুরে বেড়াই এই ঘর-ছাড়াদের মাঝে।"

আনসার আগে কংগ্রেসপন্থী ছিল, কিন্তু জেল থেকে ফিরে এসে তার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে। এখন সে বুঝেছে যে, আর সব দেশ যখন মাথা কেটেও স্বাধীনতা লাভ করতে পারছে না তখন এই দেশের পক্ষেও চরকায় সুতো কেটে স্বাধীন হওয়া অসম্ভব। সুতোয় কাপড় হয়, কিন্তু দেশ স্বাধীন হয় না। এবার সে অনুভব করেছে যে, শ্রমিকশক্তির উদ্বোধন না হ'লে দেশকে স্বাধীন করা দুঃসাধ্য। তাই সে কৃষ্ণনগরে এসেছে একটি শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তুলতে। তার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে গরুর গাড়ির

গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতির মধ্যে।

আনসার দেশসেবার উত্তেজনার মধ্যে একদিন অনুভব করলে যে সে সত্যিই দুঃখী। তার মনে হল—"মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে—যা অতিগভীর, অতলস্পর্শ। নিখিল-মানবের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা—সে যেন মানুষকে ধেয়ানী সুস্থ করে তোলে। বড় মধুর, বড় প্রিয় সে দুঃখ।"

আনসারের এই অনুভূতির উৎসে রয়েছে ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার হামিদের বিধবা মেয়ে রুবি যে কিনা আনসারকে ভালবাসে। আনসারও বুঝতে পেরেছে রুবির প্রতি তার দুর্বলতা।

কিছুকাল পরে আনসার কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের অভিযোগে রাজবন্দী হল, আর তার অত্যল্পকাল পরে রুবির বাবা নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন। লতিফার কাছে রুবি শুনলে কৃষ্ণনগরে আনসারের কর্মমুখর জীবনের কথা, আর স্পষ্ট করে জানতে পারলে যে আনসার সত্যিই তাকে ভালবাসে। তাই যখন রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল থেকে লেখা আনসারের চিঠিতে জানা গেল যে তার যক্ষ্মা হয়েছে এবং সে মুক্ত হয়ে শীঘ্রই ওয়ালটেয়ারে চলে যাবে, তখন রুবি আনসারকে বাঁচাবার জন্যে ওয়ালটেয়ারে যাত্রা করলে। বুঁচিকে-লেখা এই চিঠিতে রুবির বিষয়ে আনসারের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে—

"মাঝে মাঝে মনে হয়—মনে হয় ঠিক না, লোভ হয়—যাবার আগে এই অদ্বিতীয় মনের দ্বিতীয় জনকে দেখে যাই—জেনে যাই। আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে সাদা মেঘের ছায়া নয়—কালো মেঘের ছায়া-ঘন মায়া দেখে যাই।

তোরই চিঠিতে জেনেছি, সে মেঘ নাকি তোরই দেশে গিয়ে জমেছে। তোর হাতের কাছে যদি খুব খানিকটা উত্তুরে হাওয়া থাকে, দিতে পারিস তাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে?"

কিন্তু রুবি আনসারকে বাঁচাতে পারলে না। তাকে দেহদান ক'রে সে নিজেও যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হল। বুঁচিকে লেখা তার যে চিঠি দিয়ে এ গ্রন্থের শেষ তাতে সে স্পষ্টই লিখেছে,

"আমি জানি আমারও দিন শেষ হয়ে এল। আমিও বেলাশেষের পূরবীর কান্না শুনেছি। আমার বুকে তার বুকের মৃত্যু-বীজাণু নীড় রচনা করেছে। আমার যেটুকু জীবন বাকী আছে তা খেতে তাদের আর বেশী

দিন লাগবে না। তারপর চিরকালের চিরমিলন—নতুন জীবনে—নতুন তারায়—নতুন দেশে—নতুন প্রেমে।"

গ্রন্থের প্রথমদিকে কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কের চাঁদ-বাজারস্থিত 'তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর 'ওমান কাত্লি' (রোম্যান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট ক্রীশ্চানে'র সুখদুঃখের একটি জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায়। গজালের মা, হিড়িম্বা, পুঁটের মা, খাতুনের মা প্রভৃতির ঝগড়া ও মিলনের কাহিনী চিত্তাকর্ষক। গজালের মায়ের ছোট-ছেলে প্যাকালের সঙ্গে মধু ঘরামীর মেয়ে কুঁশির প্রণয়প্রসঙ্গ এবং পরে সমাজের অত্যাচারে রোম্যান ক্যাথলিক হবার পর উভয়ের মিলনকাহিনী স্বতন্ত্রভাবে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হলেও মূলকাহিনীর সঙ্গে প্রায় যোগবিহীন বলে উপন্যাসের মূলরসসৃষ্টিতে এক বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, "......the law of unity requires that in a compound plot the parts should be wrought together into a single whole."[১]

প্যাকালের মেজবৌদি ও বাড়ীর মেজবৌয়ের দুঃখের ইতিবৃত্ত—সমাজের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে খ্রীষ্টান মিশনরী মিস জোন্সের সস্নেহ প্রভাবে তার ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ, আনসারের সংস্পর্শে মুক্ত জীবনের আস্বাদন, তার খোকাকে হারিয়ে মুসলমান ধর্মে প্রত্যাবর্তন, দেশের ক্ষুধাতুর শিশুদের মধ্যে নিজের ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার অনুভূতি এবং পরিশেষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে তার পাঠশালা খোলবার সংকল্প পাঠককে একটি জীবন্ত ও দীপ্ত চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়। সমাজের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে মেজবৌ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। বস্তুত এই চরিত্রটিই নজরুলের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি। তবে উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রটি যথাযথভাবে সম্বন্ধযুক্ত নয়।

আনসারের চরিত্রের স্বাভাবিক দীপ্তি শেষ পর্যন্ত অম্লান থাকে নি। রুবি সমাজ-সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে চলে গিয়ে আনসারের সেবার মধ্যে তার জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে প্রেমের বিজয় ঘোষণা করেছে সত্য, কিন্তু পাঠককে সে কোন নূতন জীবনজিজ্ঞাসার সন্ধান দিতে পারে নি। গ্রন্থটিতে সমাজসচেতনতা ও রাজনৈতিক চেতনার উজ্জ্বল বর্ণসমারোহ থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত এটি একটি নিছক রোমান্টিক প্রেমকাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

---

[১] Hudson : An Introduction to the Study of Literature : p. 142

'মৃত্যু-ক্ষুধা'র ভাষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কোন জায়গায় আঞ্চলিক বা গ্রাম্যভাষা প্রয়োগ ক'রে গ্রন্থকার তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলি ও তাদের পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। কয়েকটি স্থানের বর্ণনা যেমন নিখুঁত বাস্তবানুগ, তেমনি কবিত্বময়। উদাহরণস্বরূপ প্যাকালের মায়ের মৃত্যু-দৃশ্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"প্যাকালে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "বড়-বৌ, কি ভীষণ অন্ধকার! আর সহ্য করতে পারছি নে, বাতি, বাতি কই?"

বড়-বৌ তেমনি কান্না-দীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "বাতি নেই! সব বাতি নিবে গেছে! ঘরে একফোঁটা তেল নেই।"

প্যাকালে উন্মাদের মত ভাঙা ঘরের চালা থেকে একরাশ পচা খড় টেনে জ্বালিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "তাহলে ঘরই পুড়ুক!"

সেই রক্ত-আলোকে দেখা গেল, প্যাকালের মা তার কঙ্কাল আর আবরণচামড়াটুকু নিয়ে তখনো ধুঁকছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়!

প্যাকালে "মা" বলে তার বুকে পড়তেই বৃদ্ধার চক্ষু একটু জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিবে গেল চিরকালের জন্যে!

চালের খড় তখনো ধু ধু করে জ্বলছে, ওদের বুকের আগুনের মত। একটু পরে অগ্নিশিখাও যেন অতিশোকে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।"

'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এই উপন্যাসের নায়ক মুসলমান যুবক জাহাঙ্গীর। যখন সে সবেমাত্র জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শিখেছে, তখন সে অকস্মাৎ জানতে পারলে যে তার মা ফিরদৌস্ বেগম সাহেবা কলকাতার একজন ডাকসাইটে বাইজী ও তার পিতা ফররোখ সাহেব চিরকুমার; সুতরাং সে তার মাতাপিতার কামজ সন্তান। এই সময় জাহাঙ্গীরের এক তরুণ স্কুল-মাস্টার বিপ্লববাদী প্রমত্ত তাকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করে। সে জাহাঙ্গীরকে আশ্বাস দেয় যে, জারজ সন্তান হলেও দেশসেবার পবিত্র ব্রত সে গ্রহণ করতে পারে, কেননা কোন অসহায় মানুষই তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়। এরপর জাহাঙ্গীর তার বন্ধু হারুনের সঙ্গে বক্রেশ্বরের ধারে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেল। সেখানে হারুনের পাগল মা তাঁর বড় মেয়ে তহমিনা ওরফে ভূণীকে পাগল অবস্থার ঝোঁকে জাহাঙ্গীরের হাতে সঁপে দিলেন। ভূণী ধরে নিলে যে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে খোদার ইঙ্গিতে

এবং জাহাঙ্গীরই তার ভাবী স্বামী। কিন্তু ভূণীকে না নিয়েই কলকাতা যাবার পথে জাহাঙ্গীর শিউড়ি এসে পৌছল। আসার সময় সে হারুনকে জানিয়ে এল যে সে বিপ্লবী। শিউড়ি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তার দেখা হয়ে গেল প্রমত্তর সঙ্গে। সে তাকে বিপ্লবীদলের নেতা বজ্রপাণির হুকুমে নিয়ে গেল বিপ্লবীদের শক্তিস্বরূপা জয়ন্তীর কাছে। জয়ন্তীর একমাত্র মেয়ে চম্পার সঙ্গে এইখানেই জাহাঙ্গীরের প্রথম দেখা হল। এরপর সে কলকাতায় ফিরে এলে তাদের জমিদারির দেওয়ানজী তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তার মা কোন খবর না পেয়ে দেশ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ছেলের কাছে তার বক্রেশ্বরের ঘটনা শুনে ও ছেলেকে-লেখা ভূণীর একটি পত্র দেখতে পেয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে বক্রেশ্বরের নিকটবর্তী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মৌলবী-ছদ্মবেশী প্রমত্তর দেখা হয়ে গেল। মায়ের অনুরোধে প্রমত্তকে শিউড়ি পর্যন্ত একই সেলুনে যেতে হল। গ্রামে পৌছনোর দিন রাত্রিতেই একমুহূর্তের দুর্বলতায় জাহাঙ্গীর তহমিনার এমন ক্ষতি করলে যার চেয়ে আর কোনো বড় ক্ষতি মেয়েদের পক্ষে হতে পারে না। যাই হোক জাহাঙ্গীর মায়ের সঙ্গে হারুনের সব আত্মীয়কে নিয়ে কলকাতা ফেরবার জন্যে যাত্রা করলে। শিউড়িতে পৌছে এক ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কাছে সে শুনলে যে প্রমত্ত ও জয়ন্তী ধরা পড়েছে এবং ব্রজপাণির আদেশ হয়েছে মুসলমানমেয়ের ছদ্মবেশধারিণী চম্পাকে ও সেইসঙ্গে একবাক্স অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাকে কলকাতায় যেতে হবে। প্রথমে চম্পা জাহাঙ্গীরদের সঙ্গে গাড়ীর এক সেলুনেই চলল। পরে পুলিশের গতিবিধি বুঝতে পেরে জাহাঙ্গীর ও চম্পা বর্ধমানে নেমে ট্রেন ধ'রে রাণীগঞ্জে এসে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে কলকাতা যাত্রা করলে। পথে হাওড়াব্রিজের মোড়ে পুলিশের হাতে ট্যাক্সি ধরা পড়ল। চম্পা পালিয়ে আত্মরক্ষা করলে। বিচারে বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর ও দলের অনেকের দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

এই গ্রন্থের পটভূমিকায় রয়েছে বাংলাদেশে স্বদেশীযুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। হিন্দু বিপ্লববাদীদের সঙ্গে মুসলমান যুবকদের দেশপ্রেমের বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু নায়কের ব্যক্তিগত প্রেম-সমস্যা ও নারীতত্ত্ব বড় হয়ে ওঠায় এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সফল হতে পারে নি। শেষ অধ্যায়ে আলিপুর জেলে বন্দী অবস্থায় হারুনের কাছে তার চরম উক্তি "তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী কুহেলিকা।" স্বতই বিপ্লবীসুলভ

জীবন-জিজ্ঞাসাকে খর্ব করে। নায়ক জাহাঙ্গীর দেশপ্রেমে দীক্ষা নিয়েছে, নেতার নির্দেশে অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্লবাত্মক কাজ করেছে এবং পরিশেষে দ্বীপান্তরেও গেছে, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবীর দেশপ্রেম ও আদর্শ তার মনের মধ্যে কখনই জ্বলে ওঠে নি। চম্পার কাছে তার আত্মস্বীকৃতি থেকেই এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সে বলেছে, "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম—ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব—নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটি হতে পারলুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই!" এই উক্তির পর তার আত্মত্যাগ কোন মহৎআদর্শের নির্দেশ দেয় কি?

নজরুলের জীবনী থেকে জানতে পারি যে, নজরুল প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের সপক্ষতা করেন। পরে এই আন্দোলনের বিফলতা দেখে সন্ত্রাসবাদকেই তিনি বিশেষভাবে আঁকড়ে ধরেন। মধ্যবিত্ত, বিশেষ ক'রে নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যেই এই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিল বেশী। নজরুল 'কুহেলিকা'র মধ্যে সন্ত্রাসবাদের বিফলতার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত ক'রে ইতিহাসবোধের প্রদীপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বিপ্লবীদলের অধিনায়ক বজ্রপাণি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর ইত্যাদি সকলের কার্যাবলীই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং তারা সকলেই দ্বীপান্তরের শাস্তিভোগ করেছে। এই উপন্যাসের উপর যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) ও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র (১৯২৬) গভীর প্রভাব আছে তা অনস্বীকার্য। 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর কঠোর ও নির্মম রূপের সঙ্গে 'কুহেলিকা'র বজ্রপাণির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তার ক্ষমাহীন কঠিন আদেশ কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। প্রমত্তর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব, অন্তর্ধান, নানাছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া, দেশ ও জাতির সম্পর্কে আদর্শমূলক বক্তৃতাদান প্রভৃতির মধ্যে সব্যসাচীর অস্তিত্বের স্পন্দন অনুভূত হয়। প্রমত্তর দেশপ্রেম তর্কাতীত। কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ ঘটনা স্রোতে চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ না ঘটায় তার দেশপ্রেমের মহিমা আকাঙ্ক্ষিত উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত হতে পারে নি।

সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে অধিনায়ক বজ্রপাণির কণ্ঠ নীরব। সমগ্র বিপ্লবীদলের আদর্শ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা বাণীরূপ পেয়েছে প্রমত্তর কণ্ঠে। তার স্বরে কোথাও কোথাও বিবেকানন্দের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হয়।

"আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-

অরণ্যকেই ভালবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র—নিরন্ন-পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়,—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত!"

তহমিনা চরিত্রটি চিত্রণের জন্যে নজরুল কতকটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সমগ্র উপন্যাসে ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সংঘাতের ভিতর দিয়ে এই একটি চরিত্রেরই খানিকটা অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে তহমিনা একটু বেশী প্রগল্‌ভ ও বাক্‌পটু। তৎসত্ত্বেও তার চরিত্রে কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার মিশ্রণ ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধের সমন্বয় পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ না করে পারে না। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, তহমিনা চরিত্রে প্রথম দিকে যে দ্যুতি ও মহিমা ছিল নজরুল শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি।

হিন্দুমেয়ে বিপ্লববাদিনী চম্পা চরিত্রটি অস্বাভাবিকতায় ভরা। নজরুল এই চরিত্রের কোন বিকাশ না দেখিয়েই জাহাঙ্গীরের প্রতি তার যে চরম দুর্বলতা দেখিয়েছেন, তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বাস্তববোধ-বর্জিত। চম্পার কাছে জাহাঙ্গীরের জন্মপরিচয়দান ও তহমিনার সর্বনাশ সম্পর্কে তার আকস্মিক স্বীকারোক্তির কোনও যথোপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। চম্পা ও জাহাঙ্গীরের প্রণয়-ব্যাপারের একটা ক্রমগতি দেখানো উচিত ছিল। তহমিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও তাকে ভাবী বধূ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পরেও চম্পার কাছে তার উক্তি "জীবনে কাউকে ভালোবাসি নি, কারুর ভালবাসা পাই নি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে—তখন আমি বেঁচে গেলুম।" নিঃসন্দেহে তার চরিত্র-গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে।

॥ ৩ ॥

ছোটগল্প-রচয়িতা হিসেবে নজরুল বাংলা-সাহিত্যে বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য স্থানের অধিকারী নন।

'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৩২৯ সালে (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)। 'ব্যথার দানে'র উৎসর্গে আছে—"মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম ব'লে ক্ষমা কর নি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।" গ্রন্থটিতে ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে—'ব্যথার দান', 'হেনা', 'বাদল-বরিষনে,' 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি'।

১৩২৯ সালের মাঘ মাসের (১৯২৩) 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' 'ব্যথার দান' সম্পর্কে যা লেখেন তা উল্লেখনীয়।

"......গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক গল্পেই করুণরস নিবিড়ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে। নিরাশ প্রেমের মর্মন্তুদ গভীর বেদনা এই পুস্তকের প্রত্যেক পাতায় ফুটিয়াছে। গল্পগুলিতে আখ্যানবস্তুর কারিগরি না থাকিলেও ভাববৈচিত্র্যে ও কাব্যসম্পদে উহা মনোরম হইয়াছে। প্রেমের বিচিত্র ব্যাখ্যান ও মানবমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে লেখকের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। গল্পগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও উহাদের অন্তরের যোগ আছে। একটি বিপুল ব্যথার নিবিড় ক্রন্দন মণিগণের মধ্যস্থিত সূত্র-খণ্ডের ন্যায় সমস্ত গল্প কয়টিকে ধারণ করিয়া আছে। শব্দ-নির্বাচনে অসামান্য কৃতিত্ব গল্পগুলিতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁর লিখনভঙ্গি লক্ষিতগতিতে পাঠকের অন্তরের অন্তস্তলে যাইয়া প্রবেশ করে এবং মদির মাদকতার আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই মাদকতার বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে অবসাদ জন্মায় না, আনন্দ দেয়—তীব্র তেজে দহন করে না, রুদ্রতালে শিরায় শিরায় রক্তকণা নাচাইয়া তোলে।......কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা গ্রন্থটির বহুস্থানে ছড়ানো রহিয়াছে। কোন কোন গল্পে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যেরূপ উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যেরূপ নূতন, সেইরূপ সৌন্দর্যপূর্ণ।"

গল্পগুলির মধ্যে কাহিনীরস নেই বললেই হয়। যে হিসেবে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের শোকোচ্ছ্বাসমূলক-নিবন্ধ 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

রূপককাব্য 'বসন্ত-প্রয়াণ' বাংলা সাহিত্যে গদ্যকাব্য, সেই হিসেবে 'ব্যথার দান'কেও গদ্যকাব্য বলা অসঙ্গত নয়। কবিমনের কল্পনা গোলেস্তাঁ, চমন্, বোস্তান, বেলুচিস্তানের আখ্‌রোট ও ডালিমের বন, কাবুল, পেশোয়ার, ফ্রান্স, আফ্রিকা ইত্যাদির পটভূমিতে এক কবিত্বময় নূতন সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

'ব্যথার দান'-এ দারা ও বেদৌরা এবং 'হেনা'য় সোহ্‌রাব ও হেনার বিরহ-মিলনের কাহিনী কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এই দুটি গল্পের মধ্যে অন্যান্য গল্পের তুলনায় কতকটা আখ্যায়িকারস আস্বাদন করা যায়। যুদ্ধ-স্থানের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন পটভূমিতে রচিত প্রণয়কাহিনীতে একটি অভিনব জীবনবেদনার রস সঞ্চারিত। অত্যধিক ভাবাবেগ ও উচ্ছলতা মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যে প্রেম ও জীবনপিপাসার তীব্রতারই প্রতীক। তবে স্থানে স্থানে এই উচ্ছ্বাসাধিক্য কাহিনীর গতিকে ভারাক্রান্ত করেছে বলে মনে হয়।

'বাদল-বরিষনে', 'ঘুমের ঘোরে', 'অতৃপ্ত কামনা' ও 'রাজবন্দীর চিঠি' গল্প-গুলির মধ্যে একটি কবিসুলভ মনের বিরহবিধুর ও অশ্রুদীপ্ত প্রেমস্মৃতি-মন্থনের ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে এই ইতিবৃত্তগুলি কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও প্রেমিকহৃদয়ের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও আবেগানুভূতির রৌদ্রোজ্জ্বল রেখাচিত্রণও এগুলিতে অবর্তমান নয়। কথাবস্তুর লক্ষণীয় অভাব কয়েকটি ক্ষেত্রে কতকটা পুষিয়ে দিয়েছে কবিত্বময় তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক বর্ণনার মাধুর্য। একটি উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

"সে এল মঞ্জীর-মুখর চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে! তার বাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাঁপি। কবরী-ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হ'য়ে তারই বুকে ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ছিল, ঠিক পুষ্প-পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মত। কপোল-চুম্বিত তার চূর্ণকুন্তল হ'তে বিক্ষিপ্ত কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এরই খোশ্‌খবর চারিদিকে রটিয়ে এল,—ওগো ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পেরিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে!......আমার বোধ হ'ল, এ কোন্ ঘুমের দেশের রাজকন্যা আমার কিশোরী মানস-প্রতিমার পূর্ণ পরিণতিরূপে এসে আমার চোখে স্বপ্নের জাল বুনে দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে আমার আবিষ্ট চোখের পাতা তুলেই দেখতে পেলুম, বেতস লতার মত সে আমার সামনে অবনত মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে! আমাকে

চোখ মেলে চাইতে দেখে যেন সে চ'লে যেতে চাইলে। আমি তাড়াতাড়ি ভীত জড়িত স্বরে বললুম,—কে তুমি?"১

'রিক্তের বেদন' (প্রথম প্রকাশ—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ)-এ মোট আটটি গল্প আছে। প্রথম গল্প 'রিক্তের বেদন'-এ একটি মুসলমান যুবক হাসিন তার প্রেমাস্পদা শহিদার প্রেমকে উপেক্ষা ক'রে যুদ্ধে গিয়ে সেখানে এক বেদুইন রমণী গুলের প্রেম-ভাজন হয়ে পড়েছে। তারপর যখন গুল একজন সান্ত্রীকে হত্যা ক'রে তার রাইফেল নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে, তখন হাসিনই সৈনিকের কর্তব্যবোধে পিস্তলের গুলিতে তার জীবননাট্যের যবনিকা টেনে দিয়েছে। যুদ্ধভূমির পটভূমিকায় মুমূর্ষু গুলের সঙ্গে হাসিনের শেষমিলন বড় করুণ, বড় মধুর। গল্পটির মধ্যে মানবপ্রেমের একটি বেদনাদীপ্ত রূপ প্রস্ফুটিত। কাব্যধর্মী ভাষার উষ্ণতা এই প্রেমকাহিনীকে পুষ্পিত করতে সহায়তা করেছে। বাগ্‌বাহুল্য বাদ দিলে 'রিক্তের বেদন' একটি মোটামুটি উপভোগ্য গল্প।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' বাঙালী পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক, যে বাগদাদে গিয়ে মারা পড়ে, নেশার ঝোঁকে তার আত্মস্মৃতিরোমন্থনের বৃত্তান্ত। এই কাহিনীতে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য প্রতিফলন ঘটেছে বলে এটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় মণ্ডিত। তা না হলে গল্প হিসেবে এর মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কাহিনীর বিবৃতিতে একটি লঘু পরিহাসের সুর নজরুলের প্রাণোচ্ছল রসিকতাকে মনে করিয়ে দেয়। এইটিই নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প। এটি ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সওগাত'-এ আত্মপ্রকাশ করে।

'মেহের নেগার' গল্পে মুসলমান যুবক য়ুসোফের সঙ্গে মেহের নেগার ও গুল্‌শনের বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনী কাব্যময় ভাষায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত। কিন্তু আখ্যানভাগের দৈন্য ও আবেগের প্রাবল্য গল্পের রসনিষ্পত্তির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

'সাঁজের তারা'র মধ্যে কথিকার ঢঙটি প্রবল এবং এর উপর রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র রচনাশৈলীর প্রভাব একান্তভাবে অনুভবগম্য। আরব-সাগর বেলায় একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর সাঁজের তারার সঙ্গে একটি অনুভূতি-প্রবণ কল্পনাভরা মনের নূতন করে চেনাশোনার একটি রসঘন ইতিকথা এখানে

১ ঘুমের ঘোরে : ব্যথার দান

রূপায়িত। 'অস্তপারের সন্ধ্যা-লক্ষ্মী' সাঁজের তারার সঙ্গে মানব মনের পরিণয়-কাহিনীকেই লেখক বেদনার্দ্র ভাষায় জীবন্ত ক'রে তুলেছেন।

'রাক্ষুসী' ও 'স্বামীহারা' গল্প দুটিতে দুটি নারীর যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মকাহিনী বিবৃত হয়েছে। উভয় গল্পেই নারীমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নজরুলের জ্ঞান ও সমাজ-বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অসতর্ক পাঠকের মনকেও আকর্ষণ না করে পারে না।

'সালেক' গল্পটির উপর 'লিপিকা'র প্রভাব গভীরভাবে বিদ্যমান। গল্পটিতে সূক্ষ্ম জীবনজিজ্ঞাসা ও ভাবের একমুখিতা চিত্তাকর্ষক। এইখানে নজরুলের প্রকাশভঙ্গির সংযমও দ্রষ্টব্য। হাফিজের প্রতি নজরুলের আন্তরিক আকর্ষণ গল্পের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। গল্পটির উন্মোচনে ও কেন্দ্রগত ঐক্যরক্ষায় নজরুল কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। এটির মধ্যে হাফিজের যে বিখ্যাত বাণী রূপায়িত হয়েছে তা এই—

"জায়নামাজে শরাব রঙিন কর, মুর্শিদ বলেন যদি
পথ দেখায় যে, জানে সে যে পথের খবর অন্তআদি।"

'দুরন্ত পথিক' কথিকায় মানবাত্মার শাশ্বত সত্যের পথে এক মুক্তদেশের উদ্বোধন-বাঁশীর সুর ধ'রে চির-যৌবনের প্রতীক এক দুরন্ত পথিকের জয়যাত্রার ইতিহাস কীর্তিত। পথিক বিশ্বের কল্যাণমন্ত্রের সন্ধানী ও চিরন্তন মুক্তিকামী। শেষ পর্যন্ত সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলে, কেননা মুক্ত মানবাত্মার কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে যে, যুগে যুগে জীবন তো এই মৃত্যুরই বন্দনা-গানে রত। সহস্র প্রাণের উদ্বোধনেই ত তার মরণের সার্থকতা। যে নিজে মরে অন্যকে জাগাতে পারে তার মৃত্যুই তো চিরজাগ্রত ও অমর হয়ে ওঠে। কথিকাটির আবেগ-গাঢ়তা প্রাণস্পর্শী এবং আশাদীপ্ত পরিণতিটিও অপূর্ব-সুন্দর।

'শিউলি-মালা' গল্পগ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩১) চারটি ছোট ছোটগল্পের সঞ্চয়ন—'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা', 'শিউলিমালা' ও 'অগ্নি-গিরি'। শেষ গল্প 'শিউলি-মালা'র নামেই গ্রন্থের নামকরণ। কলকাতার নাম-করা তরুণ ব্যারিস্টার আজহারের সঙ্গে শিউলি নামে একটি মেয়ের বিয়োগান্ত প্রণয়কাহিনীই গল্পটির উপজীব্য। আজহার নিজের মুখেই তার আত্মকাহিনী বিবৃত করেছে। গল্পটি করুণমধুর সুরে একটি রসঘন পরিণতির দিকে সুষ্ঠুভাবেই এগিয়ে গেছে। একটি বেদনাতুর হৃদয়ের স্নিগ্ধছায়া সমস্ত গল্পটির উপর একটি মনোহারিতা ছড়িয়ে দিয়েছে। কাব্যধর্মী ভাষাও

এখানে জীবনযন্ত্রণার তীব্রতাকে ফোটাতে সহায়তা করেছে। শিউলির বর্ণনাটি অপূর্ব।

"ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া—যত ভালবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধূলায় ঝরে পড়বে!"

প্রেমিকহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি এখানে বিশেষ কারুকার্যময় ভাষায় প্রকাশিত।

"ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ! চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হ'ল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে—চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!"

বিরহী প্রেমের সান্ত্বনা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের রহস্যময় গভীরতা নিয়ে এখানে উপস্থিত।

"শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার তান ও গানের পুঁজি প্রায় সব শেষ হয়ে গেল।

মনে হ'ল, আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হল না—হবেও না এ জীবনে কোনোদিন—কিন্তু কণ্ঠবদল হয়ে গেল! আর মনের কথা—সে শুধু মনই জানে।"

১৯২৮ সালে যখন নজরুল ঢাকায় যান তখন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠতা হয় তার স্মৃতি 'শিউলিমালা' গল্পে ছায়া ফেলেছে।

'শিউলিমালা'র প্রথম গল্প 'পদ্ম-গোখরা' একটি পল্লীউপকথা উপলক্ষ করে রচিত। একটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশে গল্পটি গড়ে উঠলেও মানবিকতার মধুরতায় তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। নায়িকা জোহ্‌রার চরিত্রটি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত।

'জিনের বাদশা' গল্পটির উপসংহার বিস্ময়কর। নায়ক আল্লারাখা ও নায়িকা চানভানুর চরিত্রচিত্রণে নজরুল অসামান্য পরিমিতিবোধ ও জীবন-দর্শনের আশ্চর্য দীপ্তি প্রদর্শন করেছেন।

'অগ্নিগিরি' শুধু 'শিউলিমালা' গল্প গ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠ গল্প নয়, নজরুলের সমস্ত বিখ্যাত গল্পগুলিরও অন্যতম। বীররামপুর গ্রামের সবুর আখন্দ নামে একটি শান্তশিষ্ট ও সুবোধ বালককে পাড়ার রুস্তমের দল নিত্য অন্যায়ভাবে উত্যক্ত

করত। একদিন নূরজাহান নাম্নী একটি মেয়ের তিরস্কারে সেই শান্ত ছেলেটি হয়ে উঠল দুরন্ত। নূরজাহানের প্রেমের সোনার কাঠিতে সবুরের নিদ্রিত পৌরুষ জেগে গেল ও তার অন্তরের স্তব্ধ পাহাড় হয়ে দাঁড়াল অগ্নিগিরি। নজরুল কৈশোরে যখন দরিরামপুর হাইস্কুলে পড়তেন তখন গ্রামের যে বখাটে ছেলেরা তাঁকে খুবই জ্বালাতন করত তাদেরই দৌরাত্ম্যের ইঙ্গিত রয়েছে এই গল্পটিতে। অভিপ্রায় ও কার্যকরতার অনন্যতা আছে বলে গল্পটি যে একটি শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। কেননা, হাডসনের মতে—

"Singleness of aim and singleness of effect are···the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art."[১]

॥ ৪ ॥

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নজরুলের দান অকিঞ্চিৎকর। 'ঝিলিমিলি' (প্রথম প্রকাশ—নবেম্বর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে), 'আলেয়া' (প্রথম প্রকাশ—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'মধুমালা' (প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ), এই তিনখানি নাটকের কোনোটিতেই নজরুলের নাট্যপ্রতিভার কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর পড়ে নি। নজরুল শুধু নাটক রচনাই করেন নি, তিনি একাধিক বার কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও করেছেন। বাল্যকালে ও কিশোরবয়সে পাড়াগাঁয়ের যাত্রাগান, কথকতা, কবিগান ইত্যাদির বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি নিজে 'লেটো'র দলে অভিনয় করতেন। সুতরাং নাটক যে মুখ্যত দর্শনীয় এ ধারণা তাঁর ছিল বলে মনে হয়। নাটকে দৃশ্যত্বের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে Francisque Sarcey তাঁর 'A Theory of the Theater' প্রবন্ধে তো স্পষ্টই মন্তব্য করেছেন,

"It is an indisputable fact that a dramatic work, whatever it may be, is designed to be listened to by a number of persons united and forming an audience, that this is its very essence, that this is a necessary condition of its existence."

১ **Hudson : An Introduction to the Study of Literature : p. 340**

নাটকের অভিনেয়ত্বের বিষয়ে A. H. Thorndikeও তাঁর 'Tragedy' গ্রন্থে যা বলেছেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য।

"The stage affords the first test of a play's emotional appeal, and perhaps the best test of its dramatic power."

Brander Matthews-এর 'The Art of the Dramatist' গ্রন্থেও লেখা হয়েছে,

"As a drama is intended to be performed by actors, in a theater, and before an audience, the dramatist, as he composes, must always bear in mind the players, the playhouse, and the playgoers."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের কোনো কোনো নাটকের মত নজরুলের নাটকেও কিছু দৃশ্যত্বগুণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যে বিষয়মুখিতা ও নির্লিপ্ততা নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, গীতিধর্মের প্রাবল্যহেতু নজরুল তা বহুক্ষেত্রেই আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাঁর নাটকে কাহিনী ও চরিত্রকে অতিক্রম করে গীতিপ্রাবল্য ও আত্মমুখী তত্ত্ব বা ভাবের প্রাধান্য নাট্যরসনিষ্পত্তির পথে প্রতিবন্ধস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তাঁর গীতিধর্ম গীতিনাট্য ও রূপক-সাংকেতিক নাটকে যে নাতিগভীর ভাবদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে তার উপভোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না।

নাটক হচ্ছে গতিশীল ও পরিবর্তমান জীবনের বাস্তবপ্রতিম ও অভিনয়োপযোগী প্রতিরূপ। নজরুলের নাটকে জীবনের বাস্তবপ্রতিম রসরূপের বিশেষ সাক্ষাৎ মেলে না। নাটকের পক্ষে অপরিহার্য গতিবেগও (action) তাঁর নাট্যগ্রন্থে বাঞ্ছিতমাত্রায় উপস্থিত নয়। এইজন্যে তাঁর নাটকগুলি যথাযথভাবে রসনিষ্পত্তি করতে সমর্থ হয় নি। কেননা, August Wilhelm Schlegel তো পরিষ্কারই জানিয়েছেন,

"Action is the true enjoyment of life, nay, life itself."

পূর্বেই বলা হয়েছে যে নজরুলের প্রতিভা গীতিধর্মী। তাঁর এই গীতি-প্রবণতার জন্যেই তিনি কোন বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করতে পারেন নি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাট্যকার-প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছে গীতিবহুল রূপক-সাংকেতিক নাটকে। শুধু তাই নয়। রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি যতটা ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ততটা বাস্তবমানুষ হয়ে

উঠতে পারে নি। এর ফলে তাঁর নাটক কোন বিশেষ উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করতে অপারগ হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি বায়রণ ও তাঁর সঙ্গীদের নাট্য-সৃষ্টির শোচনীয় বিফলতার বিশেষ কারণ সম্বন্ধে Allardyce Nicoll তাঁর সুখ্যাত 'World Drama From Aeschylus to Anouilh' গ্রন্থে যা বলেছেন তা নজরুলের বিষয়েও বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

"What prevents them from assuming higher power is the intensely subjective tendency of Byron's own genius. This was a common feature of the romantic temper,......"[১]

নজরুল একাধিক রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনা করেছেন। তাই রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভাব সাধারণত ভাষার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এমন কিছু কিছু সূক্ষ্ম, অনিরূপিত ও অনির্দিষ্ট ভাব আছে যাদের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি ভাষার নির্দিষ্ট রূপসীমার মধ্যে সম্ভবপর হয় না। তাই তখন Symbol বা প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে অর্থাৎ সংকেতের মধ্য দিয়েই অনির্বচনীয় ভাবানুভূতির কতকটা আভাস দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। প্রয়োজনবোধে অনেক নাট্যকারই সাংকেতিক রীতি ব্যবহার করেছেন। আন্দ্রিভ, হাউপ্টম্যান, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস প্রভৃতির নাটকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সাংকেতিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্র-নাটকেই এর এক চরমপ্রকাশ দেখা যায়।

ইয়েটস্ তাঁর 'Ideas of Good and Evil' গ্রন্থে সংকেত ও রূপকের বিষয়ে লিখেছেন,

"A Symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame; while Allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle, and belongs to fancy, and not to imagination; the one is a revelation, the other an amusement."

---

১ Nicoll: World Drama From Aeschylus to Anouilh Reprinted London 1951 : p. 413

ভিন্নজাতীয় দু'টি বস্তুর তীব্র সাদৃশ্যবোধের ফলে যখন অভেদবোধ জন্মলাভ করে, তখন রূপকের সৃষ্টি হয়। এই বোধ ক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ হলে বাক্যালঙ্কার রূপক উৎপন্ন হয়, কিন্তু যদি এই বোধ বিস্তৃত হয়ে একটি স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে রূপকরচনা জন্মগ্রহণ করে। সাঙ্গরূপককে রূপক অলঙ্কারের বিস্তৃত সংস্করণ বলা যায়। Allegory অর্থেই রূপক কথাটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাংকেতিক নাটক বাস্তবাবলম্বী ও রূপকাবলম্বী এই দুইপ্রকারের হতে পারে। বাস্তবনিষ্ঠ কোন কাহিনীর আশ্রয়ে যখন কোন ভাবসত্যের সংকেত পাওয়া যায়, তখন বাস্তবাবলম্বী সাংকেতিক বা বাস্তব-সাংকেতিক নাটকের সৃষ্টি হয় আর যখন কোন রূপকের আধারে কোন তত্ত্বের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, তখন রূপকাবলম্বী সাংকেতিক বা রূপক-সাংকেতিক নাটক জন্মলাভ করে।

'ঝিলিমিলি' গ্রন্থটি 'ঝিলিমিলি', 'সেতুবন্ধ', 'শিল্পী', ও 'ভূতের ভয়'—এই চারিটি একাঙ্কনাটিকার সমষ্টি। এদের মধ্যে একমাত্র 'ঝিলিমিলি' নাটিকাটিই সবচেয়ে বেশী নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। 'সেতুবন্ধ' নাটিকাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' (১৯২২)-র বিষয়বস্তুর সমধর্মিতা লক্ষণীয়। 'শিল্পী' নাটিকায় নজরুলের জীবনতত্ত্ব আভাসিত হলেও এর প্রকৃত মূল্য সামান্যই। 'ভূতের ভয়'-এ তিনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করতে চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে দেশের উপেক্ষিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত ও আত্মবিস্মৃত শক্তিকে চেতনাসম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'ঝিলিমিলি' মোটামুটি একটি রূপক-সাংকেতিক নাটিকা। এই একাঙ্ক নাটিকার তিনটি দৃশ্যের মধ্যে দ্বিতীয় দৃশ্যটির স্থান স্বপ্নপুরী। 'ঝিলিমিলি' কথাটির আভিধানিক অর্থ ঝলমলে, উজ্জ্বল বা তরঙ্গায়িত। কথাটি এখানে ঝিলমিলি অর্থাৎ খড়খড়ি অর্থে ব্যবহৃত। এই খড়খড়ি বা ঝিলমিলি মানব-সংসারের সঙ্গে স্বপ্নলোক ও বেহেশ্‌তের যোগাযোগে-পথের প্রতীক বা সংকেত হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

নাটিকার কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বর্ণনা করলে রূপক-সংকেতটি বুঝতে সুবিধে হবে। প্রথম দৃশ্যে মির্জাসাহেবের দ্বিতল বাড়ীর উপর-তলার প্রকোষ্ঠে তাঁর ষোড়শী মেয়ে ফিরোজা রোগশয্যায় শায়িতা। সব জানালা বন্ধ, শুধু পশ্চিমদিককার দরজা খোলা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ফিরোজার মা

হালিমা মেয়েকে পাখা করছেন। ফিরোজা মাকে বলে পুবদিককার জানালাটা খুলে দিতে। কিন্তু হালিমা রাজী হন না। তিনি প্রথমে জানান যে, ওদিককার জানালা খুললে মির্জাসাহেব তাঁকে জ্যান্ত রাখবেন না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের মিনতিতে তিনি জানালা খোলেন। জানালা খুলতেই দেখা যায় যে একটি ছায়ামূর্তি সামনেকার বাড়ির বাতায়নে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছায়ামূর্তি হাবিবের। এই হাবিব ফিরোজাকে ভালবাসে। কিন্তু মির্জাসাহেব তাদের মিলনের পরিপন্থী। কিছুক্ষণ পরে মির্জাসাহেব ঘরে ঢুকে পুবদিককার জানালা খোলা দেখে হালিমাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েব রোগের আতিশয্য বুঝে ও তার মিনতিতে বিচলিত হয়ে তিনি বলেন যে ফিরোজা ভাল হয়ে উঠলে যদি হাবিব বি. এ. পাশ করতে পারে তবে 'ঐ বাঁদরের গলাতেই এই মোতির মালা' দেবেন। এমন সময় হাবিব এসে দরজায় করাঘাত হানে। মির্জাসাহেব প্রথমে তাকে কঠিন ভাষায় চলে যেতে আদেশ করেন। পরে হালিমার আকুতিতে দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভাল কথায় বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। সেই সময় হাবিবের সঙ্গে ফিরোজার দেখা হওয়াতে দু'জনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তা থেকে 'ঝিলিমিলি'র রূপক-সংকেতের আভাসটি পরিস্ফুট।

"ফিরোজা॥ কেন এত অপমান সইছ আমার জন্যে, তুমি যাও। আমি তোমায় পেয়েছি।

হাবিব॥ পেয়েছ?

ফিরোজা॥ হাঁ, পেয়েছি।

হাবিব॥ কিন্তু, আমি ত পাই নি।

ফিরোজা॥ কাল পাবে। আমি আজ তোমার উদ্দেশে যাব পুব-জানালা দিয়ে। তুমি তোমার বাতায়নের ঝিলিমিলি খুলে রেখো।

হাবিব॥ কিন্তু তোমার বাতায়ন ত রুদ্ধ।

ফিরোজা॥ যখন যাব, তখন আপনি খুলে যাবে।"

তারপর হাবিব চলে যেতেই ফিরোজা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। এবার মির্জাসাহেবের হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি চলেন হাবিবকে ফিরিয়ে আনতে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বপ্ন-পুরীতে ফিরোজার সঙ্গে হাবিবের মিলন দেখানো হয়েছে। নাটিকার তৃতীয় দৃশ্যে ফিরোজার কথা থেকে বোঝা যায় যে স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন ফিরোজারই অবচেতন মনেরই রচনা।

তৃতীয় দৃশ্যে জানা যায় যে, মির্জাসাহেব হাবিবকে খুঁজে পান নি। সে কোথায় চলে গেছে কেউ তা জানে না। হালিমার সান্ত্বনায় ফিরোজা বিশ্বাস করে না যে হাবিব ফিরে আসবে। সে বলে, "মা! মাগো! সে আর ফিরবে না। আমার স্বপ্নই তা'হলে সত্য হ'ল। ঐ অস্ত-চাঁদের চোখে তার অশ্রু লেগে রয়েছে।" এইভাবে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনে গুনে ফিরোজার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। হাবিব যখন বি. এ. পাশের খবর নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন ফিরোজা আর ইহলোকে নেই। হাবিব তখন চলে যায় ফিরোজার সন্ধানে। সে অস্ত চাঁদের চোখে ফিরোজার ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছে।

ফিরোজা এখানে নিখিল বিরহিণীর প্রতীক। দ্বিতীয় দৃশ্যে ফিরোজা নিজের মুখ সম্পর্কে বলেছে, "এ যেন—এ যেন সকলের মুখ! এ যেন শকুন্তলার, এ যেন মালবিকার, এ যেন মহাশ্বেতার মুখ। এ যেন লায়লীর, এ যেন শিরীঁর মুখ!" তখন হাবিব জানিয়েছে, "সত্যিই তাই, তোমার মুখে আজ নিখিল বিরহিণী ভিড় ক'রেছে!"

হাবিব নিখিল-পুরুষ। সেও বিরহী। ফিরোজার কথায়, "তুমি যেন নিখিল-পুরুষ, তুমি যেন অনন্তকাল ধ'রে কাঁদছ।"

এই নরনারীর মিলন মির্জাসাহেবের মত মূর্তিমান সাংসারিক বাধার জন্যে এই পৃথিবীতে হয় না। মির্জাসাহেব 'গ্র্যাজুয়েট গোঁড়ামিতে কাঠ-মোল্লাকেও হার' মানান। কিন্তু যখন মির্জাসাহেবের মত লোক বাৎসল্যে বিগলিত হ'য়ে মত পরিবর্তন করেন ও মিলনের অন্তরায় অপসারিত হয়, তখন নারী বেহেশ্‌তে যাত্রা করে আর নরও তার অনুসন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বেহেশ্‌তে হয় তাদের মিলন। স্বপ্নপুরীতে হাবিব বলেছে, "হাঁ, এখানে—এই স্বর্গলোকে—শুধু দুটি নরনারী—তুমি আর আমি—অনন্তকাল ধ'রে মুখোমুখি ব'সে আছে। তাদের চোখে পলক নেই। বুঝি পলক প'ড়লেই বিশ্ব কেঁদে উঠবে। হারিয়ে যাবে সুন্দর এ স্বর্গলোক। হারিয়ে যাব আমি আর তুমি।" পৃথিবীতে নরনারী বিরহ ভোগ করতে আসে বেহেশ্‌তে তাদের মিলনকে নূতন করে আস্বাদন করবার জন্যে।

হাবিবের একটি গানের মধ্যেই নাটিকাটির মূল সুরটি ধ্বনিত।

"স্মরণ-পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি তুমি আমার তারায় চেন॥

নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন ॥
নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি ॥
নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ॥"

এই রূপক-সাংকেতিক নাটিকাটির রচনায় রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘরে'র অনুভবগম্য প্রভাব আছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। 'ঝিলিমিলি'তে কোন চরিত্রই সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয় নি। মির্জাসাহেবের অকস্মাৎ হৃদয়-পরিবর্তনের ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। স্বপ্নপুরীর দৃশ্যটিকে সুবিন্যস্ত না করতে পারায় কাহিনীর ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। শেষদৃশ্যে হাবিবের প্রস্থান অতিনাটকীয়। সর্বোপরি এই নাটিকার প্রত্যক্ষ চরিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের প্রতিভাস বলে সহজ ও উজ্জ্বলভাবে প্রতীত হয় নি বলে এটি সার্থক রূপক-সাংকেতিক নাট্য হতে পারে নি। আবার নাটিকার কাহিনীর মধ্যে কতকটা বাস্তবিকতা থাকবার জন্যে এটি কোন কোন স্থলে বাস্তব-সাংকেতিক হয়ে উঠেছে।

'Tendencies of Modern English Drama' গ্রন্থে A. E. Morgan সাংকেতিকতা সম্পর্কে বলেছেন,

"Real art is a lamp that time can only nourish. Symbolism may be its flame, a subtle light illuminating true and beautiful ideas, but unless the ideas are true and are beautiful, unless they are essentially real, it is but a will-o'-the-wisp leading only to bottomless quags."

'ঝিলিমিলি'র সাংকেতিকতা যথার্থ বাস্তবিকতায় মণ্ডিত না হওয়াতে এটি দর্শককে অভিপ্রেত ভাব ও আনন্দের লোকে নিয়ে যায় না।

আলেয়া' নাটকখানি নাট্য-নিকেতনে অভিনীত হয় (প্রথম অভিনয়-

রজনী—পৌষ ১৩৩৮ সাল)। একদিন সভাকবি মধুশ্রবার ভূমিকায় নির্ধারিত শিল্পী অনুপস্থিত থাকলে নজরুল নিজেই উক্তভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নজরুল লিখেছেন,

"এই ধূলির ধরায় প্রেমভালবাসা—আলেয়ার আলো। সিক্তহৃদয়ের জলা-ভূমিতে এর জন্ম। ভ্রান্ত পথিককে পথ হ'তে পথান্তরে নিয়ে যাওয়াই এর ধর্ম। দুঃখী মানব এরই লেলিহান শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তিনটি পুরুষ, তিনটি নারী—চিরকালের নর-নারীর প্রতীক—এই আগুনে দগ্ধ হ'ল, তাই নিয়ে এই গীতি-নাট্য।

... ...

নারীর হৃদয়—তাদের ভালবাসা কুহেলিকাময়। এও এক আলেয়া। এ যে কখন্ কা'কে পথ ভোলায়, কখন কাকে চায়, তা চির-রহস্যের তিমিরে আচ্ছন্ন।

... ...

পুরুষও তেমনি হৃদয় হ'তে হৃদয়ান্তরে তার মানসীকে খুঁজে ফেরে। তাই তার কাছে আজকার সুন্দর, কাল হ'য়ে ওঠে বাসী। হৃদয়ের এই তীর্থ-পথে তার যাত্রার আর শেষ নেই। তাই সে এক মন্দিরে পূজা নিবেদন ক'রে আর মন্দিরের বেদীতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হৃদয়ের এই রহস্যই মানুষকে করেছে চির-রহস্যময়, পৃথিবীকে করেছে বিচিত্র-সুন্দর।

"আলেয়া" তারি ইঙ্গিত।"

তিনঅঙ্ক-বিশিষ্ট এই নাটকটি 'নট-রাজ্যের চির-নৃত্য-সাথী সকল নট-নটী'র নামে উৎসৃষ্ট।

'আলেয়া' বিশুদ্ধ গীতিনাট্য নয়, এটি গীতিপ্রধান নাটক। এটি বিদেশী অপেরার সঙ্গে তুলনীয়। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসের (১৯২৯) 'কল্লোলে'র সাহিত্যসংবাদে 'আলেয়া'র কথা উল্লিখিত হয়।

"নজরুল ইসলাম একখানি অপেরা লিখেছেন। প্রথমে তার নাম দিয়েছিলেন 'মরু-তৃষা'। সম্প্রতি তার নাম বদলে 'আলেয়া' নামকরণ হয়েছে। গীতিনাট্যখানি সম্ভবত মনোমোহনে অভিনীত হবে। এতে গান আছে ৩০ খানি। নাচে গানে অপরূপ হয়েই আশাকরি এ অপেরাখানি জনসাধারণের মন হরণ করবে।"

এ নাটকেরই নায়ক মীনকেতু রূপ-সুন্দর। তিনি 'যৌবনের রাজা'। তার পরাজয় হল মরুচারিণী মায়াবিনী যশল্মীরের অধীশ্বরী জয়ন্তীর কাছে। জয়ন্তী হচ্ছে 'যে-তেজে যে-শক্তিতে নারী রাণী হয়, নারীর সেই তেজ সেই শক্তি।' জয়ন্তী যখন মীনকেতুর রাজ্য আক্রমণ করলে, তখন মহিমা-সুন্দর ও ত্যাগ-সুন্দর সেনাপতি চন্দ্রকেতু তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। শেষে অমৃত-লক্ষ্মীস্বরূপা জয়ন্তীকে পণ রেখে তার শক্তি, লোভ, ক্ষুধা প্রভৃতি সবকিছুর প্রতিমূর্তি সেনাপতি উগ্রাদিত্যের সঙ্গে মীনকেতুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে উগ্রাদিত্য মারা গেল। তখন জয়ন্তীর কনিষ্ঠা সহোদরা চন্দ্রিকা এল। সে প্রতিজ্ঞা করলে যে সাবিত্রীর মত তপস্যা করে সে উগ্রাদিত্যকে বাঁচিয়ে তুলবে। এরপর মীন-কেতুকে নমস্কার করে জয়ন্তী বললে, "বন্ধু! নমস্কার! আমি তোমায় বন্দী করতে এসেছিলুম, হয়ত-বা বন্ধন নিতেও এসেছিলুম। কিন্তু সে বন্ধন আজ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ছিন্ন হ'য়ে গেল। উগ্রাদিত্যের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার হৃদয়ের সকল ক্ষুধা সকল লোভের অবসান হয়ে গেল! আমি আজ রিক্তা সন্ন্যাসিনী! (একটু থামিয়া) আমি এই সুদূর পৃথিবীতে সন্ন্যাসিনী হতে আসি নি! বধূ হবার, জননী হবার তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বেলে তোমাকে জয় করতে এসেছিলুম। তোমাকেও পেলুম, কিন্তু বুকের সে আগুন আমার নিভিয়ে দিয়ে গেল উগ্রাদিত্য।"

মীনকেতু বললে, "জয়ন্তী! তুমিও কি তবে ওকে ভালবাসতে? জয় করেও কি আমার পরাজয় হ'ল? উগ্রাদিত্য ম'রে হল জয়ী! যাকে পণ রেখে জয় করলুম—সে কি আপন হ'ল না?"

তখন জয়ন্তী উত্তর করলে, "কায়াহীন ভালবাসা নিয়ে যারা তৃপ্ত হয়, তুমি ত তাদের দলের নও মীনকেতু। তুমি চাও জয়ন্তীকে, এই মুহূর্তের রিক্তাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না। যে তেজ যে দীপ্তির জোরে তোমায় জয় করলুম—সেই ত ছিল উগ্রাদিত্য। তোমার হাতে তার পতন হ'য়ে গেছে! বন্ধু! বিদায়!"

এরপর যখন মীনকেতু জিজ্ঞেস করলে তাদের আর দেখা হবে কিনা, তখন জয়ন্তী বললে যে, সে আবার আসবে যদি উগ্রাদিত্য প্রাণ পায়।

এই গীতিপ্রধান নাটকে গানগুলির মধ্য দিয়ে নাটকীয় সংঘাতের অনেকখানি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। নাটকীয় ভাবধারার সঙ্গে অনেকগুলি গান (যেমন—'যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল্', 'বেসুর বীণার ব্যথার

সুরে বাঁধব গো', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'গহীন রাতে—ঘুম কে এলে ভাঙাতে' ইত্যাদি)-এর সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু কতকগুলি গান (যেমন —'এসেছে নব্‌নে বুড়ো যৌবনেরি রাজ-সভাতে', 'খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি' ইত্যাদি) সচেতন উদ্দেশ্যের আভাসজড়িত বলে গীতি-ধর্মের সত্যকার অনিবার্যতা থেকে বঞ্চিত।

'আলেয়া'র মধ্যে রূপক-সাংকেতিক নাট্যরীতি-প্রয়োগের কতকটা চেষ্টা দেখা যায়। তবে রূপক-সাংকেতিক নাটকের মত প্রতি কথায় ও গানে যে দ্যুতি ও দীপ্তি ঝলসে ওঠা উচিত, অসীমের যে গভীর স্পন্দন ও আভাস কাম্য, তা এই নাটকে অনেকাংশে অনুপস্থিত। 'আলেয়া' কিসের ইঙ্গিত বা সংকেতের বাহক তার পরিচয় নাট্যকার গ্রন্থের যে ভূমিকায় দিয়েছেন তা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। রূপক-সাংকেতিক নাটকসুলভ মনোধর্মী গতিবেগ এই নাটকে খানিকটা থাকলেও বস্তুধর্মী গতিবেগের স্বল্পতা বিশেষভাবে পীড়াদায়ক।

এরিস্টটলের মতে উৎকৃষ্ট নাটকের পক্ষে কাহিনীর প্রয়োজন সর্বাধিক। চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা কাহিনীকেই তিনি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—

"In a play accordingly they do not act in order to portray the Characters; they include the Characters for the sake of the action."[১]

কিন্তু এরিস্টটলের পরবর্তীকালে স্টল প্রভৃতি কেউ কেউ তাঁর মতের সমর্থক হলেও অনেক নাট্যসমালোচকই কাহিনীর চেয়ে চরিত্র-চিত্রণের উপর বেশী মূল্য আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে কাহিনী, ঘটনাসমাবেশ, পরিস্থিতিসৃষ্টি প্রভৃতি সব কিছুর মূল্যই চরিত্রচিত্রণের উৎকর্ষ-বিচারের দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিকলের মতে 'a penetrating and illuminating power of characterisation'-ই হচ্ছে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান মাপ-কাঠি। হেনরী আর্থার জোনস তো খোলাখুলিভাবে মন্তব্য করেছেন,

"Story and incident and situation in theatrical work are, unless related to character, comparatively childish and unintellectual."

---

১ Aristotle: On the Art of Poetry (Translated by Ingram Bywater) Reprinted: London 1954: p. 37

হাডসনও এই মতের সমর্থক। তাঁর ধারণায় 'Characteristaion is really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work."[১]

কিন্তু ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে একটি শ্রেষ্ঠ নাটকের পক্ষে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ এই উভয়েরই বিশেষ মূল্য আছে, তবে নাটকের প্রয়োজনানুসারে এই দুইয়ের কোন একটির উপর বেশী জোর পড়তে পারে।

কি কাহিনীবিন্যাস, কি চরিত্রচিত্রণ কোন দিক দিয়েই 'আলেয়া' কোন বিশেষ গৌরবের অধিকারী নয়। কাহিনীবয়ন ও চরিত্রাঙ্কনে বাস্তবধর্মিতার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। একমাত্র সভাকবি মধুশ্রবার চরিত্রটিই কিছু পরিমাণে জীবন্ত ও সার্থক।

সংলাপ নাটক-রচনার একটি অপরিহার্য উপকরণ। সংলাপ গীত, পদ্য বা গদ্য যে কোন রীতিতেই হতে পারে। তবে এই সংলাপ নাটকের ক্রিয়াকে যাতে অতিক্রম না করে যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। গীতিনাট্যের গানগুলি যদি নাটকীয় ক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করে, তবে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, নাটকের পক্ষে তাদের কোন মূল্যই নেই। যেহেতু নাটক বাস্তবপ্রতিম জীবনের রসরূপ, সেইহেতু এর সংলাপের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই উক্তিগত বাস্তবতার চাহিদা থাকে। এই গ্রন্থের সুরময় সংলাপ রচনার দিক দিয়ে নজরুল কতকটা কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। সংলাপের সাংগীতিকতা এই গীতিনাট্যের অনেক জায়গাতে নাটকীয় ক্রিয়ার পোষকতা করেছে। তাছাড়া সংলাপের মধ্যে বাস্তবিকতার চিহ্নও অনুপস্থিত নয়।

নাটক তত্ত্বপ্রধান ও রূপক-সাংকেতময় হলেও তাকে বাস্তবিক হয়ে উঠতে হবে। এই নাটকের চরিত্রগুলি কতকগুলো ভাব বা আইডিয়ার প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপের মধ্যে যে মানসিক দূরত্ব (Edward Bullough-এর ভাষায় 'Psychical Distance') বজায় রাখতে পারলে নাটক বাস্তবকল্প জীবনের রসরূপ হয়ে ওঠে, নজরুল এই নাটকে তা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেন নি ব'লে এটি দর্শকদের মনে অভীষ্ট রসনিষ্পত্তির ব্যাপারে অসমর্থ হয়েছে।

'মধুমালা' [রচনাকাল—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ সাল (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)] গীতিনাট্যটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে (বর্তমানে এই মঞ্চ গ্রেস

১ Hudson : An Introduction to the Study of Literature : p. 186

সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে) নাট্যভারতীয় উদ্যোগে অভিনীত হয়। নজরুল স্বয়ং এই গীতিনাট্যের গানে সুর সংযোগ করেন। গীতিনাট্যটি মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

'মধুমালা' তিনঅঙ্ক-বিশিষ্ট গীতিনাট্য। গীতিনাট্য বলে উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি গীতিবহুল নাটক। সন্দ্বীপের রাজকুমারী মধুমালা ও কাঞ্চননগরের যুবরাজ মদনকুমারের মিলন ও বিরহকে ভিত্তি করে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ঘুমপরী ও স্বপনপরীর কারসাজিতেই মদনকুমারের সঙ্গে মধুমালার সাক্ষাৎ, বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং পরে আবার মিলন ঘটেছে। কিন্তু শেষে যখন মিলন হল, তার পূর্বেই ত্রিপুরার রাজকুমারী কাঞ্চনমালার সঙ্গে মদনকুমারকে বাধ্য হয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হতে হয়েছে। মধুমালা ও মদনকুমারের মিলনলগ্নে কাঞ্চনমালার নাটকীয় উপস্থিতিতে একটি বিষণ্ণ-করুণ রাগিণী বেজে উঠেছে। কাঞ্চনমালা চাইলে তার স্বামীকে একটিবার মাত্র প্রণাম করে চিরদিনের মত বিদায় নিতে। কিন্তু মধুমালা তা হতে দিলে না। সে নিজের জীবনকে সাগরজলে বিসর্জন দিয়ে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালার মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটিয়ে গেল। সাগরজলে ঝাঁপ দেবার আগে সে কাঞ্চনমালা কর্তৃক পূর্বে কথিত কথারই প্রায় পুনরাবৃত্তি করলে,

"লক্ষ্মী উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে, বেদনার সিন্ধুমন্থনের শেষে আমি উঠেছি অশ্রুলক্ষ্মীরূপে। দিদি, তোমাদের অমৃতের সংসারকে আমি লবণাক্ত করতে চাই নে।"

মদনকুমার ও মধুমালার প্রেমকাহিনীকে বিয়োগান্তক করার উদ্দেশ্য স্বপনপরীকে বলা ঘুমপরীর একটি কথায় ব্যক্ত হয়েছে।

"বিরহের আগুনে পুড়ে ওদের প্রেমের সোনা খাঁটি হবে সই ;..."

'মধুমালা'র মধ্যে নাট্যকারের প্রেমতত্ত্বটি ভালভাবে পরিস্ফুট হয় নি। চরিত্র গুলিতে ঘাতপ্রতিঘাত স্বল্প। বস্তুত কোন চরিত্রই সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত নয়। বহুব্যবহৃত প্রেমের সেই eternal triangle সূত্রটি এখানে যান্ত্রিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থশেষে মধুমালার আত্মসবির্জনের ঘটনাটি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়ায় নাটকের মূল রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। ঘুমপরী ও স্বপনপরীর যে অলৌকিক কার্যকলাপ নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন তা যেমন অসংলগ্ন তেমনি নাট্যগত উদ্দেশ্যশূন্য। প্লটের কেন্দ্রগত ঐক্যহীনতা, ভাবাবেগের আতিশয্য এবং সর্বোপরি চরিত্র-

চিত্রণের দুর্বলতা 'মধুমালা' গীতিনাট্যটির মূল রসনিষ্পত্তির পরিপন্থী হয়েছে। তবে এই গীতিনাট্যের কয়েকটি গান উপভোগ্য। এই প্রসঙ্গে সেকেন্দর শা ফকিরের জারিগান 'এই কাঞ্চননগরের বাদ্‌শা নাম দণ্ডধর', মণিপুরী গান 'আমরা বনের পাখী বনের দেশে থাকি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'মধুমালা' নাটকে রূপকনাট্যের একটা আভাস পাওয়া যায়। মধুমালার আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে নজরুল তাঁর চিরন্তন প্রেমসমস্যা-সমধানের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। মধুমালার ভিতরেই নাট্যকালের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপে অভীপ্সিত বাস্তবিকতা না থাকাতে নাটকটি বাঞ্ছিত মাত্রায় সফল হতে পারে নি।

নজরুল ইস্‌লামের প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য। 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তাঁর যে সব প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখা দিয়েছিল, তাদেরই কতকগুলি সামান্য পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আকারে স্থান পেয়েছে 'যুগবাণী', 'রুদ্রমঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থগুলিতে। এসব ছাড়াও অবশ্য তাঁর একাধিক প্রবন্ধ আছে।

নজরুলের প্রবন্ধগুলি মননশীলতার অভাবহেতু অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ এবং উপমা উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে কণ্টকিত। তবে তাঁর ভাষার পৌরুষ ও অকৃত্রিম ভাবাবেগে অনেকস্থলেই চমকৃত হতে হয়। অনেক প্রবন্ধ সংবাদপত্রের তাগাদা মেটানোর জন্যে রচিত ব'লে সময়াভাবে অযত্নবিন্যস্ত। তাঁর ভাষার পৌরুষ অনেক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের গদ্যরচনাকে মনে না করিয়ে দিয়ে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের রচনায় তাঁদের অন্তর-পুরুষের যে বহিঃপ্রকাশ ও সারস্বত-সত্তার যে ছায়াপাত ঘটেছে, নজরুলের ক্ষেত্রে তা বহু জায়গাতেই অনুপস্থিত। নজরুলের কোন কোন রচনা অবাঞ্ছিতমাত্রায় প্রচারমূলক। এ সব সত্ত্বেও নজরুলের কয়েকটি রচনা তাঁর ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনসমালোচনার জন্যে মূল্যবান। তাই এক বিশেষ ধরনের আবেগ ও পৌরুষসমন্বিত গদ্যপ্রণয়নে তাঁর স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

গদ্যরচনায় নজরুল যাঁদের সমধর্মী তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১

১৯০৭)। 'ধূমকেতু'তে লিখিত নজরুলের প্রবন্ধাবলী অনেক জায়গায় 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের রচনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং মানুষের প্রতি অবিচল ভালবাসা ও বিশ্বাস সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ব্রহ্মবান্ধবের রচনাকে আঙ্গিকশৈথিল্য ও প্রকরণউদাসীনতা সত্ত্বেও যে প্রাণস্পর্শী আবেদনে ঐশ্বর্যশালী করছে, নজরুলের রচনাতেও তার উপস্থিতি বিরল নয়। নজরুলের রচনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি মননশীলতার স্বল্পতা এবং শিল্পসৌষ্ঠব সম্পর্কে আবেগপ্রাবল্যজনিত উদাসীনতা ও অসতর্কতা। তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠগুণ যৌবনধর্ম, অন্তর্মুখী ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা ও কাব্যধর্মী ওজস্বিতা। কোন কোন রচনায় তার বাস্তবঅভিজ্ঞতার সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাদর্শের বিবাহ-বন্ধনে অসামান্য শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত। প্রধানত সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে রচিত হলেও নজরুলের কতকগুলি প্রবন্ধ যে সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়ে আজও টিকে আছে তাতে অবশ্যই তাদের সাহিত্য-গুণের অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, রবার্ট লিণ্ড বলেছেন,

"Literature that does not last is journalism. Journalism that lasts is literature."

'যুগবাণী'র প্রকাশ কাল ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে (১৯২২)। 'যুগবাণী'র প্রথম প্রবন্ধে 'নবযুগে'-এ নজরুল বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে শহীদ ভাইদের বিয়োগব্যথায় অস্থির হ'য়ে তিনি আহ্বান করেছেন তাদের আত্মত্যাগের পথে নবযুগের মুক্তি ও বিশ্ব-সৌহার্দ্যের উদ্বোধন করতে।

"এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বুদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সঙ্কীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান ঐ শ্মশানভূমিতে—শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। ঐ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না!"[১]

[১] নবযুগ : যুগবাণী

এ দেশে সাম্যবাদী ধারণায় যাঁরা প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। তাঁর সাম্যবাদ মার্কস্‌বাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে জন্মলাভ করে নি। তাঁর সাম্যবাদ যতটা আবেগোচ্ছল ও কল্পনারঞ্জিত ততটা যুক্তি ও বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাম্যবাদের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রমশক্তির উপর নজরুল প্রচণ্ডভাবে আস্থাশীল। তিনি অনুভব করেছেন যে শ্রমজীবীদের জাগরণ রোধ করবার সাধ্য ধনিক সভ্যতার আর নেই।

"সুতরাং শ্রমজীবীদলের ও সেইসঙ্গে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ডিমোক্র্যাসীর জাগরণও এদেশে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে। এ ধর্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।"[১]

পূর্বে অনেকস্থলে উল্লিখিত হয়েছে যে নজরুল বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতেন। তাই ভারতের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী তিলকের প্রতি তাঁর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিলকের মৃত্যু তাঁর কাছে বড় ভাইয়ের বিয়োগব্যথার মতই শোকাবহ।

"...ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবী তটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই! নহিলে এ ভগ্ন-সৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই! আজ বড় ভাইকে হারাইয়া, এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি!"[২]

'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় বলে এটি খুবই মূল্যবান। নজরুল-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ প্রাণবন্ত প্রবলতা, জড়তাশূন্য ও স্বভাবপ্রণোদিত গতি এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষাজনিত বিদ্রোহ। তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের ধারণাতেও এই লক্ষণগুলি পরিস্ফুট।

"এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্নার মত ঢেউ-ভরা চপলতা ও সহজমুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই,

১ ধর্মঘট : যুগবাণী

২ লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য : যুগবাণী

সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়।"[১]

রবীন্দ্রসাহিত্যসম্পর্কে নজরুলের ধারণা লক্ষণীয়।

'ছুতমার্গ' প্রবন্ধে নজরুলের সামাজিক জ্ঞানের পরিচয় অঙ্কুরিত হয়েছে। ছুতমার্গ যে আমাদের সামাজিক উন্নতির অন্তরায় একথা নজরুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

"আমরা বলি কি, সর্বপ্রথমে আমাদের মধ্য হইতে এই ছুতমার্গটাকে দূর কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিনে সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে।"[২]

এই সব আলোচনায় নজরুল নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর ভাবে ভাবিত।

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

"আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমাদেরও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।"[৩]

এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে 'গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ', 'আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন?', 'কালা আদমীকে গুলি মারা', 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি', 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'রুদ্র-মঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রবন্ধগ্রন্থদ্বয়ে নজরুলের কবিসত্তার বিদ্রোহীরূপই প্রকটিত। অধিকাংশ রচনায় সন্ত্রাসবাদ, হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও জাতীয় জাগরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধের বিষয় নজরুলের সাংবাদিকতাসম্পর্কিত আলোচনায় উদ্ধৃত হবে। তাই গ্রন্থদ্বয়ের

---

১ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান : যুগবাণী
২ ছুতমার্গ : যুগবাণী
৩ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন : যুগবাণী

মূল সুরটি ও রচনার গঠনতন্ত্র বোঝানোর জন্য 'রুদ্র-মঙ্গল' থেকে একটি উদ্ধৃতি চয়ন করে দেওয়া গেল।

"জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্র তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উল্‌টে ফেলুক! আন তোমার হাতুড়ি, ভাঙ ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধূলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে-লাল ঝাণ্ডা!"[১]

এইসব প্রবন্ধের বাস্তববোধনিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা, স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের প্রাবল্য ও গভীর মানবপ্রেম রচনাশৈলীর ত্রুটি ও উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতা সত্ত্বেও পাঠকের মনকে দুরন্তভাবে আকর্ষণ করে ও নাড়া দেয়। বস্তুত এই সব রচনা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা উদ্দীপনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা করতে এরা অনেক পরিমাণেই সফল হয়েছিল—এ কথা মনে রাখলে এগুলির কতকটা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

১ রুদ্র-মঙ্গল ঃ রুদ্র-মঙ্গল

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুলের সাংবাদিকতা

সংবাদপত্র দেশের জনসমাজের ভাবনাচিন্তা, বিশেষ করে রাজনৈতিক মতামতের শুধু অন্যতম প্রতিনিধি নয়, অনেকক্ষেত্রে তাদের প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রকও। এই জন্যে নিউজ পেপার প্রেস্‌কে ফোর্থ এস্‌টেট (Fourth Estate) বলা হয়। স্বাধীন প্রেস দেশের নবজাগরণের শক্তিশালী বাহক।

জন মিল্টনও মানুষের আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানান তাঁর বিখ্যাত Areopagitica-তে। ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথম স্বাধীনতার বাণী সার্থকভাবে ঘোষণা করেন। তাঁর 'Memorial to the Supreme Court' (1823) ও 'Appeal to the King in Council' (1825)-কে 'the Areopagitica of Indian History' বলা হয়।

অধীন দেশে প্রেসের পক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ভোগ করা অসম্ভব। জনসমাজের ভাবনাচিন্তা ও মতামতের নির্ভীক প্রতিনিধিত্ব করবার পথে অনেক সময় সংবাদপত্রকে রাজরোষের কবলে পড়তে হয়। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসেও রাজশক্তির দিক দিয়ে বহুবার সুকঠিন হস্তক্ষেপের কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত মেলে। যে সব সংবাদপত্র শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপোস করে চলে তাদের ভাগ্যে আর্থিক ও অন্যবিধ উন্নতি জুটলেও তারা বহুসময় জনসমাজের প্রতি তাদের পবিত্র কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়। কি কবিতায়, কি গানে, নজরুল যেমন তার মনোভাবকে অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে ভয় পান নি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি জনসাধারণের সার্থক প্রতিনিধি হিসেবে অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে গেছেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিদেশী শাসকের কারাগারে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। এতৎসত্ত্বেও নজরুল শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কখনও রফা করেন নি। তাঁর সাংবাদিকজীবন অবিচ্ছিন্ন অনমনীয় ও আপোসহীন সংগ্রামের এক উজ্জ্বল ইতিহাস।

বাংলা ভাষায় বাঙালী-পরিচালিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর' (প্রথম প্রকাশ—১৪ই জুন, ১৮৩৯ সাল)। এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 'সংবাদ প্রভাকর' নানাভাবে দেশের সাহিত্য শিক্ষা ইত্যাদির পুনর্গঠনের সহায়তা করলেও তদানীন্তন রাজনৈতিক চেতনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রাখতে পারে নি। রাজনৈতিক চেতনার প্রথম দ্রষ্টব্য স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণ হয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' (প্রথম প্রকাশ—১৫ই নবেম্বর ১৮৫৮ সাল) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' (প্রথম প্রকাশ—১৮৮২) শীর্ষক সাপ্তাহিক পত্রিকা এক সময় বাংলাদেশের প্রগতিশীল জনসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে খ্যাতিলাভ করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনা-উদ্দীপনের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পত্রপত্রিবার ভূমিকা উপেক্ষণীয় না হলেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নজরুলের প্রকৃত পূর্বসূরীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বিপিনচন্দ্র পাল (সম্পাদক—ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া') ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [সম্পাদক—সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা' (প্রথম প্রকাশ—১৯০৪ সাল)]। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে সন্ত্রাসবাদীদের মুখপাত্ররূপে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' (প্রথম সম্পাদক—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত) আত্মপ্রকাশ করে। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধবকে অভিযুক্ত করা হয়। ব্রহ্মবান্ধব বিদেশী শাসকের বিচারে দাঁড়াতে অস্বীকৃত হন এবং কারাগারের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় 'বসুমতী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র বের হয়। এরপর নজরুল সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক দুঃসাহসিক অধ্যায়ের যোজনা করেন। তৎসম্পাদিত 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু'র আবির্ভাবে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য নেতা মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক ৬নং টার্নার স্ট্রীট (পূর্বনাম তাম্বুলি লেন) থেকে 'নবযুগ' নামে একখানি সান্ধ্য দৈনিক (রয়াল সাইজ—২০"×২৬") প্রকাশ করেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলাম 'নবযুগে'র যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ফজলুল হকের ভয় ছিল যে, সম্পাদকদ্বয় মুসলমানের ছেলে বলে হয়তো ভাল বাংলা লিখতে পারবেন না। তাই তিনি প্রথম অবস্থায় কিছুদিন তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

লেখক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু টাকা দিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাঁচকড়িবাবুর কোন নিজস্ব মতামত থাকার মত অবিচল ব্যক্তিত্ব ছিল না। টাকার বিনিময়ে তাঁকে দিয়ে যা খুশি লিখিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হত। তাই সম্পাদকদ্বয় পাচকড়িবাবুকে দিয়ে সম্পাদকীয় লেখানোর ব্যাপারে কিছুতেই রাজী হন নি। 'নবযুগ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাগজটি অভাবিত রকমের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষ 'নবযুগে'র চাহিদা মেটাতে পারতেন না, কেননা ফজলুল হকের ছাপাখানার মেশিনটি ছিল পঙ্গু। 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত লেখার উৎকর্ষ সম্পর্কে হকসাহেব তাঁর অনেক হিন্দু বন্ধুদের কাছ থেকেও অভিনন্দন পান। কলকাতা হাইকোর্টের একজন জজ পর্যন্ত হকসাহেবের কাছে তাঁর কাগজের প্রশংসা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'নবযুগে'র অগ্নিবর্ষী রচনাবলী দেশের প্রায় সমগ্র ইতর ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফজলুল হক তখন বেশ বুঝতে পারেন যে, যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই পত্রিকার ভার অর্পণ করা হয়েছে।

'নবযুগ'-এ কাজ করার সময়ে নজরুলের মধ্যে কবি ও স্বাধীনতার সৈনিক এই দুই সত্তার আশ্চর্য ও দুর্লভ মিলন ঘটে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলের সাংবাদিক-প্রতিভা সম্বন্ধে স্পষ্টই লিখেছেন,

"এ কথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই "নবযুগ" জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখার বললে সব কিছু বলা হলো না, নজরুলের লেখা হেডিংগুলি হতো অতুলনীয়। রয়াল সাইজের কাগজ— কতটুকুই বা স্থান। তাই নজরুল সফলতার সহিত বড় বড় খবরগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত খবরে পরিণত করত। আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই কী করে নজরুল আয়ত্ত করেছিল এই ক্ষমতা! তার আগে তো সে কোনদিন কোন দৈনিক কাগজের অফিসে প্রবেশও করে নি।"[১]

এই সময় নজরুলের কয়েকটি কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিখ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। নজরুলের সাংবাদিক-প্রতিভাও অচিরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। এই সময় রবীন্দ্র-প্রতিভা তার মধ্যগগনে। রবীন্দ্রভক্ত তরুণ বয়স্ক নজরুল শুধু যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন

১ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ : কবি নজরুল ইস্‌লাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা (বিংশশতাব্দী শারদীয় আশ্বিন ১৩৮০ : পৃ ৩১৪)

ও তাঁর গান গাইতেন, তাই নয়; এমন কি তিনি 'নবযুগে'র হেডিং-এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কবিতার পংক্তি-বিশেষ (যেমন, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরান সখা বন্ধু হে আমার' ইত্যাদি) ব্যবহার করতেন। পূর্বেই বলেছি, 'নবযুগে'র সম্পাদকদ্বয় যুগোচিত রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা কৃষক-মজুরদের দাবিও জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এর ফলে শীঘ্রই 'নবযুগ' রাজরোষে পড়ে এবং তার জামিনের এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তখন তাঁরা দুহাজার টাকা জমা দিয়ে আবার কাগজ বার করেন। এই সময় পত্রিকার মত ও পথ নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্য উপস্থিত হলে নজরুল 'নবযুগে'র কাজে ইস্তফা দিয়ে দেওঘরে চলে যান। মুজফ্ফর আহ্মদ অবশ্য আরও কিছুদিন টিকে থাকেন। পরে তিনিও কাজ ছেড়ে দেওয়াতে কাগজ বন্ধ হয়ে যায়।

'নবযুগে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নজরুলের যে সব বহ্নিদীপ্ত ও আবেগোচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ জনসমক্ষে দেখা দেয়, তাদের মধ্য থেকেই কতকগুলি নির্বাচন ক'রে 'যুগবাণী' (১৯২২) শীর্ষক প্রবন্ধপুস্তক প্রকাশ করা হয়। রাজদ্রোহের অভিযোগে এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে নজরুলের কবিসুলভ আবেগ ও দীপ্তির পরিচয় বর্তমান। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণ করবার শক্তি কাম্য, তার স্বাক্ষর এইসব রচনায় অনেকস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও ভাবাবেগের দুরন্ত প্রাবল্যে এগুলি যে খুবই মর্মস্পর্শী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুত সকল কাজেই নজরুলের কবিসত্তাই প্রধান হ'য়ে উঠত। পূর্বেই বলেছি—রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি থেকে 'নবযুগে'র হেডিং রচনা করে নজরুল কাব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এইসব অদ্ভুত হেডিং-এর অভিনবত্বে কে না আকৃষ্ট হবেন?

১॥ "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা ফৈসুল হে আমার!"

২॥ "কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দমধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো, এমন ডিনার খাওয়া।"

কৃষক মজুর প্রভৃতি উপেক্ষিত জনসমাজের প্রতি নজরুলের যে অসাধারণ মমত্ববোধ ও তাদের শক্তির উপর তাঁর যে গভীর ও অবিচল আস্থা ছিল,

তার পরিচয় ‘নবযুগে’ প্রকাশিত ‘ধর্মঘট’, ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রভৃতি প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

১৯২২ সালের প্রথম দিকে কুমিল্লায় থাকাকালীন নজরুল কলকাতার দৈনিক ‘সেবকে’র কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একখানা পত্র পান। এই পত্রে কলকাতায় এসে দৈনিক ‘সেবক’-এ লেখা শুরু করার জন্যে তিনি অনুরুদ্ধ হন। দৈনিক ‘সেবক’ ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরাম্ খানের কাগজ। সেই সময় আকরাম্ খান কারারুদ্ধ ছিলেন। নজরুল কলকাতায় এসে কিছুদিনের জন্যে দৈনিক ‘সেবকে’র সঙ্গে যুক্ত হন।

নজরুলের সাংবাদিক-প্রতিভার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য স্ফুরণ ঘটেছে তৎসম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রে। ১৯২২ সালের ১২ই অগস্ট (শ্রাবণ ১৩২৯) তারিখে ‘হপ্তায় দু’বার দেখা দেবে’ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ‘ধূমকেতু’ (সাইজ—ক্রাউন ফলিও ১৫″ × ১০″। পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য একআনা এবং বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা) আত্মপ্রকাশ করে। ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ। কাগজের প্রকাশক-মুদ্রাকর ও কর্মসচিব হন যথাক্রমে আফজাল্-উল হক্ ও শান্তিপদ সিংহ। প্রথমে কাগজের অফিস ছিল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, পরে তা স্থানান্তরিত হয় সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনের বাড়ির দোতালায়।

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অচলায়তনকে ভেঙেচুরে নূতন যুগচেতনায় দেশবাসীদের উদ্বুদ্ধ করার পবিত্র সংকল্প নিয়ে ‘ধূমকেতু’র সারথিরূপে মূর্তবিদ্রোহ নজরুল আবির্ভূত হন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পৃষ্ঠার শীর্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, নজরুলের অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ওরফে ‘ত্রিশূলে’র রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রভৃতি নিয়ে যেদিন ‘ধূমকেতু’ উদিত হয়, সেদিন সারা শহরে যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়, তা অভাবনীয়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দু’হাজার কাগজ বিক্রি হয়ে যায়। শীঘ্রই ‘ধূমকেতু’ অচিন্তিতপূর্ব জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করে।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ‘ধূমকেতু’র অসাধারণ জনপ্রিয়তার একটি হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি এই প্রসঙ্গে চয়নীয়।

“বিক্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দাদন দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে ‘ধূম-

কেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হস্টেলে, রোয়াকে, বৈঠকখানায়, তার পরদিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে—'ধূমকেতু'। জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি এমন করে ধাক্কা মেরে চলে 'ধূমকেতু' যে রাজশক্তি প্রমাদ গনে।

'ধূমকেতু'র আড্ডায় সারাদিন লোকের পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ-বা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাঁড়ে ক'রে চা সবার জন্যে তৈরী।"[১]

'ধূমকেতু' সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতিচিত্রও আকর্ষণীয়।

"সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলে"র আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা"তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।"[২]

'নবযুগ' চালাবার সময় প্রধানত মেহনতী জনসমাজের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। 'ধূমকেতু'তে তাঁর লক্ষ্য ছিল মুখ্যত মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ। অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চাপা পড়ে যায়, 'ধূমকেতু'তে নজরুল তাকেই আহ্বান করেন দেশের মুক্তির উপায় রূপে। প্রাণের প্রবলতা ঘোষণা এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীদের সচেতন করার কঠিন দায়িত্ব নেয় 'ধূমকেতু'। দেশের দিকে দিকে তখন সন্ত্রাসবাদ তার বিভীষিকাময় পক্ষ বিস্তার করেছে। 'ধূমকেতু' এই সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে তার অগ্নিঝরা পুচ্ছ-তাড়নায় ও ভাঙনের জয়গানে গতানুগতিক জীবনের শান্তিপূর্ণ ছায়ায় যারা পরম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত

---

১ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : ধূমকেতুর নজরুল (কবি নজরুল : পৃ ৩৬-৭)

২ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : পৃ ৪৬-৭

করছিল তাদের অকল্যাণ ঘোষণা করে বিপ্লবের ধ্বজা উড়িয়ে দেয়। 'ধূমকেতু'র সঙ্গে যাঁরা সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ভূপতি মজুমদার, বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, মঈনুদ্দীন হোসেন, নলিনীকান্ত সরকার, মঈনুদ্দীন খান প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ঝিমিয়ে-পড়া ও নৈরাশ্যপীড়িত সন্ত্রাস-বাদীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে 'ধূমকেতু' যে দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে 'ধূমকেতু' 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তি'কে ছাড়িয়ে যায়। স্থলবিশেষে বলেছি যে, নজরুলের কল্পনাপ্রবণ কবিচিত্ত সন্ত্রাসবাদের উদ্দীপনাময় আহ্বানে সহজেই সাড়া দিত। গোপীনাথ সাহা প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীরা উৎসাহ ও প্রেরণা লাভের জন্যে আসত 'ধূমকেতু'র অফিসে।

'ধূমকেতু'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে নজরুল প্রথম সংখ্যায় জানিয়েছিলেন,

"'মাভৈঃ' বাণীর ভরসা নিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধূমকেতু'কে রথ ক'রে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার করছি আমার সত্যকে। ......দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামি, মেকি তা সব দূর ক'রতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী! ...'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।"

'ধূমকেতু'র পথ যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পথ, এ কথা অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণা করতে নজরুল এতটুকু বিচলিত হন নি। ১৩২৯ সালের ২৬শে আশ্বিন (১৯২২) তারিখের 'ধূমকেতু'তে তিনি লেখেন, "সর্ব প্রথম "ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা চায়।"

'ধূমকেতু'র মধ্য দিয়ে কবির বিদ্রোহীসত্তার প্রকাশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনের পর দিন তিনি যেমন সমাজের জড়তা ও অন্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রবলভাবে আঘাত হেনেছেন, তেমনি বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের উদ্বোধনার্থে অগ্নিগর্ভ বাণী প্রচার করেছেন। 'ধূমকেতু' নারীদের নানা সমস্যা আলোচনা করে তাদের জাগরণেরও চেষ্টা করত। এর সন্ধ্যা-প্রদীপ বিভাগে থাকত শুধু মেয়েদেরই রচনা। 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের রচয়িত্রী

মিসেস্ এম. রহমানের লেখা প্রায়ই প্রকাশিত হত 'ধূমকেতু'তে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'ত্রিশূল' ছদ্মনামে 'ধূমকেতু'তে লিখতেন। ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবরের 'ধূমকেতু'তে 'দ্বৈপায়নের পত্র' শিরোনামায় 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে মুজফ্ফর আহ্মদের একটি পত্র বের হয়। 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত 'ধূমকেতু' কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নজরুল যে সব জ্বালাময়ী ও ওজস্বিনী রচনা লেখেন, সেগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি তাঁর 'রুদ্র-মঙ্গল' ও 'দুর্দিনের যাত্রী' পুস্তক দুটিতে সংগৃহীত হয়।

'ধূমকেতু'র সপ্তম সংখ্যা মোহর্‌রম সংখ্যারূপে ১৩২৯ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশ লাভ করে। এই সংখ্যায় নজরুল তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মোহর্‌রমের বেদনাদায়ক ঘটনার সঙ্গে এদেশীয় মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। 'ধূমকেতু'র অষ্টম সংখ্যায় (২৬শে ভাদ্র ১৩২৯ সাল) নজরুলের বহ্নিদীপ্ত প্রবন্ধ 'বিষ-বাণী' মুদ্রিত হয়।

"মাভৈঃ! মাভৈঃ!! ভয় নাই, ভয় নাই—ওগো আমার বিষ-মুখ অগ্নি-নাগ-নাগিনী পুঞ্জ! দোলা দাও, দোলা দাও তোমাদের কুটিল ফণায় ফণায়। তোমাদের যুগ-যুগ সঞ্চিত কালবিষ আপন আপন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ফেল। তোমাদের বিভূতি-বরন অঙ্গ কাঁচাবিষের গাঢ় সবুজরাগে রেঙে উঠুক। বিষ সঞ্চয় কর, বিষ সঞ্চয় কর—হে আমার তিক্ত-চিত ভুজগ তরুণ দল! তোমাদের ধর্‌বে কে? মার্‌বে কে?... ...

এস আমার মণি-হারা কালফণীর দল, তোমাদের প্রেমের কেতকী-কুঞ্জ ছেড়ে, অন্ধকার বিবর ত্যাগ করে। এস, মায়ের আমার শ্মশান-শায়িত আঘাত-জর্জরিত মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে। হয় মৃত-সঞ্জীবনী আন, নয় ভাল ক'রে চিতাগ্নি জ্বলে উঠুক। বল, মাভৈঃ! মাভৈঃ!! বল—

হর হর শঙ্কর—
বল,—জয় ভৈরব জয় শঙ্কর,
জয় জয় প্রলয়ঙ্কর!
শঙ্কর! শঙ্কর!!"

নজরুল 'ধূমকেতু'তে অনেকগুলি অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী একই দীপকরাগে বাঁধা। সেগুলির চরিত্র বোঝাবার পক্ষে দু একটি উদাহরণই যথেষ্ট। তাঁর লেখার

পৌরুষ বিবেকানন্দের উদাত্ত গম্ভীর রচনার আবেগ ও বলিষ্ঠতাকে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৩২৯ সালের ১৪ই কার্তিক তারিখের 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'আমি সৈনিক'-এ নজরুল লেখেন,

"এখন দেশে সেই সেবকের দরকার যে সেবক দেশ-সৈনিক হ'তে পারবে। ......রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাঙলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্যে বাঙলার চোখের জল চিরনিবেদিত থাকবে। কিন্তু সেনাপতি কই? সৈনিক কোথায়? কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র? সে পুরুষ এসেছিল বিবেকানন্দ, সে সেনাপতির পৌরুষ-হুঙ্কার গর্জে উঠেছিল বিবেকানন্দের কণ্ঠে।"

'ধূমকেতু'র ১৯শ সংখ্যায় (১৭ই কার্তিক ১৩২৯) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'নিশান-বরদার' [পতাকা-বাহী] আত্মপ্রকাশ করে।

"ওঠ ওগো আমার নির্জীব ঘুমন্ত পতাকা-বাহী বীর সৈনিকদল। ওঠ, তোমাদের ডাক পড়েছে—রণ-দুন্দুভি রণ-ভেরী বেজে উঠেছে। তোমার বিজয়-নিশান তুলে ধর। উড়িয়ে দাও উঁচু করে; তুলে দাও যাতে সে নিশান আকাশ ভেদ করে ওঠে। পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভুত্ব ঘোষণা করছে।......

আমাদের বিজয়-পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছাব না। বল আমরা সিংহশাবক, আমরা খুন দেখে ভয় করি না। আমরা খুন নিয়ে খেলা করি, খুন নিয়ে কাপড় ছোপাই, খুন দিয়ে নিশান রাঙাই। বল আমি আছি, আমি পুরুষোত্তম জয়। বল মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।"

'ধূমকেতু'র ২০শ সংখ্যায় (২১শে কার্তিক ১৩২৯) নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'ভিক্ষা দাও' পত্রস্থ হয়।

"ভিক্ষা দাও! ওগো পুরবাসী ভিক্ষা দাও। তোমাদের একটি সোনার ছেলে ভিক্ষা দাও।

আমাদের এমন একটি ছেলে দাও যে বলবে আমি ঘরের নই, আমি পরের। আমি আমার নই, আমি দেশের।......

তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নাই যে বলতে পারে আমি আছি; সব মরে গেলেও আমি বেঁচে আছি; যতক্ষণ আমার প্রাণে ক্ষীণ রক্তধারা বয়ে

যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা দেশের জন্যে পাত কোরব। ওগো তরুণ, ভিক্ষা দাও তোমার কাঁচা প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসেবে 'ধূমকেতু'র প্রবন্ধগুলি অতিমাত্রায় কাব্য-গুণান্বিত। এগুলিতে আবেগোচ্ছ্বাস যতটা, সেই পরিমাণে যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ নেই। তবে দেশের যৌবন-রক্তে এই সব দুঃসাহসী ও নির্ভীক প্রবন্ধ যে আবেগ ও উদ্দীপনার অগ্নি সঞ্চার করেছিল এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। পূর্বেই বলেছি যে, 'ধূমকেতু' মুষড়ে-পড়া সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে অনেক পরিমাণে উদ্দীপ্ত ও শক্তিশালী করে তুলেছিল। অনুশীলন ও যুগান্তর-পার্টির অনেক নেতা 'ধূমকেতু'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' ছাপা হওয়ার পরে অনুশীলনদলের অনেকে নজরুলের উপর বিশেষভাবে রাগান্বিত হন। উক্ত কবিতার এক জায়গায় আছে,

"বারি-ইন্দ্র-বরুণ আজি করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়ি-গঙ্গার পুলিন বুকে বাঁধছে ঘাঁটি দস্যু-রাজায়।"

অনুশীলন দলের অনেকে মনে করেন যে, উদ্ধৃতাংশে অনুশীলন দলের অন্যতম প্রবীন নেতা পুলিন দাসকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

'ধূমকেতু'র পুচ্ছতাড়নায় অস্থির হ'য়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার নজরুলের কণ্ঠরোধ করার ফিকির খুঁজতে থাকেন। নজরুল কিন্তু ভয়হীন চিত্তে অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ কবিতা হাস্যকৌতুক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একদিকে শাসকশ্রেণীর অত্যাচার অবিচার ও শোষণ এবং অপরদিকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের জড়তা দুর্নীতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর শক্তিশালী লেখনী চালনা করে যান। 'ধূমকেতু'র দীপালী সংখ্যায় নজরুলের 'ম্যয় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধ পড়ে বিদেশী সরকারের টনক নড়ে ওঠে। 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত অনেক রচনার জন্যেই নজরুলকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেত। কিন্তু শেষপর্যন্ত পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে'র জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ-মূলক মোকদ্দমা আনা হয়। বিচারে নজরুল এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি কোর্টে যা জবানবন্দী দেন তা শুধু একজন সত্যকার মানব-প্রেমিকের জীবনভাষ্যই নয়, তা উচ্চকোটির সাহিত্যরচনাও। 'ধূমকেতু'র ২১শ সংখ্যা (২৮শে কার্তিক, ১৩২৯) পর্যন্ত তার সারথি থাকেন নজরুল। নজরুলের কারাবরণের জন্যে ২২শ সংখ্যা (১লা অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) থেকে অমরেশ কাঞ্জিলালের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হতে থাকে।

সংবাদের শিরোনামা বা হেডিং রচনা ও সংবাদ সংক্ষেপ করার যে ক্ষমতা নজরুল 'নবযুগ' সম্পাদনা করার কালে দেখান, তারই পরিণত রূপ ব্যক্ত হয় 'ধূমকেতু'তে। সংবাদ-পরিবেষণে ও তার হেডিং-প্রণয়নে 'ধূমকেতু'তে নজরুলের আশ্চর্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। কড়ামিঠে টিপ্পনী ও মন্তব্যে এবং মাঝে মাঝে রঙ্গব্যঙ্গের ছোট ছোট কবিতা ও প্যারডির ব্যবহারে সংবাদগুলি হত যেমন উপভোগ্য, যেমনি প্রাণস্পর্শী। খবরগুলি প্রধানত বিভক্ত থাকত তিনটি ভাগে—দেশের খবর, পরদেশী পঞ্জী ও দেশের সংবাদ। সম্পাদকীয় নৈপুণ্যের পরিচয় হিসেবে কয়েকটি শিরোনামা, প্যারডি, ব্যঙ্গ-কবিতা ইত্যাদি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১৩২৯ সালের ২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখের 'ধূমকেতু' পত্রে দেশের খবর অংশের কয়েকটি শিরোনামা বা হেডিং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। দেশমান্য মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম স্থাপয়িতা ও সম্পাদক)-এর মৃত্যুসংবাদের শিরোনামা, 'মর্ত্যের মতিলাল স্বর্গে'; বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভুক্ত কয়েক ব্যক্তির গবর্নমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগের চর বলে ধরা পড়ার সংবাদের শিরোনামা, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ঘর-শত্রু বিভীষণ'; মুলসী সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ নূতন করে আরম্ভ হওয়ার খবরের হেডিং 'দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ'; তেলিনীপাড়া ও মুলতানে মহর্‌রম নিয়ে একটু মারামারি হওয়ার সংবাদের শিরোনামা, 'মহর্‌রম নিয়ে দহরম মহরম'; গুরুকা বাগ সরজমিনে গিয়ে তদন্ত করার সংবাদের শিরোনামা, 'নখদন্তহীন তদন্ত'; হেনজাদা জেলাতে ১৬১ বৎসরের রমণীর অটুট যৌবন থাকার সংবাদের শিরোনামা, 'আটকুড়ি বয়সের যুবতী' ইত্যাদি।

পরদেশী পঞ্জীর মধ্যে বার্লিনে কমিউনিস্ট মিছিল বের হওয়ায় পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের হাঙ্গামার সংবাদের শিরোনামা, 'পুলিশে কুলিশে'।

মুসলিম জাহান অংশে তুর্কীর স্মার্ণা দখলের সংবাদের শিরোনামা, 'কিল্লাফতে'।

পূর্বেই বলেছি—সংবাদের মধ্যে ব্যঙ্গকবিতা বা প্যারডিগুলি সংবাদকে সরস অথচ তীব্র করত। দেশের সংবাদ স্তম্ভে বহুদিন ওকালতি স্থগিত রাখার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সরদার মাহতাব সিংহের মামলা নিয়ে আদালতে হাজির হওয়ার সংবাদের শেষে লেখা প্যারডিটি অত্যন্ত চিত্তহারী।

"দেশ দেশ গণ্ডিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত উকীলবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
যতীন আগত ঐ
জয়কারাগত ঐ
মদনমোহন কই।
সে কি রহিল চুপটি আজকে সবজন
পশ্চাতে,
লউক ধুচুনি শাম্‌লা ভার সব জনার
সাথে।"

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের চাকরি থেকে সার্‌ আলী ইমাম ইস্তফা দিয়েছেন—এই সংবাদের সমাপ্তিতে কবিতা—

"যখন পিরীতি ছিল
তখন বেসেছে ভাল
আগে শুয়েছি তেঁতুলপাতে
কুলায় না আর মানপাতে।"

পরদেশী পঞ্জীর সংবাদগুলিও বিচিত্র। জাগালুন পাশার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে বলে তাঁকে সিসিলিস থেকে জিব্রালটারে আনা হয়েছে। বেগম স্বামীর কাছে যাওয়ার হুকুম পেয়েছেন। এই উপলক্ষে লেখা কবিতা—

"ঠ্যালা নাম গাও রে খাঁচার পাখি!
ও ঠ্যালায় বদন মেলে ডাকি।
ও ঠ্যালায় জলে ভাসে শিলে,
ঠ্যালার মত ঠ্যালা দিলে
গুঁতো কেষ্ট কেত্তন গাবে
লঙ্কাপারের বাঁদর মিলে
(ওরে) দেখবে এবার সর্ষে প্রসূন
যত খটাস আঁখি।
ঠ্যালা নাম গাও রে খাঁচার পাখি।"

মুস্‌লিম জাহান স্তম্ভে মোস্তফা কামাল পাশার গ্রীক যুদ্ধে জয়লাভ করার সংবাদের শিরোনামাটি আকর্ষণীয়।

"সাবাস কামাল মোস্তফা!
তোরেই দেখছি মোচ তোফা!
খুব কষে ভাই গোস্ত খা!
বাঁধ্ জালিমের হস্ত পা।"

'ধূমকেতু'র নবম সংখ্যায় (২৯শে ভাদ্র ১৩২৯) দেশের খবর বিভাগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদের শিরোনামা, 'বাউল কবির টহল'।

১২শ সংখ্যায় (৯ই আশ্বিন, ১৩২৯) দেশের খবর অংশে সার্ জন কার-এর গবর্নর হওয়ার সংবাদের হেডিং, 'গোবর-নর প্রসবিনী বঙ্গমাতা'।

'ধূমকেতু'র ২০শ সংখ্যায় পরদেশী পক্ষী বিভাগের সংবাদে লেখা হয়—শান্তিমণি মিঃ লয়েড জর্জের খুব সাদ ও গলার বেদনা হলে ডাক্তারেরা বলেন যে, অতিরিক্ত গলাবাজি করেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর উপর কাব্যটিপ্পনী,

"কাড়া দিয়ে ফল হল না
লাভের বেলায় ভাঙ্গল ঢাক!"

সংবাদের শিরোনামা, 'পেত্নীর ঘাড়ে ভূত'।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, নজরুলের নিউজ সেন্স বেশ লক্ষণীয় মাত্রাতেই ছিল। বাংলা ভাষায় সংবাদ পরিবেষণের ক্ষেত্রে 'ধূমকেতু' যে একটি সরস অথচ তীক্ষ্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। সংবাদিক জীবনের নিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান, নির্ভীকতা ইত্যাদি সদগুণের দুর্লভ সমাবেশ ঘটেছিল নজরুলের মধ্যে। তবে তাঁর কবিসুলভ আবেগ উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা যে তাঁর সাংবাদিকসুলভ বিচার-বিশ্লেষণ-শক্তিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, একথা তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি পড়লেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এতে তাঁর রচনার মূল্য নিঃশেষিত হয় না। তিনি প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে বিপ্লববাদের বহ্নি দেশের যৌবনরক্তে জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন এবং সেদিক দিয়ে তিনি অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছিলেন, একথা আর না বললেও চলে।

১৯২৫ সালের শেষাশেষি লেবর স্বরাজ পার্টি গঠিত হওয়ার পর 'লাঙল' নামে পার্টির যন্ত্রস্বরূপ একটি সাপ্তাহিক কাগজের আবির্ভাব ঘটে। এর প্রধান পরিচালক ও সম্পাদক হন যথাক্রমে কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর পল্টনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। মণিভূষণ নামে সম্পাদক হলেও

প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার কোন কাজই করতেন না। ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। এই সংখ্যায় নজরুলের অন্যতম প্রধান কবিকৃতি 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধলে 'লাঙল' সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করায় 'লাঙলে'র প্রচার হ্রাস পায়।

পূর্বেই বলেছি—'লাঙলের' কতকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এর নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' রাখা স্থির হয়। মণিভূষণ সম্পাদক থাকতে অনিচ্ছুক হলে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিকদলের সভ্য গঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পাদক-পদে বৃত হন। ১৯২৬ সালের ১২ই অগস্ট তারিখে 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নজরুল খুবই বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হন। তিনি এই দাঙ্গার আত্মঘাতী ও বিষময় ফলের উপর কয়েকটি জোরালো প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩৩৩ সালের ৯ই ভাদ্র (২৬শে অগস্ট ১৯২৬) তারিখের 'গণবাণী'তে তাঁর বহুখ্যাত 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধ প্রকাশ লাভ করে। প্রবন্ধটি নজরুলের 'রুদ্র-মঙ্গল' প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

" "মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের!" আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা-ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর "প্রেষ্টিজ" রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া একভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—"বাবা গো, মাগো!" মাতৃপরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!"

এদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে নজরুলের ভূমিকা বিস্মৃত হবার মত নয়। জনজাগরণের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার সূত্রে রচিত তাঁর অগ্নি-ক্ষরা রচনাবলী এক বিশেষ ঐতিহাসিকমূল্যে ঐশ্বর্যশালী।

পঞ্চম অধ্যায়

গীতিকার ও সুরকার নজরুল

নজরুল-প্রতিভা কাব্যে সমধিক স্ফূর্তি পেলেও তার সবচেয়ে বেশী প্রকাশ ঘটেছে সংগীতে। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলেই দেখা যায় যে, নজরুল-প্রতিভা প্রধানত সংগীতমূলক। কাব্য ও সংগীত এই উভয় ক্ষেত্রেই যে নজরুল-প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছে এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। কেননা, কাব্যের সঙ্গে সংগীতের আন্তরিক যোগাযোগ বিজ্ঞজনস্বীকৃত। কবির সৃষ্টিশীল ভাবাবেগের বাণীমূর্তি ফোটে কাব্যে আর সুরমূর্তি জাগে সংগীতে। নজরুলের হৃদয়ে অকৃত্রিম ভাবাবেগ ছিল আর এই ভাবাবেগের আত্মপ্রকাশ যেমন ঘটেছে কাব্যে, তেমনি এর অভিব্যক্তি হয়েছে সংগীতেও। কাব্যের ক্ষেত্রে নজরুল-মানসের প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রাবল্য ও উদ্দামতা অনেক সময় আঙ্গিকের বন্ধন মানতে চায় নি। তাই তাঁর কাব্যে স্খলন-পতন-ত্রুটির সংখ্যা এতো ভয়াবহ মাত্রায় বেশী। ছন্দ শব্দ ইত্যাদি ব্যবহারে তাঁর অসংযম বহুক্ষেত্রে কাব্যের রসসৃষ্টিকে বিঘ্নিত করেছে। কাব্যের ক্ষেত্রে যে রোমান্টিক ভাবতরঙ্গের উদ্দাম দোলা সার্থক কাব্যসৃষ্টির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই স্বাভাবিক ছন্দে লীলায়িত হয়ে সংগীত-রচনার প্রকৃত সহায়ক হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক ভাবাবেগের অতিশয্য ও প্রাবল্য তাঁর গানের সুরকে একটি মনোমুগ্ধকর ও অব্যর্থ আবেদনময় রূপ দান করেছে। কথা ও সুরের অত্যাশ্চর্য মিলনে নজরুলের সংগীতমূলক প্রতিভা এক অপূর্বসুন্দর সার্থক সংগীতরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সংগীতের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ সহজাত। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সংগীতানুরাগের প্রকাশ ঘটে। ১২।১৩ বছর বয়সে যখন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসানসোলে এক রুটির দোকানে পাঁচ টাকার মাইনের চাকরি নেন, তখন তাঁর যন্ত্রসংগীত শুনে কাজী রফিজউদ্দীন নামে আসানসোলের এক দারোগা তাঁকে তাঁর নিজের দেশ—মৈমনসিংহ জেলার কাজীরসিমলা গ্রামে নিয়ে গিয়ে এক স্কুলে ভর্তি করে দেন। এর পূর্বে লেটোর দলে থাকাকালে তাঁকে গান রচনা এবং প্রয়োজন হলে সুর সংযোজনাও করতে হত।

নজরুল কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে গানও প্রণয়ন করতেন। তাঁর কাব্য-জীবনের শেষের দিকে গ্রামোফোন কোম্পানী, বেতার কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের তাগাদায় অর্থোপার্জনের জন্যে কবিতার চেয়ে সংগীতই তাঁকে বেশী রচনা করতে হয়েছে। শোনা-যায় নজরুল সর্বসমেত প্রায় তিন হাজারেরও বেশী সংগীতের রচনাকার। পৃথিবীতে সংগীতরচনার ইতিহাসে এর চেয়ে বড় রেকর্ড আমার জানা নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা আনুমানিক দু'হাজারের কিছু বেশী গান রচনা করেছিল। বলাবাহুল্য এটা সংখ্যার রেকর্ড, উৎকর্ষের নয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ৮-এ, টার্নার স্ট্রীট (বর্তমান নবাব আবদুর রহমান স্ট্রীট)-এর বাসায় থাকতেন, তখন নজরুল শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্ত নাম্নী একজন ব্রাহ্ম মহিলার কাছ থেকে একটি পত্র পান। সেই সময় বাঙলাদেশের নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর তৈরি করা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হত। ইতোমধ্যেই তিনি নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুরারোপ করেন। মোহিনী সেনগুপ্ত নজরুলকে অনুরোধ জানান সংগীতের নিয়মকানুন মেনে গান রচনা করতে। তিনি মন্তব্য করেন যে, গানের অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি বিভাগ থাকা প্রয়োজন। শ্রীযুক্তার কথামত এই সময় থেকেই গানের নিয়মকানুন মেনে নজরুল গান রচনা করতে উদ্যোগী হন।

নজরুলের সংগীত-জীবনের আরম্ভ সম্পর্কে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের একটি তথ্য উল্লেখনীয়।

"প্রথম জীবনে নজরুল রবীন্দ্রসংগীতই গাইত। 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি" এ গানটি সে প্রায়ই গাইত। তারপর নিজে সে গান রচনা করতে আরম্ভ করে—নিজের দেওয়া সুরে সে যখন নিজের গানগুলি একটার পর একটা গেয়ে যেত তখন সেখানে যে পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত তার কথা মনে হলে এখনো আনন্দ হয়। নজরুলের নিজের রচিত প্রথম গান যা সে বন্ধুদের প্রথম শুনিয়েছিল সেটা বোধহয় "ওরে আমার পলাতকা"—তারপর বাঙলা দেশে নজরুল গানের পুষ্পবৃষ্টি করে গেছে—সে নিজে একজন বিশিষ্ট সুরজ্ঞও ছিল, তাই তার গানে সে এমন পরিপূর্ণ প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছে। একদিন নজরুলের গানে বাঙলাদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল—তার নব নব সুরের মাধুর্যে ও মূর্ছনায়।"[১]

---

১ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়: আমাদের নজরুল (কবিতা—কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

বাংলাগানে রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের স্থান। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের মধ্যে কাব্যপ্রতিভা ও গীতিপ্রতিভার শুভ সম্মেলন হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের মতই নজরুল-প্রতিভা সর্বাধিক স্ফূর্তি লাভ করেছে সংগীতে। বাংলা গান হচ্ছে একটি ভাবের প্রকাশ। মূল একটি ভাবকে সুরসংযোগে নানাভাবে আবেদন-পূর্ণ করে তোলা হয়। তাই একই গান বিভিন্ন শ্রোতার মনে বিভিন্ন আবেদনের সৃষ্টি করলেও তার মূলভাব একই থাকে। বস্তুত বাংলাগান বাণী-প্রধান। বাংলা গানকে কবিতা হিসেবেও উৎকৃষ্ট হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের শ্রেষ্ঠ গানগুলি তাই কবিতা হিসেবেও মহৎ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কতকগুলি কবিতাতে সুরারোপ করেছেন এবং সেগুলিকে গীতবিতানে স্থানও দিয়েছেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ গান ও গীতি-কবিতার পার্থক্য মানতেন না। সেই রকম নজরুলের 'ভাঙার গান', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি গ্রন্থে গান ও কবিতা একই সঙ্গে সংকলিত হয়েছে। নজরুলের বহু গান কবিতা হিসেবেও অতি উৎকৃষ্ট এবং বলতে গেলে কবিতাকারেই অধিকতর পরিচিত। নজরুল বাংলা গানের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই সংগীত রচনা করেছেন। নজরুলের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতির সংগীতে বাণী-বৈভব সুরসমৃদ্ধির তুলনায় অধিক। অপরপক্ষে অতুলপ্রসাদ সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইত্যাদির গানে বাণীর তুলনায় সুরই বেশী ধনী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের শ্রেষ্ঠ সংগীতাবলীতে যেমন বাণীসম্পদ, তেমনি সুরৈশ্বর্য।

নজরুলের অধিকাংশ গানই সহজ, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত। ছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অভিনবত্ব ও অলংকারের কারুকার্যে গানগুলি মনোমুগ্ধকর। নজরুলের কবিমন দুরন্ত, দুর্বার ও উচ্ছল। তাই তাঁর কবিতা ভাবাবেগের প্রাবল্যে সাধারণত দীর্ঘ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই ভাবাবেগ আশ্চর্যভাবে সংহত হয়েছে তাঁর গীতাবলীতে। তাঁর গানের স্বল্প পরিসরে এসেছে কখনো চমক-লাগানো তীক্ষ্ণতা, কখনও হৃদয়-হারানো গভীরতা, আবার কখনও বা মন-কেড়ে-নেওয়া উজ্জ্বলতা। নজরুল তাঁর গানে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত প্রভৃতি ছন্দ অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ভাবানুসারে নজরুলগীতিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) স্বদেশাত্মবোধক গীতি, (২) মানবিক প্রেমগীতি, (৩) ভক্তি-মূলক গীতি, (৪) প্রকৃতিগীতি ও (৫) হাসির গান।

স্বদেশ-বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত সচেতনতা ও প্রেমবোধ আধুনিক মনোবৃত্তিগুলির অন্যতম। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার কল্যাণে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্বদেশ-

বোধের বিকাশ দেখা যায়। ক্রমে জাতি বিদেশীশাসন থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে এবং দেশের ভাষা ও পুরাতন গৌরবময় ইতিহাসের প্রতি গভীর মমত্ববোধের উন্মেষ হয়। রামনিধি গুপ্ত ও অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের গানে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গানে ও কবিতায় মাতৃভাষাপ্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন দেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে শুধু মাতৃভাষাপ্রীতি নয়, স্বদেশপ্রেম তথা স্বজাতিপ্রেমও তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত)-কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোবিন্দ রায়, মনোমোহন বসু প্রভৃতি মনীষীর গানে এই জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি সংগীতে স্বদেশপ্রেমের স্রোত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। এরপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশপ্রেমের সার্থক প্রকাশ ঘটে যাঁদের কাব্যে তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তবে এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মুকুন্দচন্দ্র দাস প্রমুখের রচনাও যথেষ্ট উৎকর্ষের দাবি রাখে। বাংলার স্বাদেশিক গানের এই ঐতিহ্যের পথেই নজরুল তার দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর গানে দেশপ্রেমের উন্মাদনা, পরাধীনতার জ্বালা ও বৈপ্লবিক চেতনা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে, অনেকক্ষেত্রেই তার কোন তুলনা নেই।

বাংলার জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের সময়ে রচিত নজরুলের কোরাসগান যৌথসংগীতের ক্ষেত্রে এক বিশেষ দিক খুলে দিয়েছে। জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামস্পৃহা এই সব কোরাস গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গীতিকারদের কোরাসসংগীতের তুলনায় নজরুলের কোরাসগীতি মোটেই হীনপ্রভ নয়। নজরুলের সর্বাধিক পরিচিত কোরাসগীতি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' (সর্বহারা) জাতীয় সংগীতের একটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। কোরাস গানের একটি বিশেষধারা মার্চ-সংগীতে নজরুল অতুলনীয়। তাঁর 'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল' (সর্বহারা), 'অগ্র-পথিক হে সেনাদল' (জিঞ্জীর), 'টলমল টলমল পদভরে' (আলেয়া), 'চল্ চল্ চল্' (সন্ধ্যা), 'জননী আমার ফিরিয়া চাও' (ভাঙার গান), 'চল রে চপল তরুণ-দল বাঁধন-হারা' (গানের মালা) ইত্যাদি মার্চ-সংগীত হিসেবে অনবদ্য। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুতীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রকাশিত হয়েছে 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ-শিকল-পরা ছল' (বিষের বাঁশী), 'কারার ঐ লৌহ-কবাট' (ভাঙার গান) প্রভৃতি গানে।

নজরুল বাংলা মায়ের রূপটি প্রেমের অপূর্ব আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম চির-মনোরম চিরমধুর' (বন-গীতি) গানটিতে দেশভক্তি উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে। তবে 'সুর-সাকী'র নিম্নলিখিত গানটির তুলনা নেই।

"আমার শ্যাম্‌লা বরন বাঙ্‌লা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীন্ বাজায়॥"[১]

মিশ্রসুরে 'জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা' (গানের মালা) গানটি মুগ্ধকর। 'লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি' (সুর-সাকী) গানে লক্ষ্মীর উদ্দেশে উক্ত কবির কথায় তাঁর দেশপ্রেমের অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটেছে। গানটির শেষপংক্তিত্রয় আন্তরিকতায় অপরূপ।

"কোন্ দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ী অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভরল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি॥"[২]

হিন্দুমুসলমানমৈত্রীবিষয়ক কতকগুলি গানের মধ্যে নজরুলের স্বজাতিপ্রীতি ও দেশাত্মবোধ আত্মপ্রকাশ করেছে অনবদ্যভাবে।

ছায়ানট-দাদ্‌রা সুরে—

"হিন্দুমুসলমান দুটী ভাই
ভারতের দুই আঁখিতারা।
এক বাগানে দুটী তরু দেবদারু আর কদম-চারা॥"[৩]

ভৈরবী-একতালা সুরে—

"মোরা একবৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মোসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

১ সুর-সাকী
২ সুর-সাকী
৩ সুর সাকী

এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥"[১]

মানবিকপ্রেমবিষয়ক গানে নজরুলের সাফল্য অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত। তাঁর গানে প্রেমের বিরহ, ব্যর্থতা, আশা, নিরাশা ইত্যাদি নানা অনুভূতির সার্থক প্রকাশ থাকলেও প্রেমের বিরহবেদনার বিচিত্র অভিব্যক্তির চিত্রণে নজরুল সবচেয়ে অধিক কৃতিত্বের অধিকারী। এই প্রসঙ্গে ভৈরবী-একতালা সুরে 'গানগুলি মোর আহত পাখির সম' (সুর-সাকী), পিলুমিশ্র সুরে 'নিরালা কানন-পথে কে তুমি চল একেলা' (সুর-সাকী), ভাটিয়ালি-কার্ফা সুরে 'কুঁচ-বরন কন্যা রে তার মেঘ-বরন কেশ' (সুর-সাকী), খাম্বাজ-দাদ্‌রা সুরে 'সামলে চ'লো পিছল পথ গোরী' (সুর-সাকী), ভাটিয়ালি সুরে 'আমার গহীন জলের নদী' (চোখের চাতক), ভৈরবী-গজল সুরে 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম, নমো নম, নমো নম' (চোখের চাতক), ভাটিয়ালি-কার্ফা সুরে 'আমার "সাম্পান" যাত্রী না লয় ভাঙা আমার তরী' (চোখের চাতক), ইমন-ভূপালী সুরে 'ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে আমার গানের বুল্‌বুলি' (গানের মালা), ছায়ানট-একতালা সুরে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয় ফিরে আয়' (গানের মালা), ভীমপলশ্রী মিশ্র-দাদ্‌রা সুরে 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়' (বন-গীতি) ইত্যাদি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির প্রত্যেকটির বাণীসম্পদ অনবদ্য।

প্রেমসংগীতের মধ্যে গজল গানে নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গজল পারস্য দেশের এক প্রকারের লঘু প্রেমসংগীত। এতে অস্থায়ী অংশটি মাত্র ছন্দে গাওয়া নিয়ম, বাকী অংশগুলি ছন্দোহীন আবৃত্তির পদ্ধতিতে গাওয়া হয়। এই আবৃত্ত অংশগুলি 'শের' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। গালিবপ্রমুখ উর্দু কবিরা তাঁদের ভাষায় গজল ধরনের উৎকৃষ্ট গান রচনা করেছেন। নজরুলের আগে অতুলপ্রসাদ সেন কর্তৃক গজলগান রচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত গজলগুলি, যেমন 'ভাঙা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে', 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা', 'কে গো তুমি বিরহিণী আমারে সম্ভাষিলে' ইত্যাদি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলির মধ্যে বাংলাগানের সত্যকার চরিত্র ফোটে নি। নজরুলই প্রথম সার্থকভাবে পারস্য গজলের সুরটিকে বাংলাগানের কাঠামোতে

১ সুর সাকী

ফুটিয়ে তোলেন। নজরুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই বিশেষ ধরনের গজল গান গুলি। 'বাগিচায় বুল্‌বুলি তুই ফুল্‌শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল্‌', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে', 'বসিয়া বিজনে কেন একা মনে', 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে', 'এত জল ও-কাজল-চোখে পাষাণী, আন্‌লে বল কে', 'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়' ইত্যাদি 'বুলবুল' সংগীতগ্রন্থের গজলগুলি সমধিক পরিচিত। 'বন-গীতি' গীতিগ্রন্থের 'নিশীথ হয়ে আসে ভোর বিদায় দেহ প্রিয় মোর', 'দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর', 'পান্‌সে জোছ্‌নাতে কে চলে গো পান্‌সী বেয়ে' ইত্যাদি গজলগুলিও অনবদ্য। প্রেমের ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও বিরহবেদনাই গজল গানগুলির প্রধান উপজীব্য। এইসব গজলের মধ্যে নজরুলের কবিত্ব বহুস্থলে উৎকর্ষের চূড়া স্পর্শ করেছে। প্রেমসংগীতের ক্ষেত্রে 'বুলবুল' ও 'চোখের চাতক' নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতগ্রন্থ। 'বুলবুল' (প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩৫ সাল) দিলীপকুমার রায়কে ও 'চোখের চাতক' (প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল) প্রতিভা সোমকে উৎসর্গীকৃত। নজরুলের প্রেমগীতিকে যাঁরা জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দিলীপকুমার রায়, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও নজরুল নিজে।

ভক্তিমূলক গানের মধ্যে শ্যামাসংগীত ও ইসলামী সংগীতে নজরুল আশ্চর্য উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। রামপ্রসাদের পরে সব দিক বিচার করলে শ্যামাসংগীতে নজরুলের স্থান অনেকেরই উপরে বলা যায়। 'বল্‌ রে জবা বল্‌ কোন সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণ তল্‌', 'মা তোর কালো রূপের মাঝে রসের সাগর লুকিয়ে আছে', 'শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে', 'আমি বেলপাতা জবা দেব না মাগো দেব শুধু আঁখিজল', 'আমি মা ব'লে যত ডেকেছি সে ডাক নূপুর হচ্ছে ও রাঙা পায়ে', 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী' ইত্যাদি গান শ্যামাসংগীতের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। নজরুল নিজের জীবনে তন্ত্র ও যোগসাধনা করেছেন। শক্তিপূজায় তাঁর ভক্তহৃদয়ের অকৃত্রিম আকুলতা ও আর্তি এই সব গানের মধ্যে রূপায়িত। তাঁর শ্যামাসংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলেন মৃণালকান্তি ঘোষ, শৈল দেবী, কৃষ্ণদাস ঘোষ প্রভৃতি।

প্রখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীনের অনুরোধেই নজরুল ইসলামী সংগীত রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম রচিত গান দুটি—'ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ্' ও 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর' আব্বাসউদ্দীন হিজ মাস্টারস্ ভয়েসে রেকর্ড করেন। আব্বাসউদ্দীনই নজরুলের ইসলামী গানকে সবচেয়ে বেশী লোক-পরিচিত করে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে আব্বাসউদ্দীন আহ্মদের 'গীতিকার নজরুল' প্রবন্ধ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলে নজরুলের সাংগীতিক প্রতিভার একটি জীবন্ত পরিচয় পাওয়া যাবে।

"কুচবিহার কলেজের ছাত্র আমি, স্কুল কলেজে মিলে প্রতি বৎসর মিলাদ করতাম। সেই মিলাদ মহ্ফিলে কবিকে আমন্ত্রণ করি। সেই থেকে পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহ দিলেন, বল্লেন, "সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, কলকাতায় চল, তোমার গান রেকর্ড করা হবে।"

১৯৩০ সনে প্রথম গান রেকর্ড ক'রে কুচবিহার চ'লে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতায় যাই এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল ঘর তখন চিৎপুর রোডে। শুনলাম—কাজীসাহেব সেখানে রোজই যান। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "কাজীসাহেব কোথায়?" তিনি বল্লেন, "পাশের ঘরে গান লিখছেন।" আমি ঢুকলাম। তিনি মহাউৎসাহে ব'লে উঠলেন, "আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে? বস বস বস।"………সামনে এগিয়ে গিয়ে কদমবুছি করলাম। তিনি বল্লেন, "সবাই আমাকে কাজীসাহেব বলে, তুমি কিন্তু কাজীদা ব'লে ডাকবে আমাকে। হ্যাঁ তোমার জন্যে গান লিখতে হয়। আচ্ছা ঠিক হবে।"

"আচ্ছা ঠিক হবে"তো বল্লেন, কিন্তু যতবারই যাই গ্রামোফোন ক্লাবে ততবারই দেখি তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অনেকে। আমি সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারি না। পাশের ঘরে পিয়ারু কাওয়াল রিহার্সেল দিচ্ছেন উর্দু কাওয়ালী গানের। বাজারে সে সব গানের কী বিক্রি! আমি কাজীদাকে বল্লাম, "এমিভাবে বাংলা কাওয়ালী গান লিখে দিতে পারেন আমার জন্যে?" গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙ্গালী সাহেব বল্লেন, "না, না, ও ধরনের বাংলা গান বিক্রি হবে না।" অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজী হলেন। কাজীদাকে বল্লাম, "সাহেব রাজী হয়েছেন।" কাজীদা তখুনি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বল্লেন, "কিছু পান নিয়ে এসো।" পান নিয়ে এলাম

ঠোঙা ভর্তি ক'রে। তিনি বল্লেন, "দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাক।" ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন, "ও মন, রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।" সুর-সংযোগ ক'রে তখুনি শিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, "কাল এসো রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার জন্যে আর একখানা লিখে দেব।" পরদিন লিখলেন, "ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।" রেকর্ড করলাম চারদিন পরে। সে গান বাঙলার আকাশে-বাতাসে তুললো এক নব-আলোড়ন। তারপর, লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।"[১]

এরপর নজরুল লিখেছেন অফুরন্ত হামদ, নাত, মর্সিয়া, হজরতের আবির্ভাব ও তিরোভাবের গান, হজ-জাকাতের গান, নামাজ-রোজার গান, ঈদের গান প্রভৃতি। এই সব ইসলামী গানের প্রতিটিতে তিনি রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণে সুর সংযোগ করেছেন। মালকোষ রাগিণীতে 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়' সুরোদ্দীপনায় অসামান্য।

আব্বাসউদ্দীন ছাড়া ধীরেন দাস গণি মিঞা নামে, চিত্ত রায় দেলোয়ার হোসেন নামে, গিরিন চক্রবর্তী সোনা মিঞা নামে ও হরিমতী সাকিনা বেগম নামে বহু ইসলামী গান রেকর্ড করাতে এগুলি অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

'দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলাম', 'শহীদী ঈদগাহে জমায়ত ভরি', 'বাজিছে দামামা বাঁধিবে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান', 'বাজলো কি রে ভোরের শানাই নিজ মহলার আঁধার পুরে' প্রমুখ সংগীতগুলি এককালে মুসলমান সমাজকে মাতিয়েছিল।

'জুলফিকার' (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র ১৩৩৯ সাল) ইসলামী সংগীতগ্রন্থ হিসেবে অসাধারণ উৎকর্ষের দাবি করে। মুসলিম সমাজের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্তিজনিত হতাশ্বাস এই সংগীতগ্রন্থের মূল সুর। অবশ্য সেই সঙ্গে আশাবাদী কবি মুসলিমসমাজকে নবজাগরণের ডাকও শুনিয়েছেন। কয়েকটি গানে (যেমন—'দূর আরবের স্বপন দেখি বাঙলা দেশের কুটির হতে', 'আল্লার নামে বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে', 'বক্ষে আমার কা'বার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল' প্রভৃতি) নজরুলের অকৃত্রিম স্বধর্মপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে।

বৈষ্ণব সংগীতে নজরুলের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাঁর রাধাকৃষ্ণ মানবিক প্রেমেরই প্রতীক। তবে কয়েকটি কীর্তনে (যেমন—

১ নজরুল-পরিচিতি : পৃ ৬৬-৭

'আমি কি সুখে লো গৃহে রব, আমার শ্যাম যদি ওগো যোগী হ'ল সখি আমিও যোগিনী হব', 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো', 'আমি কেন হেরিলাম নবঘনশ্যাম কালারে কালো কালিন্দী-কূলে' প্রমুখ কীর্তন গানগুলির তুলনা খুঁজে পাওয়া সুকঠিন।

নজরুলের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর কতকগুলি গানে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই সব গানের চিত্রকল্প ও ভাষার কারুকার্য পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। এই প্রসঙ্গে 'আজি দোল্-ফাগুনের দোল্ লেগেছে আমের বৌলে দোলন-চাঁপায়' (সুর-সাকী), 'আজকে দোলের হিন্দোলায় আয় তোরা কে দিবি দোল্' (সুর-সাকী) প্রভৃতি গান বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

আব্বাসউদ্দীন আহমদ তৎকৃত 'গীতিকার নজরুল' প্রবন্ধে বলেছেন যে নজরুল ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি পল্লীসংগীত রচনার অনুপ্রেরণ পেয়ে ছিলেন তাঁর গান শুনেই। তিনি লিখেছেন,

"একদিন রিহার্সেল রুমে বসে একাকী আমাদের দেশের একখানা পল্লীগান ভাওয়াইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে শুনছিলেন টের পাইনি। গান শেষ করা মাত্র তিনি ঢুকে বল্লেন, "আহা, কী সুন্দর, কি মিষ্টি সুর! আব্বাস, গাও, আর একবার গাও তো।" আমি গাইলাম:

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া।"

কাজীদা বল্লেন, "গাও, আবার গাও।" পাঁচ ছ'বার গাইলাম। তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, চুপ ক'রে বস।" তিনি কাগজকলম নিয়ে গান লিখতে বসলেন। ১০ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "দেখ তো তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায় নি? আমি তাঁর লেখা গান গাইলাম:

"নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।"*

এরপর তিনি ভাওয়াইয়া গান শুনলেই অস্থির হয়ে পড়তেন। গান গাইতে গাইতে গলা-ভাঙার মাধুর্যে তিনি আত্মহারা হয়ে "আহা আহা" ক'রে উঠতেন।

আর একটা গান লেখার কথা মনে পড়ছে। আমি একদিন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম :

"তেরষা নদীর পারে পারে ও
দিদিলো মান্‌সাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও।"

কাজীদা সেই সুরে লিখলেন :

"পদ্মদীঘির ধারে ধারে ও"

ভাওয়াইয়া সুরে লিখলেন :

"কুচ বরন কন্যা রে তার মেঘ-বরন কেশ,
আমায় লয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ।"

পল্লীসংগীত লেখার অনুপ্রেরণা তিনি এইভাবে পেলেন। তখন আমার জন্যে ৮।১০ খানা পল্লী-সংগীত লিখেছিলেন ;..."[১]

হাসির গানে নজরুলের জুড়ি মেলা ভার। 'চন্দ্রবিন্দু' (প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫২ সাল) সংগীত-গ্রন্থের ১৮টি গান এবং 'সুরসাকী' সংগীতগ্রন্থের কয়েকটি গানটিই নজরুলের হাসির গান হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাসির গানগুলির মধ্যে দুটি ধারার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট—এক, রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনাসম্পন্ন দেশাত্মবোধক তীব্র ব্যঙ্গপ্রধান গান এবং দুই, মানবিক প্রেম ও ধর্ম সম্বন্ধীয় লঘুরসের রঙ্গপ্রধান গান। 'চন্দ্রবিন্দু'তে প্রথম ধারা ও 'সুর-সাকী'তে দ্বিতীয় ধারার বিদ্যমানতা সুপ্রকট।

ব্যঙ্গাত্মক গানে নজরুলের পূর্বসূরী হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণীয়। তবে প্রসঙ্গ রুচি ও প্রযুক্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গেই নজরুলের সমধর্মিতা বেশী। সবদিক বিচার করলে রাজনীতিক ও সমাজিক চেতনা-যুক্ত গানে নজরুল অদ্বিতীয়। তার প্রধান কারণ—নজরুল দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুক্তিসংগ্রামে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা কে না জানে? এই সব ব্যাপারে তাঁকে অনেক পীড়ন-নির্যাতন, এমন কি কারাদণ্ডও ভোগ করতে হয়েছে। সেইজন্যে অন্যদের তুলনায়

১ নজরুল পরিচিতি

নজরুলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক চেতনা অনেক বেশী। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে নিয়ে 'প্যাক্টে'র (চন্দ্রবিন্দু) মত ব্যঙ্গপ্রধান কোরাস আর লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বদনা গাড়ুতে প্যাক্ট দিয়ে কোরাসটির আরম্ভ।

"বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে,
নব প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি,
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥"[১]

শেষপর্যন্ত এই মৈত্রীর কি অবস্থা হল তাই দিয়ে এই কোরাসের সমাপ্তি—

"বদনা গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি
রোল উঠিল "হা হন্ত",
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল
হাসে ছির্‌কুটি দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা,
মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,—
করুণ চন্দ্রবিন্দু!"[২]

'চন্দ্রবিন্দু'র মধ্যে নজরুলের সুবিখ্যাত কোরাস 'দে গরুর গা ধুইয়ে' গ্রথিত। এর বিষয়বস্তু গানের প্রথমেই উল্লিখিত।

"দে গরুর গা ধুইয়ে!!
উল্টে গেল, বিধির বিধি
আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে,
মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি!"[৩]

'চন্দ্রবিন্দু'তে সংকলিত 'সর্দা বিল', 'লীগ-অব-নেশন', 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস', 'রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স', 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট' ও 'প্রাথমিক

১ চন্দ্রবিন্দু
২ ঐ
৩ ঐ

শিক্ষা-বিল' শীর্ষক গানগুলি সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ে নজরুলের গভীর চেতনা ও বোধের স্বাক্ষর বহন করে।

এই প্রসঙ্গে হাস্যরসের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে হাস্যরস বোঝাবার জন্যে Humour, Wit, Satire, Fun, Irony, Sarcasm, Buffoonery, Ridicule, Jest ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলাতেও তেমনি হাস্যরসের প্রকারভেদ হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, তামাশা, রঙ্গরস, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দগুলি চলে। বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে ইংরেজী শব্দগুলির প্রতিশব্দ মনে করলে ভুল হবে। এগুলি বাংলার নিজস্ব ভাবব্যঞ্জক শব্দ। ইংরেজীতে সাহিত্যগুণোপেত রচনায় যেসব প্রধান হাস্যরসশ্রেণীর সাক্ষাৎ মেলে সেগুলি হচ্ছে—Humour, Wit, Satire, Irony ও Fun. বাংলাতে এই Humour-এর কোন পরিভাষা না থাকলেও অন্যান্য শব্দের একটা মোটামুটি ভাবসূচক পরিভাষা আছে। Wit হচ্ছে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। এতে থাকে বুদ্ধির তীব্র ঝাঁজ। Satire ও Irony শব্দ দুটিকে সাধারণত ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ বলে বোঝানো হলেও উভয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। Satire হচ্ছে স্পষ্ট বা খোলাখুলি ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ আর Irony প্রচ্ছন্ন বা চাপা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ।

ব্যঙ্গকারের (Satirist) স্বরূপ সম্বন্ধে George Meredith লিখেছেন,

"The satirist is a moral agent, often a social scavenger, working on a storage of bile."

Fun-এর অর্থে রঙ্গ বা কৌতুক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এইসব হাস্যরসের মধ্যে Humour যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। আগেই বলেছি, Humour-এর ভাবব্যঞ্জক কোন প্রতিশব্দ বাংলায় আজও তৈরী হয় নি।

কেউ কেউ Humour-কে সোজাসুজি করুণ হাস্যরস বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা সঙ্গত নয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি উদাসীন অথচ সহৃদয় মনোভাবই Humour-এর জন্মভূমি। Humour-এর মধ্যে সাধারণত যে সহানুভূতি বা সহৃদয়তা বর্তমান তাকে সবক্ষেত্রে ঠিক কারুণ্য বলা সমীচীন নয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে করুণ রস বা Pathos-এর একটা রেশ Humour-এর মধ্যে থাকতে পারে। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এই করুণরসের ভঙ্গি ভিন্ন রকমের, কেননা এর পিছনে হৃদয়াবেগের পরিবর্তে একটি উদাসীন, আক্ষেপহীন, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার মনোভাব থাকে। বস্তুত

একটি নিরাসক্ত অথচ সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভঙ্গির দ্বারা যখন হাস্যরসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণ ঘটে তখনই উৎকৃষ্ট হিউমারের জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গে Bergson-এর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

"Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe than emotion. I do not mean that we could not laugh at a person who inspires us with pity, for instance, or even with affection, but in such a case we must, for the moment, put our affection out of court and impose silence upon our pity."

একই হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর হাস্যরসের অবস্থান ঘটতে পারে; যেমন—কৌতুক বা বিদ্রূপের মধ্যে হিউমারের আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে যে রোমান্টিক কাব্য বা গীতির উৎস হৃদয়াবেগ আর হাস্যরসের জন্মভূমি প্রধানত বুদ্ধি। তাই খাঁটি রোমান্টিক কবি বা গীতিকারের পক্ষে উৎকৃষ্ট হাস্যরস-সৃষ্টি বিশেষ দুরূহ কাজ। সেই কারণে বাংলার গীতিকবিদের লেখনী থেকে স্বল্পক্ষেত্রেই উঁচুদরের হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে। এমন কি কাব্য বা গীতির প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতার জন্যে বাংলাদেশের খুব কম ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প-লেখক উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস পরিবেষণ করতে পেরেছেন।

নজরুল মূলত আবেগনির্ভর কবি ও সংগীতকার। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত Sentimental. এইজন্যে তাঁর পক্ষে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় নি। নজরুলের রচনায় Satire, Irony ও Fun-এরই প্রাধান্য। তবে স্থানবিশেষে Wit-এর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের পূর্বোল্লিখিত বিখ্যাত কোরাস 'প্যাক্ট' ও 'দে গরুর গা ধুইয়ে'-র মধ্যে Satire বা খোলাখুলি বিদ্রূপেরই আধিক্য, যদিও স্থানে স্থানে মর্মপীড়াসম্ভূত Irony-র স্পর্শ আছে। তাঁর 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্', 'রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স', 'লীগ-অব-নেশান' প্রভৃতির মধ্যে মর্মব্যথাজনিত Irony-র প্রাধান্য এবং মধ্যে মধ্যে wit-এর বিদ্যুদ্দামও দেখা যায়। এইসব গানের ভিতরে কদাচিৎ হিউমারেরও আবির্ভাব ঘটেছে।

Fun অর্থাৎ কৌতুক বা রঙ্গ সৃষ্টিতে নজরুল দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে অনেক জায়গায় এই কৌতুক বা রঙ্গরস অতিমাত্রায় ফেনিল হয়ে উঠেছে।

নজরুলের কৌতুকের মধ্যে কোথাও কোথাও Pun ও Satire-এর সাক্ষাৎও মেলে।

রঙ্গাত্মক গানে নজরুলের উপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাব থাকলেও রজনীকান্ত সেনের সঙ্গেই তাঁর সমধর্মিতা সবচেয়ে অধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ভাষার রুচিহীনতা ও ভাবের দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর হাস্যরসাত্মক গানে সুরের অভিনবত্ব কম হলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সজীবতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কতকগুলি গানে তাঁর সাফল্য মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। 'সুর-সাকী'র সর্বশেষ কীর্তনটি বিশেষভাবে উপভোগ্য। এর অংশবিশেষ আহরণীয়।

"আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি' করি ভজন।
আমি মাল্‌পো'র লাগি' তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন॥
"রাধ-বল্লভী"-লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
রস-গোল্লার লাগি' আসি রাস-মোচ্ছবে!
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন!"

'সুর-সাকী'র কয়েকটি লঘুরসাত্মক গানের উপজীব্য প্রেমের হাহুতাশ। একটি গানের আরম্ভটি উপাদেয়।

"ছিটাইয়া ঝাল নুন এল ফাল্গুন মাস।
কাঁচা বুকে ধরে ঘুন, শ্বাস ওঠে ফোঁস ফাঁস॥"

অনেক গানের অত্যধিক তারল্য ও চাপল্য তাঁর রুচিবিকৃতিরই পরিচায়ক। এই সব গানের রস স্থূল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে রঙ্গতামাশাপূর্ণ একটি গানের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"চাঁপা রঙের শাড়ি আমার
যমুনা-নীর ভরণে গেল ভিজে।
ভয়ে মরি আমি, ঘরে ননদী,
কহিব শুধাইলে কী যে॥
ছি ছি হরি এ কি খেল লুকোচুরি,
এক্‌লা পথে পেয়ে কর খুন্‌সুড়ি,
রোধিতে তব কর ভাঙিল চুড়ি,
ছল্‌কি' গেল কলসী যে॥"

প্রকৃতপক্ষে হাস্যরস নজরুল-সংগীতের এক বিশেষ উপভোগ্য বস্তু। তাঁর কয়েকটি গান অভিজ্ঞতার রসে অভিষিক্ত হওয়ায় দ্বিজেন্দ্রলালের শিক্ষিত চাতুর্যময় গানের চেয়ে অনেক বেশী হৃদয়বেদ্য হয়ে উঠেছে।

* রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য যেসব গীতিকারদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে নজরুলের সমধর্মিতা ছিল তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতে একদিকে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব এবং অপরদিকে হিন্দুস্থানী খেয়াল-ধ্রুপদের প্রবল প্রভাব দেখা যায়। অতুলপ্রসাদের গান যেমন একদিকে বাংলার গ্রাম্যগীতি, তেমনি অন্যদিকে লক্ষ্ণৌর ঠুংরী প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিককার গীতাবলী, বিশেষত ঐশীপ্রেমমূলক গীতিসমূহে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ-খেয়ালের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করে সংগীত রচনা করেন। ঠাকুরবাড়িতে বহু ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের আসর বসত। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সুরৈশ্বর্যে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট ও রাধিকা গোস্বামীর কাছে তালিম নিয়েছিলেন কিছুদিন। তবে সংগীত-রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রভাব ও দীনেন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিলেতে থাকাকালে ইওরোপীয় সংগীত শিক্ষা করেন। তাছাড়া বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব গীতি-সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছে তাঁর জীবনে। এই ত্রিধারা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মিলিত হয়েছে এবং তার রসায়নে এগুলি রূপান্তর লাভ করে যা সৃষ্টি করেছে তাই অতুলনীয় রবীন্দ্রসংগীত। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ব'লে রবীন্দ্রনাথ সুরের এত বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রসংগীতের সুরবৈচিত্র্য আর কোন ভারতীয় সুরকারের রচনায় দেখা যায় না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, ধ্রুবপদ্ধতিতে রচিত বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের সাফল্য সীমিত। এর কারণ এই যে, এই পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাভাষার সর্বাঙ্গীণ সাদৃশ্য তৈরী করা যায় না। টপ্‌খেয়ালের পক্ষে বাংলাভাষা বিশেষ উপযোগী। তাই বাংলা টপ্পার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর খুব বেশী করে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাবলে আপাতবিরোধী বহুসুরের মিশ্রণ ঘটাতে সমর্থন হয়েছেন। বাউলভাটিয়ালির সঙ্গে ইওরোপীয়

ঢঙের মিশ্রণেও তিনি আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। বিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সর্বজনপ্রসিদ্ধ হেমন্তরাগকেও রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

নজরুল-সংগীতের সুরবৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। নজরুল ধ্রুপদ, ঠুংরী, গজল, বাউল, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি, লাউনি, রামপ্রসাদী, ঝুমুর, মুর্শিদা, তোড়ী, ছায়ানট, ভৈরবী, আশাবরী, বেহাগ, সাহানা, পিলু, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগরাগিণীতে গান রচনা করেছেন। ওস্তাদী গানকে তিনি বাংলা গানের নিজস্ব রীতির মধ্যে ঢেলে সেজেছেন। বাংলা গানের ঐতিহ্যকে ত্যাগ না করে নজরুল সুরকার হিসেবে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। রাগসংগীত ও লোকসংগীত এই উভয় সংগীতের সুরকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর গানের সুরে অভিনবত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। নজরুলের গানে বাংলা সংগীতের বিশিষ্ট চরিত্রটি ফুটে উঠেছে।

আরবী সুর ('শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণবায়', 'রুম ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্ খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়', ইত্যাদি) নৌরোচকা সুর('বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে'), কিউবান নৃত্যের সুর ('দুর দ্বীপ-বাসিনী—চিনি তোমারে চিনি'), আরবী নৃত্যের সুর ('চমকে চমকে ধীর ভীরু পায় পল্লীবালিকা বনপথে যায়') প্রভৃতি বিদেশী সুর আমদানী করে নজরুল নিঃসন্দেহে বাংলা গানের সুরসম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর গজলগানের সুরসম্ভার বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। গজল গানের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন রাগরাগিণীকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। ভৈরবী, খাম্বাজ, বেহাগ প্রভৃতি রাগের গজলগান বিভিন্ন ভঙ্গিতে রচিত হওয়ায় গানে অসামান্য বৈচিত্র্য এসেছে। লোকসংগীত বা দেশী সংগীতের মধ্যে ভাটিয়ালি গান ('কুচ-বরন কন্যারে তার মেঘবরন কেশ', 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে, ঐ পারুল তোদের ডাকে', 'নদী এই মিনতি তোমার কাছে', 'আমার গহীন জলের নদী', 'আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয় ভাঙা আমার তরী' ইত্যাদি), বাউল গান ('গেরুয়া-রঙ্ মেঠো পথে বাঁশরী বাজিয়ে কে যায়', 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল' প্রভৃতি), ঝুমুর গান ('কালা এত ভালো কি হে কদম্বগাছের তলা'), সাঁওতালী গান ('হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল'), কীর্তন গান ('না মিটিতে মনসাধ') ইত্যাদিতে নজরুল যথেষ্ট সুরসৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। রাগসংগীত বা মার্গ সংগীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদাঙ্গ গান ('গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', 'দাও সহ দাও

ধৈর্য, হে উদার নাথ' ইত্যাদি), খেয়াল গান ['গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে' (রবিকোষ), 'মুরলী ধ্বনি শুনি' (সৈন্ধবী) প্রভৃতি], টপ্পা গান (আজ নতুন করে পড়লো মনে') ও ঠুংরী গান ('কোন কূলে আজ ভিড়লে তরী') রচনা করে নজরুল বাংলা গানের সম্পদ বাড়িয়েছেন। তাঁর রাগপ্রধান গানগুলিতে ['শ্মশানে জাগিছে শ্যামা' (কৌশিক), 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয় ফিরে আয়' (ছায়ানট) প্রভৃতি] বাংলা গানের সুরৈশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশী ও বিদেশী নানাসুরের অপূর্ব মিশ্রণ ও ভাঙাগড়া ঘটেছে তাঁর গানে। এই সব মিশ্রণ ও ভাঙাগড়া এতো স্বাভাবিক হয়েছে যে সেগুলি নূতন নূতন সৃষ্টি বলেই মনে হয়। এছাড়া 'রূপমঞ্জরী', 'দোলন-চাঁপা', 'বনকুন্তল', 'সন্ধ্যামালতী', 'মীনাক্ষী', 'রেণুকা', 'অরুণরঞ্জনী', 'নির্ঝরিণী', 'উদাসী ভৈরব', 'অরুণ ভৈরব', 'আশা ভৈরবী', 'শিবানী ভৈরবী' প্রভৃতি কয়েকটি সুর তাঁর নিজের সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ে নজরুল লুপ্ত বা অর্ধলুপ্তরাগরাগিণীকে সংগীত বিশেষজ্ঞদের কাছে থেকে উদ্ধার করে সেই সব সুরে সংগীত রচনা করেন। এই সব সংগীত মুখ্যত খেয়ালের রীতিতে প্রণীত। উদাহরণ-স্বরূপ 'পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য তব শঙ্খ' (শিবর উজনী) ও 'গুঞ্জমালা দোলে কুঞ্জে এসো হে কালা' (মালগুঞ্জ) এই গান দুটির নাম করা যায়।

পূর্বেই বলেছি—রাগরাগিণীর মিশ্রণে ও ভাঙাগড়ায় নজরুল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি কোন যান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে এ সব ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির স্বাদ এসেছে। এই প্রসঙ্গে 'রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালী' (ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী), 'আধো ধরণী আলো আধো আঁধার' (তিলক-কামোদ-পিলু), 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর! তোরা সব জয়ধ্বনি কর' (মালকোষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রীপঞ্চম-নটনারায়ণ), 'আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়' (কালাংড়া-বসন্ত-হিন্দোল), 'ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় তবু যেতে হবে হায়' (জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ), 'হাজার তারার হার হয়ে গো দুলি আকাশবীণার গলে' (নটমল্লার-ছায়ানট) প্রভৃতি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংগীত যেখানে অতীতাশ্রয়ী, সেখানে তিনি যুগধর্মের স্পন্দন ও উদ্দীপনা এনেছেন। শুদ্ধরাগের কাঠামোতে অন্যরাগের সুরবিন্যাসে তিনি ভয় পান নি। এই প্রসঙ্গে 'আমি ছন্দভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো'

(ধ্রুপদের কাঠামোতে টোড়ি), 'আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ' (খেয়ালের অঙ্গে দরবারী-কানাড়া), 'কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে জানি গো, সেও জানেই জানে' (টপ্পার ভিতরে দেশ-সুরট), 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়্‌ল তরী এ কোন্ সোনার গাঁয়' (ঠুংরীর ফ্রেমে খাম্বাজ-পিলু) ইত্যাদি গান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

নজরুল-সংগীত আজ বাংলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সংগীতের মধ্য দিয়ে নজরুল শাশ্বতের সুরকে স্পর্শ করতে পেরেছেন ব'লে তাঁর সংগীতের ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। নজরুল-সংগীতের একটা সর্বজনীন আবেদনও লক্ষ্য করা যায়। মহাদার্শনিক Schopenhauer সংগীত সম্পর্কে লিখেছেন,

"Music expresses only the quintessence of life, and its events, never the events themselves. The inner meaning of life, the eternal truth of things, is felt and understood immidiately when we listen to Great Music."

নজরুল-সংগীত এই Great Music হ'য়ে উঠতে পেরেছে ব'লেই আজ তা বাংলার গর্বের সামগ্রী।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

নজরুলের উত্তরাধিকার

॥ ১ ॥

নজরুলের কবিজীবন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত। উনিশ শ' দশ থেকে উনিশ শ' ত্রিশ পর্যন্ত কালকে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় এবং উনিশ শ' ত্রিশ থেকে উনিশ শ' চল্লিশ পর্যন্ত কালকে আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায় বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নজরুলকে সাধারণত আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কবি বলে গণ্য করা হয়; কেননা, নজরুলের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠরচনার জন্মকাল উনিশ শ' তিরিশ সালের আগে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যের ইতিহাসে পর্যায় ভাগ করা হয় যুগের বিশেষ ভাবচিন্তার প্রবণতা ও প্রাধান্যের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ ক্ষেত্রে কোন গাণিতিক সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। কাব্য ও সংগীতের ক্ষেত্রেই নজরুল-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। তাই এই অধ্যায়ে উক্ত দুই ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। অবশ্য এই উত্তরাধিকার সম্পর্কে কাব্য ও সংগীতের আলোচনায় মোটামুটিভাবে নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কাব্য ও সংগীতের বিশেষ বিশেষ দিকের কথাই বিশদ করে বলা হবে। অন্যান্য বিভাগে তাঁর উত্তরাধিকারের কথা অধ্যায় বিশেষে যা বলা হয়েছে এখানে তার বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে বিশিষ্ট কবি—মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের অগ্রগামী; কেননা, এঁদের প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা নজরুলের প্রথম কবিতাপুস্তকের কবিতাবলী প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁরা নজরুলের অনেক আগে থেকেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেছেন। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' (১৯২৩)-র কবিতাগুলি ১৩১৭ সাল (১৯১০)

থেকে ১৩২৯ সাল (১৯২২)-এর মধ্যে লেখা। মোহিতলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী'র প্রকাশ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে হলেও কবিতাগুলির জন্ম হয়েছিল ১৯১০ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র প্রকাশকাল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ এবং এতে সংকলিত কবিতাবলী মোটামুটি গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা। সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল নজরুলের অগ্রজ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর পূর্বে রবিমণ্ডলীর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান ও শক্তিশালী কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। সত্যেন্দ্রনাথের 'সবিতা' (১৯০০), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'অভ্র আবীর' (১৯১৫) 'হসন্তিকা' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। একাধিক কাব্যগ্রন্থ তো উভয়ের প্রথম কবিতা প্রকাশের আগেই আত্মপ্রকাশ করে। এই তথ্যগুলির উপর জোর দেওয়ার কারণ এই যে, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কবিদের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথের। অবশ্য এই প্রভাব যতটা ভাবের, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশভঙ্গির।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ, যেমন—দৈবে অবিশ্বাস, মানবতার জয়গান, অধ্যাত্মবোধের স্থলে প্রেমবোধের উজ্জীবন, চিত্তের স্ফূর্তি অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তির প্রাবল্য প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যভাব রবীন্দ্র-ধর্মানুসারী; তাই কোন নূতন যুগের পর্ব তিনি যথার্থভাবে উন্মোচন করেছেন—এমন বলা ঠিক নয়। তবে বিশেষ করে ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর পরবর্তীদের পক্ষে কাব্যনির্মাণের পথকে সুগম করেছে, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোনৈপুণ্য ও ভাষাব্যঞ্জনাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাবসমৃদ্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন সাধুবাদ শোনা যায় নি। সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মত জীবন ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ রূপের ধ্যানে ও গভীর দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হতে পারতেন না; জীবন ও প্রকৃতির বাহ্যরূপ ও সৌন্দর্যের উপাসনা করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তাই কাব্যবক্তব্যের বিচারে তাঁর অনেক কবিতাই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে যে বাস্তবতা ও সমাজধর্মনিষ্ঠার সূচনা

করেন, তাতে তিনি এক নবযুগের কবি হিসেবে বরণীয় হ'য়ে ওঠেন। তাঁর কাব্যের প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষ তার নানা সুখদুঃখ নিয়ে স্থানগ্রহণ করলে, সমাজ তার বিচিত্রসমস্যাজালে-জড়িত অবস্থাতেই এগিয়ে এল। এর ফলে সত্যেন্দ্র-কাব্যে রবীন্দ্র-আধ্যাত্মিকতা-বহির্ভূত একটি পথের আভাস পাওয়া গেল।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক অন্যান্য শক্তিশালী কবিবৃন্দ, যেমন—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতি সকলেই কমবেশীভাবে আত্মসমর্পণ করলেন রবীন্দ্রপ্রভাবের কাছে। রবীন্দ্রচ্ছায়ায় থেকে এঁরা সকলেই সুখপাঠ্য কবিতা অবশ্যই লিখেছেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে ভেদচিহ্ন এতো স্পষ্ট নয় যে বিশেষ ভাল করে আলাদাভাবে চেনা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের বহিরঙ্গে এমন একটি আপাত সারল্য ও সহজতা আছে যে তার অনুকরণের আকর্ষণে অনেকেই বিভ্রান্ত হন। অন্তরঙ্গের জটিলতা, আবর্ত ও গভীরতা তখন তাঁদের চোখেই পড়ে না। সেইজন্যে বহু কবি রবীন্দ্রানুকরণের কুসুমাস্তীর্ণ পথেই কবিখ্যাতির নিশ্চিন্ত উপায় খুঁজেছিলেন। এর ফল হয়েছিল মর্মান্তিক। বৈশিষ্ট্যহীন কাব্যপুষ্পে বাংলাকাব্যোদ্যান ভরে গিয়েছিল। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাস্তবতাবোধ ও সমাজধর্মনিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর ছন্দৈশ্বর্য ও ভাষার ব্যঞ্জনাসম্পদ নবযুগের জমি তৈরী করতে সহায়তা করলে। এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বেই কোন কোন রচনায় নবযুগের বাস্তব-সচেতনতা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের পরেই রবীন্দ্র-রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিদ্রোহ ঘোষিত হল। তদানীন্তন কাব্যের রহস্যময়তা, নৈতিকশুচিতা, সৌন্দর্যময় অতীন্দ্রিয়তা, আত্মকেন্দ্রিক ভাবতন্ময়তা প্রভৃতির স্থলে নূতন জীবনদর্শন নিয়ে এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে পালা-বদলের শুভশঙ্খধ্বনি শোনা গেল।

যতীন্দ্রনাথ নবযুগের কাব্যাদর্শকে সোজাসুজি ব্যক্ত করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রচ্ছন্নবিদ্রূপশাণিত তীক্ষ্ণ ভাষা ও ছন্দে।

"কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারোমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাশ!
সেই উপবন, মলয়পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশি, বিরহের ফাঁসি, হাসাকাঁদা গলাগলি!

নব ফরমাশ দেই তোমা, সাজো কলঙ্কের পর কলঙ্কে,
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো যাক্‌ পল্‌কে!

… … …

ঢেলে সাজো, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সূক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো!"[১]

ওজোগুণের একনিষ্ঠ উপাসক অঘোরপন্থী ও রূপতান্ত্রিক মোহিতলাল তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রকাশ করলেন অনবদ্য শব্দৈশ্বর্য ও দৃঢ় ছন্দের বন্ধনে।

"মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা, ছন্দ-বিলাসিনী!
কতকাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রাবিনাশিনী,
উদার উদাত্তগীতি গাও বসি' হৃৎপদ্মাসনে—
যে বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম-নিবাসিনী।"[২]

এর পাশাপাশি নজরুল কাব্যরচনার যে কৈফিয়ত দিয়েছেন, তার মধ্য থেকেই তাঁর কাব্যাদর্শ সম্পর্কে ধারণা করতে অসুবিধে হয় না।

"বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমরকাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

… … …

প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!"[৩]

১ ঘুমের ঘোরে (ষষ্ঠ ঝোঁক): মরীচিকা
২ পরায়: স্মর-গরল
৩ আমার কৈফিয়ৎ: সর্বহারা

নজরুল অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করেন নি, তাঁর কাব্য যুগের প্রয়োজন মেটাতে চেয়েছে জীবন ও জগতের কোন সূক্ষ্ম জটিল ও গভীর ভাবানুভূতি তত্ত্বকথার তিনি কারবারী নন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানে কবির আশ্চর্য মিল। 'বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়' লাইনে যেন নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয়েরই প্রতিধ্বনি—

"ভাবের কুবের ভাণ্ডারী হায়, নয় এ জনা এক্‌বারেই,
চিত্ত-সাগর মথন-করা চিন্তা-মণি-মুক্তা নেই।"[১]

এই 'বড় কথা বড় ভাব' কেন মাথায় আসে না নজরুল তার কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যথাবেদনার জন্যেই শুধু নয়, স্বজাতি ও স্বদেশের অপমান অত্যাচার বেদনা ও লাঞ্ছনাজনিত দুঃখের কারণেও কবি বড় কিছু চিন্তা করার অবকাশ পান নি। দুঃখবেদনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই নজরুলকে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল থেকে পৃথক একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। উক্ত তিনজন কবির মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, প্রজ্ঞা ও মননশীলতার অধিকারী না হয়েও নজরুল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত সর্বানুভূতির জোরেই বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্যসাধারণ আসন লাভ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের রূপবিলাসিতা, সৌন্দর্যভাবালুতা ও সৌখিন সাজসরঞ্জামের পরে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও মোহিতলালের দেহবাদ থেকে উদ্ভূত বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম বাংলা কাব্যে নূতন আস্বাদ ও আশ্বাস নিয়ে এল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সত্যকার ঋতুবদল সূচিত হল তখনই, যখন বিদ্রোহী নজরুল তাঁর চারণ-কবির কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,

"বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!"[২]

অথবা

"আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।"[৩]

১ অঞ্জলি : অভ্র-আবীর
২ বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা
৩ আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে : দোলন-চাঁপা

নজরুল নূতন যুগকে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর আশ্চর্য স্বাভাবিক ও নিখাদ কবিত্বের অর্ঘ্য দিয়ে।

"গর্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্ত্তমান।
আয় তরুণ
আয় অরুণ
আয় দারুণ
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাঁখায়!"[১]

নজরুল যুগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য ও বেদনাকে ভাষা দিলেন তাঁর প্রধানত হৃদয়-নির্ভর কাব্যে। পুরাতনের দৈন্যক্লান্তিপীড়িত জীবনকে ভেঙেই তো নূতনের প্রদীপ্ত ও অপ্রতিরোধনীয় আবির্ভাব। তাই ভয় করলে কি চলে? কবি নবযুগের উল্লসিত জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলেন।

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
... ...
ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্!

প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়: কণি-মনসা

কাল   ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর!—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!"[১]

জীবনের এই উল্লাস ও আবেগতরঙ্গ মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথের কাব্যে নেই। নজরুল কাব্যকে যেমনভাবে জীবনের নানাদিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন, মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ তেমনভাবে তা পারেন নি। তবে শব্দচয়নে, বাগ্‌ভঙ্গিতে ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ যে নজরুলের পূর্বসূরী, এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল, এই তিনজন কবিই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক আনন্দবোধ, মহৎ বেদনানুভূতি ও অতীন্দ্রিয় জীবনপ্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। মোহিতলালের শিক্ষাদীক্ষা, ঐতিহ্যপ্রীতি, বিশিষ্ট রুচি ও রূপতান্ত্রিকতা তাঁর বিদ্রোহকে একটি বিশেষ গাণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গি সংযত দৃঢ় ও কাঠিন্যযুক্ত। 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনে'র বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীপ্ত রূপ প্রকাশের ভিতর দিয়েই প্রধানত তাঁর বাস্তবতাবোধ প্রকাশিত। যতীন্দ্রনাথ জটিল জীবনাবর্তের গভীরে প্রবেশ না করে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বসংঘাতকে তাঁর মার্জিত শাণিত ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। সমাজের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের আর্তনাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর যে সমবেদনা ছিল তা কখনো একাত্মানুভূতি হয়ে ওঠে নি। মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহকে বহুগুণ বর্ধিত ও ব্যাপ্ত করে দিলেন নজরুল তাঁর অনন্তসাধারণ হৃদয়াবেগের বন্যায়। তাঁর কাব্যবক্তব্যে স্থান পেল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়বস্তু ও ঘটনা। কাব্যধর্মের আইনকানুনের শৃঙ্খল ভেঙে পড়ল তাঁর প্রাণবন্ত আবেগের দুরন্ত আঘাতে। তিনি তাঁর অগ্রজ কবিদ্বয়ের চেয়ে জনসমাজের হৃদয়ের অনেক কাছে এগিয়ে গেলেন, তাঁর কাব্যের অনেক অমার্জনীয় ত্রুটি সত্ত্বেও। এই বিদ্রোহের রূপভেদেই উক্ত কবিত্রয় বিশিষ্ট। মোহিতলালের বিদ্রোহের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে 'স্বপন-পসারী'র 'পরাজয়' কবিতায়।

"এত যে দুঃখ দিলে তুমি মোরে—করি নি তোমার নাম,
উল্কার মত জ্বলিল অক্ষি, তবু নাহি কাঁদিলাম!

১ প্রলয়োল্লাস: অগ্নিবীণা

কে চিনে তোমারে? কিসের করুণা?—বলি নাই, 'দয়া কর',
তব রোষ-ভয়ে করি নাই কভু নাম-জপ অবিরাম।

আঁধারের 'পরে আঁধার নেমেছে, অতল গহ্বরতলে
নামিয়াছি আমি, ক্ষীণ জানু মোর যতদূর টেনে চলে!
পদযোড়ে শেষে গড়ায়েছি, তবু করি নাই করযোড়,—
ভ্রূকুটি তোমার করে নাই বশ—লোকে 'নাস্তিক' বলে!"[১]

'কালাপাহাড়ে'র মধ্যে দেবতাজয়ী, অনমনীয়, বিদ্রোহী ও শক্তিমান মনুষ্যত্বের জয় বন্দিত।

"নিজহাতে পরি' শিকল দু'পায়, দুর্বল করে যাহারে নতি,
হাত যোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দিরবাসী অমরাগণ!
ছাড়ি লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!"[২]

যতীন্দ্রনাথ চেতন-সত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর দুঃখবাদের মূলে রয়েছে জড়বাদ। যতীন্দ্রনাথ সরবে জানান—

"প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।"[৩]

যতীন্দ্রনাথের কাছে—

"জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালী।"[৪]

নবযুগের মানবতার জয়গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যতীন্দ্রনাথ 'দুঃখবাদী' (মরুশিখা) কবিতায় ঘোষণা করেন,—

১ পরাজয়: স্বপন-পসারী
২ কালাপাহাড়: বিস্মরণী
৩ ঘুমের ঘোরে (প্রথম ঝোঁক): মরীচিকা
৪ ঐ

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।"

মানুষের আত্মশক্তি ও পৌরুষের উপর গভীরভাবে আস্থাবান বিদ্রোহী কবি 'অপমান' (মরুশিখা) কবিতায় বলেছেন,

"চিরবিদ্রোহী মানব-আত্মা—আজিও তোমার মানে নি বশ,
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্মা-যশ।
কাম পুড়াইয়ে স্থজিয়াছে প্রেম, দেহ মথি তারা তুলিছে স্নেহ ;
মনের ফানুস্ ছেড়েছে আকাশে, আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ।
এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র,—তাই নর তার জবাব দিতে
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।"

মানুষের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে এই সুগভীর বোধ, তার বীর্য ও পৌরুষের উপর অবিচল বিশ্বাস ও সুস্থসবল জীবনপ্রীতি, এ সমস্তই উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ফল। এই জাগরণ সম্ভবপর হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার কল্যাণে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে ও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের ফলে হিন্দুধর্মের এক মহাসংকট দেখা দেয়। প্রথমে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুরা নিজেদের ধর্মরক্ষা এবং পরে ধর্মসংস্কারের চেষ্টায় ব্রতী হন। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা, অপরদিকে সংস্কৃত হিন্দুধর্ম—এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলেও ক্রমে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়েছিল, কেননা পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরও অন্তস্তলে ছিল একটি সুপরীক্ষিত সত্য। এই সত্যের মূলমন্ত্র—হিউম্যানিজম (humanism)। এই আদর্শের লক্ষ্য হচ্ছে—মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, তার জীবনের কেন্দ্রস্থ রহস্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং সুস্থ সবল জীবনপ্রেম। এই প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থকারের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ' গ্রন্থটি পঠনীয়। পাশ্চাত্ত্যের হিউম্যানিজমের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনকে মোক্ষলাভের পথে না নিয়ে গিয়ে জাতির জীবনকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, তার প্রাণে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। কিন্তু নবযুগের সমাজমুখী সাধনার জয়যাত্রা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমুখী সাধনায় ব্যাহত হয়েছিল। কেননা, ভাবপন্থী রবীন্দ্রনাথ সংসারের উপরে ধ্যান ও বস্তুর উপরে ভাবকে স্থান দিয়েছিলেন। কর্মময় মাটির পৃথিবী ছেড়ে তাঁর কবিতা ঘর বেঁধেছে

অনন্ত আকাশের ভাবলোকে। কাব্যজীবনের প্রথম দিকেই 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২)-এর 'গান আরম্ভ' কবিতায় তিনি বলেছেন,

"অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।"[১]

'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী' (১৮৯৪)-র যুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মর্ত্যপ্রীতি ও দেহস্পর্শমুখর প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালী' (১৮৯৬), 'কল্পনা' (১৯০০), 'কণিকা' (১৯০০) প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে তাঁর অধ্যাত্মানুভূতিই প্রবল। এই অধ্যাত্মানুভূতি-সঞ্জাত রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রথম সবল বিদ্রোহ হানলেন সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল। ১৩২৯ সালের (১৯২২) শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃদ্ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ব্যক্তিগতজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ নাস্তিক বলে পরিজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভগবদ্‌ভক্তিপ্রধান কবিতাগুলি পাঠ করলে মনে হয় যে তিনি সত্যকার নাস্তিক ছিলেন না। তবে তিনি যে দৈবে খুব আস্থাবান ছিলেন না এবং সাধারণভাবে চৈতন্যসত্যে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল, এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। দৈবে-ভরসাহীন মোহিতলাল ও জড়বাদী যতীন্দ্রনাথের কথা তো পূর্বেই বলেছি। অধ্যাত্মমার্গমুখী বাংলা কাব্যকে এঁরা তিনজনেই যথার্থভাবে জগৎ ও জীবনমুখী করে তুললেন। বাংলা কাব্যে নূতন যুগের ঘণ্টা বাজল। রবার্ট বার্নসের কাব্যসত্য বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে মানুষের জয়গানে ধ্বনিত হল,

"What though on hamely fare we dine,
Wear hoddin grey, an' a' that ?
Gie fools their silks, and knaves their wine,
A man's a man for a' that.
For a' that, an' a' that,
Their tinsel show an' a' that,

---

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ম খণ্ড ৪র্থ সং : কলকাতা ১৯৪২ : পৃ ৩

The honest man, tho' e'er sae poor,

Is king o' men for a' that."[১]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনর সময় রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন তাঁর অনবদ্য কবিতা ও গানের অগ্নিসম্ভার নিয়ে। স্বদেশী আন্দোলন তাঁর কাছ থেকে আশাতীত প্রেরণা, সাহায্য ও সমর্থন লাভ করলে। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় দেশজোড়া হাহাকার, নৈরাশ্য ও আর্থিক সমস্যা কবিকে গভীরভাবে বিচলিত করতে পারলে না। মহাযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি 'বলাকা' (১৯১৬)-তে মহাযুদ্ধকালীন ভগ্নহৃদয়, দারিদ্র্যজর্জর ও নৈরাশ্যপীড়িত দেশ ও সমাজের বিশেষ কোন ছাপ পড়ল না। মহাযুদ্ধের শেষে দেখা দিলে নিদারুণ আর্থিক সংকট। জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে গেল অমানুষিক হত্যাকাণ্ড। পাশ হল কুখ্যাত রাউলাট আইন। দেশে চলল বিদেশী শাসকদের অকথ্য অত্যাচার ও শোষণের নিষ্ঠুর অভিযান। এর মধ্যে আশার বাণী বহন করে আনলে রুশিয়ার সর্বহারাদের বিপ্লবের সাফল্য। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

এইসময় রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' শেষ করে 'পূরবী'র যুগে রয়েছেন। দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা-নৈরাশ্যকে রূপ দিতে আর এগিয়ে এলেন না তিনি। দেশের প্রবল বিক্ষোভের বন্যাকে ধারণ করার ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের শৌখিন, বিলাসী ও ললিত কাব্যের আয়ত্তের বাইরে। মোহিতলাল তাঁর অতিআত্মসচেতন কাব্যের গণ্ডি বাড়িয়ে দেশের বৃহৎ জনসমাজের বেদনানৈরাশ্যকে বুকে টেনে নিতে পারলেন না। যতীন্দ্রনাথ সামাজিক অনাচারঅত্যাচারকে রূপায়িত করতে গিয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আত্মীয়তার অভাবে যুগের প্রতিভূত্ব করতে অসমর্থ হলেন।

এই যুগসন্ধিক্ষণে দেখা দিলেন নজরুল। বাল্যকালেই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জীবনের রুদ্ররূপের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছিল। পল্লীগ্রামের মাটিঘেঁষা মানুষদের তিনি অন্তরের আত্মীয়তাসূত্রে বাঁধতে সমর্থ হয়েছিলেন। লেটো নাচের দলে ঘুরে ঘুরে বিচিত্র মানব চরিত্রের কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। মহাযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব তিনি যথেষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তার উপর সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ

১ **Robert Burns : A Man's a Man for A' That**

থাকাতে তাঁর হৃদয়ে দেশের পরাধীনতার জন্যে বিক্ষোভের বারুদ সঞ্চিত হয়েছিল। অন্যদিকে মুজফ্ফর আহমদ প্রভৃতি সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে শ্রমিক কৃষক-সংগ্রামের রূপ ও তাঁর কাছে অনেকটা বাস্তবিক হয়ে উঠেছিল। দেশের মুক্তিআন্দোলনের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সব কারণে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্যসাধনার উত্তরসাধক হয়েও নজরুল তাঁর বিদ্রোহবিক্ষোভে সকলকে বহুদূর অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শক্তিতে সমস্ত কৃত্রিমতা ও ভাবাবেশের আবরণ ছিন্নভিন্ন করে মেঘমুক্ত সূর্যের মত ঝলমল করে উঠল। যুগের প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিলেন তিনি। তাঁর মধ্যেই যুগ তার প্রতিভূকে খুঁজে পেলে। নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে এত কথা বলা হল এইজন্যে যে, এই পথেই প্রধানত তাঁর প্রভাব পড়েছে তাঁর উত্তরসাধকদের উপর।

নজরুল একান্তভাবে ভগবদ্‌বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভগবান মনুষ্যত্বেরই পূর্ণ প্রকাশ। ভগবানের হাতে শোষণ অত্যাচারের বিচার ও দণ্ডের ভার তুলে না দিয়ে তিনি মানুষকেই উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন আত্মচেতনায়। তাঁর বিদ্রোহ নূতন যুগের মানবধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অত্যাচার, অন্যায়, শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনে তিনি মুখর।

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!"[১]

নূতন যুগের মানুষের বীর্যবত্তা ও পৌরুষের এই জয়গান উইলিয়ম আর্নেস্ট হেনলের 'Invictus' কবিতায় আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

[১] বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find me, unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate :
I am the captain of my soul."[১]

'I am the master of my fate : I am the captain of my soul' —এই হচ্ছে নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ আত্মবিশ্বাসী ও দেববিদ্রোহী মানুষের মর্মবাণী। নজরুলের দৃষ্টিতে ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সাম্য, আনন্দ ও ভালবাসার বাণীই উচ্চারিত। একদল লোভী স্বার্থপর ও হিংস্র মানুষ ভগবানের সৃষ্টিকে বৈষম্য ও বিরোধে কলুষিত করছে। এরা শয়তানেরই সমগোত্রীয়। তাই নজরুলের বিদ্রোহ এদের বিরুদ্ধে। তাঁর ধারণা—নিপীড়িত প্রবঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের অন্তরে আত্মচেতনা প্রজ্বলিত হলেই তারা শয়তানের উচ্ছেদ সাধন করে ভগবানের সৃষ্টিকে সুন্দর ও স্বাভাবিক করতে সমর্থ হবে। নজরুল 'স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু' হয়েছেন ও শয়তানের মত ধ্বংসকারী রূপ ধরেছেন এই সৃষ্টির দুঃখ লাঞ্ছনা ও অসুন্দরের অবসান ঘটাতে। রুদ্রদেবতা শিবই কবির আরাধ্য। মনুষ্যত্বের বোধনে তিনি গেয়ে উঠেছেন,

" 'নাই দানব
নাই অসুর—
চাই নে সুর,—
চাই মানব!'—

১ William Ernest Henley : Invictus

বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার!"[১]

নজরুল নবজাগরণের উৎস আবিষ্কার করেছেন। যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী সৃষ্টিশীল কুলিমজুরদের বেদনার পথেই নবযুগের পদধ্বনি শুনেছেন তিনি।

"তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
... ...
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!"[২]

নব উত্থানের আনন্দে তিনি উদ্বেল। শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানব অস্থির ও উদ্দাম হয়ে উঠেছে আত্মসচেতন বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ ভগবানের সৃষ্টি-ধ্বংসকারী দৈত্যসদৃশ অত্যাচারী একদল মানুষের বিরুদ্ধে।

"ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার!
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ—
শতশতাব্দী ভাঙে নি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!'"[৩]

নজরুলের এই বিদ্রোহ ও পরাধীনতার মর্মজ্বালার সঙ্গে রবার্ট বার্নসের অদম্য স্বাধীনতার সংগ্রামোন্মাদনার মিল দেখা যায়।

"By oppression's woes and pains,
By your sons in servile chains,
We will drain our dearest veins,
But they shall be free!
Lay the proud usurpers low!
Tyrants fall in every foe!

১ আগমনী: অগ্নিবীণা
২ কুলিমজুর (সাম্যবাদী): সর্বহারা
৩ ফরিয়াদ: সর্বহারা

Liberty's in every blow !—
Let us do or die !"[১]

নজরুল ইস্‌লাম স্বভাবকবি। স্বভাবকবি তাঁকেই সাধারণত বলা হয় যিনি হৃদয়াবেগের বশীভূত, যিনি বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আবেগকে শাসনে রাখতে অসমর্থ, যাঁর মধ্যে আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ ভারসাম্য অনুপস্থিত। স্বভাবকবির কাব্যে হার্দ্যরসের মাত্রাতিরিক্ততার পাশাপাশি চিন্তাদৈন্যসম্ভূত স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রাচুর্য দেখা যায়। স্বভাবকবির বিশেষ ধর্ম সাময়িক ঘটনা-প্রিয়তা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর মধ্যেই প্রথম সাময়িক বিষয়ের উপর কাব্যরচনার প্রেরণাটি ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই গুণটিই ঈশ্বর গুপ্তর তৎকালীন জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সাময়িক ঘটনার প্রতি জনমনের একটা নৈকট্য-জনিত আকর্ষণ, উত্তেজনা ও কৌতূহল থাকে। তাই এই সব ঘটনার বিষয়ে রচিত কাব্য সহজেই জনমনের কাছে গৃহীত ও আদৃত হয়। কিন্তু এর একটি অন্ধকার দিকও আছে। সাময়িক বিষয়ের প্রভাবে উদ্দীপ্ত আবেগ দানা বাঁধবার যথেষ্ট অবসর পায় না বলে এই জাতীয় কাব্যে উত্তাপ থাকলেও বাঞ্ছিতমাত্রায় আত্মস্থতার সংযম ও কাঠিন্য থাকে না। ফলে অধিকাংশ কবিতারই অপমৃত্যু ঘটে স্বাভাবিকভাবেই। খুব স্বল্পসংখ্যক কবিতাই সাময়িক বিষয়ের উপর লিখিত হয়েও কালোত্তরণে সমর্থ। ঈশ্বর গুপ্তর পর সাময়িক বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবিতা লিখে যাঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। পরে সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক এই শাখাটি যথেষ্ট মাত্রায় পুষ্ট হয়। যতীন্দ্রনাথের মধ্যেও সাময়িক ঘটনার বিষয়ে কবিতা রচনার ঝোঁক দেখা যায়। তবে নজরুল এই ধারার যে পুষ্টিসাধন করেছিলেন তা অভূতপূর্ব। তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতা ও গান সাময়িক বিষয়কে নিয়েই রচিত। এইটি তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। তিনি চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর মৃত্যু সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন; সর্দা বিল, লীগ অব নেশন, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স, সাইমন কমিশন প্রভৃতি বিষয়বস্তুকেও তিনি সংগীতরূপ দান করেছেন; আবার অসহযোগ আন্দোলন ও কৃষকমজুরসমস্যার বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনি অগ্নিবীণা বাজাতে সমর্থ হয়েছেন।

১ Robert Burns : Bruce's March to Bannockburn

নজরুলের মানবিক প্রেম দেহস্পর্শপ্রতপ্ত। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ভিতরে তাঁর স্নিগ্ধকোমল প্রেমিকরূপই পরিস্ফুট। প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যেও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সৌন্দর্যই প্রকাশিত। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর মানবিক প্রেম ও প্রাকৃতিক প্রেম একাকার হয়ে গেছে।

মানবিক প্রেমের ক্ষেত্রে নজরুলের সবচেয়ে বড় পূর্বসূরী গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতলাল মজুমদার। তবে নজরুলের দেহকেন্দ্রিক প্রেমের ভিতরে যে ভোগোন্মুখতা, যে দেহস্পর্শমুখরতা, যে তীব্র মদিরতা দেখা যায় তার তুলনা পাওয়া ভার। প্রেমের অশ্রুকোমল রূপটিই নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে বেশী। নজরুলের প্রেমধারণায় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু বৈষ্ণবকবিকুলের প্রেম যেখানে অপার্থিব ও পরিশুদ্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেম যেখানে ধর্মচেতনায় উদ্ভাসিত, নজরুলের প্রেম সেখানে অনেক বেশী লৌকিক ও প্রাকৃত। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের Burns, Keats, Byron, Daniel প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের ইন্দ্রিয়চেতনাপ্রধান কবিতাগুলির কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। কবিতার উৎকর্ষবিচারে এই সব কবিতা নজরুলের কবিতার চেয়ে অনেক বেশী উঁচুমানের হলেও প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে নজরুল-কাব্যের সমধর্মিতা অভিনিবেশযোগ্য। নজরুলের পূর্বেও বাংলা কাব্যে যে দেহবাদ ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দেহবাদ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেইএকটা অতীন্দ্রিয়তার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। একমাত্র গোবিন্দ দাসের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেম তার নগ্ন সৌন্দর্য ও কামনা নিয়ে কতকাংশে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর প্রেম গ্রাম্যতাদোষমুক্ত না হওয়ায় বেশীর ভাগ স্থলেই স্থূল আবেদনের সৃষ্টি করেছে। রূপতান্ত্রিক মোহিতলালের কাব্যেই প্রথমে দেহবাদী প্রেম তার ভোগতৃষ্ণা নিয়ে উচ্চ-কোটির শিল্পিক রূপে দেখা দেয়। কিন্তু তবুও তাঁর প্রেম দেহ থেকে দেহাতীতের ক্রন্দনে জর্জরিত। মোহিতলালের প্রেমের মধ্যে একদিকে যেমন বৈষ্ণবতার প্রভাব, অপরদিকে তেমনি সুফীবাদের ছায়া বিদ্যমান। মোহিত-লালের দেহবাদের গভীরে হুইটম্যান, লরেন্স ও বোদলেয়ারের দেহকামনা-জনিত উত্তাপ খুব বেশী করে অনুভূত হয়। নজরুলের প্রেম মোহিতলালের প্রেমের মতই দেহকামনায় উন্মুখ। তবে অনেক স্থলে গ্রাম্যতাদোষ থাকাতে তাঁর প্রেমে ঘনিষ্ঠ জীবনস্পর্শ থাকলেও তা শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে নি।

নজরুল-কাব্যে নারীত্বের যে উদ্বোধন হয়েছে তার মূলে রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব। নারী পুরুষের ছায়ামাত্র নয়, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই নারীর অধিকার আছে এবং জীবন ও সমাজে তার একটি স্বতন্ত্র সত্তা বর্তমান, এইসব ধারণা নবজাগরণের সময়েই জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। এই ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অগ্রণী হন রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। হিন্দুসমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীগণ স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদির দাবিতে অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বমণ্ডিত রসরূপ প্রকাশিত হয়। এরপর যুগধর্মানুসারে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার মহাবাণী উচ্চারণ করেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যকর্মীর রচনাতেও নারীর মহত্ত্ব ও দাবি স্বীকৃত। নজরুল-কাব্যেও নারীত্বের ব্যাপক জাগরণের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। সমাজসচেতন ও যুগধর্মপরায়ণ নজরুল বলে উঠেছেন, "আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।" তিনি 'বারাঙ্গনা'কেও নারীর মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক। তাঁর কাছে নারী শুধু ইন্দ্রিয়ভোগের উপকরণমাত্র নয়। তিনি নারীর কল্যাণশক্তিতে আস্থাশীল। মানুষের গড়া অত্যাচার, পরাধীনতা, কুসংস্কার ও স্বার্থপরতার চক্রান্ত থেকে নারীকে উদ্ধার করে তিনি তাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর।

"জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা!
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা॥
... ...
ধু ধু জ্ব'লে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি।
জাগো মাতা কন্যা বধূ জায়া ভগ্নি!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা!"[১]

নজরুল নারীর কল্যাণ-শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বিদ্রোহ ও শৌর্য-বীর্যের মূলে যে সব মনোবৃত্তি ছিল তাদের মধ্যে নারীপ্রেম অন্যতম। শেলীর

১ নজরুল ইসলাম : আলেয়া

সঙ্গে এখানে তাঁর অন্তরঙ্গ মিল দেখা যায়। Andre' Maurois শেলীর প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"His personal experience had taught him that only the love of a woman can inspire a sublime courage."[১]

পরাধীনতা কুসংস্কার প্রভৃতির প্রতি বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা-স্পৃহার বিষয়ে বায়রণের সঙ্গে নজরুলের ভাবচিন্তার মিল থাকলেও, নারী সম্পর্কে দুজনের মতের মধ্যে সমুদ্রপ্রমাণ প্রভেদ ছিল। বায়রণের কাছে নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নি। তাঁর মত নারীবিদ্বেষী ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। বায়রণ স্পষ্টই স্বীকার করেছেন—

"Like Napoleon, I have always had a great contempt for women ; and formed this opinion of them not hastily, but from my own fatal experience. My writings, indeed, tend to exalt the sex ; and my imagination has always delighted in giving them a beau ide´al likeness, but I only drew them as a painter or statuary would do—as they should be...They are in an unnatural state of society. The Turks and Eastern people manage these matters better than we do. They lock them up, and they are much happier. Give a woman a looking-glass and a few sugar-plums, and she will be satisfied."[২]

বায়রণের কাছে নারী ইন্দ্রিয়-সেবার মর্যাদাহীন সামগ্রী হলেও তাকে বাদ দিয়ে তাঁর চলে নি। নারীর প্রতি আসক্তি ও ভোগ-তৃষ্ণাই প্রধানত বায়রণের জীবনকে চালিত করেছে। নারীর প্রতি এই যুগপৎ ঘৃণা ও আসক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বই বায়রণের জীবনব্যাপী ট্র্যাজেডির মূল কারণ। কখনো তিনি বলেছেন,

"I have not loved the world, nor the world me ;..."[৩]

আবার কখনো তিনি ঘোষণা করেছেন,

"It is unlucky we can neither live with nor without these women."[৪]

১ Andre' Maurois : Ariel Reprinted : London 1950 : p. 205
২ Andre´ Maurois : Byron Reprinted : London 1950 : pp. 155-6
৩ Byron : Childe Harold's Pilgrimage Canto III
৪ Andre´ Maurois : Byron : p. 176

নজরুল ভারতীয় ভাবধারার আদর্শে নারীকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, তার মধ্যে বিশ্বের শুভকর শক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং তাকে সমাজ ও সভ্যতার অন্যতম নির্মাতা বলে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। নারীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ অভিনন্দন অভিনিবেশযোগ্য।

"জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি'।"[১]

॥ ২ ॥

সংগীতের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি রবীন্দ্রসংগীতই গাইতেন। "আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি" গানটি প্রায়ই তৎকর্তৃক গীত হত। তারপর তিনি নিজে গান লিখে তাতে সুর দিয়ে গাইতে আরম্ভ করেন। আরবী ও পারসী সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে তাদের দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। তাঁর অনেক গানে তিনি আরব পারস্য প্রভৃতি বিদেশী সংগীতের সুর যোজনা করেছেন। ভারতীয় সংগীতের বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খানের কাছে তিনি ওস্তাদী গানের পাঠ নিয়েছেন। তাঁর গীতিগ্রন্থ 'বনগীতি' (প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৯)-র উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছেন, "ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতকলা-বিদ্ আমার গানের ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত্ মোবারকে।" এ ছাড়া 'লেটো'র দলে থাকাকালে বাংলার লোকসংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। দেশীবিদেশী বহু সংগীতের সুরের আমদানী তাঁর সংগীতে দেখা যায়। এই সব সাংগীতিক উত্তরাধিকার নিয়েই নজরুল-প্রতিভা সংগীতের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে শিল্পকলার ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলে। এই শতাব্দীর অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের স্পন্দন অনুভব করে তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে লিখলেন,

১ নারী (সাম্যবাদী) : সর্বহারা

"আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হতে ছাড়া পেয়েছে। এখন আমাদের সংগীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রেখে না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নেই।"[১]

ভারতবর্ষের সংগীতের ক্ষেত্রে যখন উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের একঘেয়ে পৌনঃপুনিকতা চলছিল তখন রবীন্দ্রনাথ দেশী সংগীতপদ্ধতির আদর্শে ও বাংলা গানের ঐতিহ্যপথেই তাঁর অনবদ্য গীতাবলী রচনা করে সংগীত-সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রভেদ সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ যা বলেছেন এই প্রসঙ্গ তা চয়নযোগ্য।

"রবীন্দ্রনাথের গান হল "দিশী" সংগীত পদ্ধতির গান এবং সেই একই আদর্শে রচিত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ কথায় বাঁধা নানাপ্রকার হৃদয়াবেগকে রাগিণী বা সুরে বেঁধে দিলেন তাকে আরো মর্মস্পর্শী করে তোলবার জন্যে। তাই এতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মত সুরবিহারের স্থান হল না। দেশী আদর্শে রচিত বলেই আজ তা বাংলাদেশে জনসাধারণের গানে পরিণত হতে চলেছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষেত্রে সুরযোজনায় ও ছন্দবৈচিত্র্যবিধানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণী থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করিলেও দেশী সংগীতের গীত-পদ্ধতি পরিহার করেন নি। যখন তিনি ইওরোপ ও অন্যান্য দেশের সংগীতরীতি থেকে সাহায্য নিয়ে তাঁর গানের সম্পদ বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত,তখনও তিনি বাংলার নিজস্ব দেশী গানের বিন্যাসপদ্ধতিকে ভোলেন নি। কথা ও সুর মিশে রবীন্দ্র-সংগীতে যে সহজ সরল রূপ ফুটে উঠেছে তার সার্থকতা সুরসাধনায় সমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের চেয়ে মোটেই কম নয়। উচ্চাঙ্গ সংগীত যথেষ্ট সাধনাসাপেক্ষ বলে সংগীতপিপাসু জনসাধারণের জন্যে বাংলাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে দেশী আদর্শে গান রচিত হয়ে এসেছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মত আঙ্গিক-প্রকরণকে প্রাধান্য না দিয়ে বাংলা গান নানা ছন্দ ও রসে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের পথেই নজরুলের আবির্ভাব। তিনিও বাংলা গানকে বিচিত্র উপাদানে পুনর্গঠিত করলেন। তাঁর রচনা রবীন্দ্রনাথের রচনার চেয়ে জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর গ্রহণোপযোগী বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাদের অনেক কাছে এগিয়ে গেলেন। নজরুলের অজস্র গীতিবর্ষণে এককালে

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতের মুক্তি
২ শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য (দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬২)

বাংলাদেশ প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। বিষয় ও সুরবৈচিত্র্যের গৌরবে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে খুব ন্যূন নন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি সংগীতকারের কাছে নজরুল কমবেশী ঋণী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পাশ্চাত্ত্য সংগীতের আদর্শে বাংলা সংগীতে বৈচিত্র্য-সম্পাদনের প্রয়াসী হন। সুরেন্দ্রনাথ টপ্পা ও খেয়ালের সংমিশ্রণে যে নূতন রীতির জন্ম দেন তার নাম টপ্-খেয়াল। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দিলীপকুমার রায় খেয়াল ও ঠুংরীর সমন্বয়ে ঠুং-খেয়াল বলে একটি মিশ্র সুর সৃষ্টি করেন। তাছাড়া আধুনিক ঢঙের কিছু কিছু কীর্তনও তৎকর্তৃক রচিত হয়। নজরুলের সমসাময়িক হিমাংশুকুমার দত্তর নানা সুরের মিশ্রণ ও ভাঙাগড়ার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়। অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের সুর-বৈচিত্র্যও নজরুলকে প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে নজরুলগীতি বিশেষ গৌরবের অধিকারী। তাঁর স্বদেশাত্মবোধক গীতি, মানবিক প্রেমগীতি, ভক্তিমূলক গীতি, প্রকৃতিগীতি ও হাসির গান বাংলা গানের ঐতিহ্যের আশ্রয়েই রচিত। এগুলি যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, তাঁর প্রতিভার স্পর্শে নূতনভাবে সঞ্জীবিত।

স্বদেশাত্মবোধক গীতির মধ্যে মাতৃভাষাপ্রীতি, পরাধীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের সংকল্প ও আকাঙ্ক্ষা, জাতীয়তাবোধ, স্বদেশ তথা স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি ব্যক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নজরুল-যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক দেশাত্মবোধক গীতি জন্ম লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামনিধি গুপ্তর 'নানান দেশে নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা'; অতুলপ্রসাদ সেনের 'আ মরি বাংলা ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা', 'বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু রবে', 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী! উঠ আদি জগৎ-জন-পূজ্যা'; 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর'; গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে' ও 'পরে দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্'; মনোমোহনের 'দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন'; কামিনীকুমার ভট্টাচার্যের 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি'; রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায়

ভালবাসি', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে','বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান' ও 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' এবং মুকুন্দ দাসের 'আয় রে বাঙালী, আয় সবে আয়, আয় লেগে যাই দেশের কাজে' ও 'আমি গাইব কি আর গান'। স্বাদেশিক গানের এই ঐতিহ্যের ধারাতেই নজরুল দেশাত্মবোধক গান প্রণয়ন করেছেন। তবে নজরুলের সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত জীবনের লাঞ্ছনা পীড়ন দারিদ্র্য ইত্যাদির জ্বালা, বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচার প্রভৃতি তাঁর স্বদেশী গানকে যে পরিমাণে বীর্যব্যঞ্জক করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তার তুলনা পাওয়া সোজা নয়।

মানবিক প্রেমগীতির মধ্যে নজরুলের গজলগুলি সর্বোৎকৃষ্ট। নজরুলের পূর্বেই অতুলপ্রসাদ গজল রচনা করেছিলেন। গজল পারস্যদেশের প্রেমগীতি। অতুলপ্রসাদ কর্তৃক যে গজল প্রণীত হয়, তা অত্যন্ত উর্দু ঐতিহ্য-ঘেঁষা বলে তার মধ্যে বাংলাগানের চরিত্রটি ভালভাবে প্রস্ফুটিত হয় নি। নজরুলই প্রথম বাংলা গানের কাঠামোতে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে গজল রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য প্রেমগীতিতে রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রেম যেখানে সীমা থেকে অসীমের অভিসারী, নজরুলের প্রেম সেখানে মুখ্যত দেহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

ভক্তিমূলক সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুলের ইসলামীয় সংগীত অপূর্ব। তাঁর শ্যামা সংগীত রামপ্রসাদের আদর্শে রচিত। কীর্তন বাউল প্রভৃতি গানে নজরুলের উপর রবীন্দ্রপ্রভাব খুবই বেশি।

প্রকৃতিপ্রেমগীতিতে নজরুল প্রধানত রবীন্দ্রানুসারী। কোন কোন ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়।

নজরুল নানারকমের হাস্যরসাত্মক গান লিখেছেন। ব্যঙ্গাত্মক গানে তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙ্গাত্মক গানে নজরুলের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী নৈকট্য অনুভূত হয় রজনীকান্ত সেনের। রজনীকান্তের 'মৌতাত' ('হরি বল্ রে মন আমার, নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার'), 'উঠে প'ড়ে লাগ' ('তোরা, যা কিছু একটা হ'), 'খিচুড়ি' ('ভারি সুনাম ক'রেছে গুণগ্রাম') প্রভৃতি গান নজরুলের রুচিকে মনে করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার সংস্কৃতি জীবনে নজরুলের অবদান

॥ ১ ॥

বাংলার সংস্কৃতিজীবনের দু'টি বিশেষ ক্ষেত্র, সাহিত্য ও সংগীত বিভাগ নজরুলের অসামান্য দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলার সংস্কৃতিজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নজরুল। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্য সবচেয়ে সার্থক রসরূপ লাভ করেছে নজরুলের কবিতা ও গানে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতিভার বৈচিত্র্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। প্রথমে তাঁর সাহিত্য-কীতির আলোচনা ক'রে পরে তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার কথা বলা হবে। সাহিত্য ও সংগীত এই দুইটি বিভাগে তাঁর অবদানের তুলনামূলক বিচার করলে তার সাংগীতিক প্রতিভাই অধিকতর উৎকর্ষসম্পন্ন বলে মনে হয়।

॥ ২ ॥

সাহিত্য বিভাগের মধ্যে কাব্যেই তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি সবচেয়ে বেশী। নজরুল উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটক রচনা করলেও মুখ্যত কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সবচেয়ে লোকবল্লভ কবি নজরুল ইস্‌লাম। সবদিক বিচার করলে কবিত্বশক্তিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। অতিআধুনিক বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র একটি পথ বেছে নিতে প্রথমদিকে সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করেছে তাঁর প্রতিভা। তাঁর প্রথমদিককার কবিতায় সত্যেন্দ্র দত্তীয় আমেজ থাকলেও তাতে স্বকীয়তার ঘাটতি ছিল না। সাময়িক ঘটনা-বলীকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়াতে নজরুলের অনেক কবিতা তদানীন্তন কালের দাবি মিটিয়েই নিঃশেষিত হয়ে গেছে, তারা স্থায়িত্বের স্বর্গলোকে

পৌঁছতে পারে নি। তাঁর আবেগনির্ভর স্বভাবকবি মন সে যুগের চারণ-কবি হ'য়ে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যে গরীয়ান হয়েছে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চিরকালের সুর বাজাতে গিয়ে সে ব্যর্থতা বরণ করেছে। অবশ্য নজরুলের কিছু কিছু কবিতা যুগের রঙে রঙিন হয়েও নিত্যকালের জ্যোতিতে ভাস্বর। স্বাভাবিক প্রেম থেকেই নজরুলের বিদ্রোহী ও প্রেমিক, এই দুইরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতাতেই নজরুলের কৃতিত্ব সমধিক পরিস্ফুট। তাঁর প্রেমব্যঞ্জক কবিতায় দেহকেন্দ্রিক প্রেমের উত্তপ্ত স্পর্শ থাকলেও বাংলা কাব্যের এই বিভাগকে তিনি তেমন কোন বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি। বিদ্রোহীভাবের মধ্য দিয়েই মুখ্যত তাঁর প্রভাব পরবর্তীদের উপর বিস্তৃত হয়েছে। অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ, অসতর্ক, সাময়িকতাশ্রয়ী ও উত্তেজনাসক্ত হওয়াতে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নজরুল আশাপ্রদ উৎকর্ষবিধান করতে সমর্থ হন নি। এদিক দিয়ে বাংলা কাব্যের উত্তরসাধকেরা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ঋণে আবদ্ধ নন।

বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যা লিখেছেন সর্বতোভাবে গ্রহণীয় না হলেও এ প্রসঙ্গে তা উদ্ধারযোগ্য।

"নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি—এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে-আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ সে-খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় নি—অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধু হৈ-চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে—একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে ঘোলা।"[১]

নজরুল স্বভাবকবি। তাঁর মধ্যে আবেগের প্রাধান্য অত্যধিক। আবেগকে উপলব্ধি করতে বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, কেননা কতকগুলি সাধারণ হৃদয়বৃত্তি এই উপভোগের সহায়ক। আবেগনির্ভর কবি সহজেই পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেন। কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা এই আবেগ সংযত

১ বুদ্ধদেব বসু: নজরুল ইস্‌লাম (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

না হলে তা উচ্ছৃঙ্খল এবং শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রজ্ঞার সাহায্য ব্যতিরেকে আবেগের প্রকাশে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায় না। প্রজ্ঞার দ্বারা বিচিত্রিত না হলে এই আবেগ পৌনঃপুনিকতার চোরাগলিতে ঘুরপাক খেতে বাধ্য। প্রখ্যাত সমালোচক I.A. Richards-এর মতে কবিতা হচ্ছে—'supreme form of Emotive language.' আবেগময় ভাষার এই উৎকৃষ্ট রূপ প্রজ্ঞার সহায়তা ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব। নজরুলের মধ্যে যে প্রাণবন্ত আবেগ ছিল তা তাঁর বীর্যব্যঞ্জক কবিতাগুলিকে লোকপ্রিয় করেছিল সন্দেহ নেই। বস্তুত আবেগপ্রাবল্যই বিদ্রোহ বিক্ষোভ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কবিতাকে সহজেই আবেদনপূর্ণ করে তুলতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে আবেগজনিত হৈ-চৈটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রজ্ঞার দ্বারা এই আবেগ যথাযথভাবে চালিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে নজরুলের আবেগপ্রধান কবিতায় একঘেয়েমি দেখা দিয়েছে এবং তাতে পরিপক্কতার কোন রঙ ধরে নি। প্রেম বা প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতাবলীতে নজরুলের হৈচৈ ও চড়া গলার স্বর খুবই কম। এখানে কবি আশ্চর্যভাবে রসনিমগ্ন। এই সব কবিতায় উদ্দীপনার পাশাপাশি একটি গ্রাম্যপ্রশান্তি লক্ষ্য করা যায়। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ কবিকে তাঁর লক্ষ্যে পৌছনোর আগে অবাঞ্ছিতভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করালেও তাঁর আশ্চর্য সুন্দর কবিতার সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়।

নজরুল-সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচার-প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা বিশেষভাবে বিচার্য। নজরুল লিখেছেন,

"তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (Execution of truth) এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চির-মঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"[১]

আর্টের বিষয়ে নজরুলের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। বস্তুত তিনি ছিলেন প্রধানত নিজের প্রতিভা সম্পর্কে অচেতন (unconscious) শিল্পী। নিজের সৃষ্টির ভালমন্দ ও উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট। তাই তাঁর সাহিত্যে স্বর্ণরেণু ও বালুকণার সহাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। একটি অত্যুৎকৃষ্ট পংক্তির পাশে একটি স্থূল পংক্তির আবির্ভাব তাঁর

---

১ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান : যুগবাণী

রচনায় হামেশাই ঘটেছে। আবেগ-প্রধান হৃদয়নির্ভর শিল্পীরা কমবেশী এই দোষে দোষী। সত্য ও সুন্দরের ভাবচিন্তা দেশীবিদেশী অনেকের রচনাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কীটসের মতে—

" 'Beauty is truth, truth beauty',—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."[১]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়ে যা মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে অভিনিবেশযোগ্য।

"যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ, অসীমের স্বাদ।"[২]

এই সত্য কি? এ বিষয়ে তাঁর অভিমত—

"সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চিন্তার ঐক্য লক্ষণীয়। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তেও নজরুল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

"আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।"

নজরুল সৎকবি। তিনি নিজের ধ্যানে যাকে সত্য বলে অনুভব করেছেন তাকে প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধা করেন নি।

সাহিত্যে সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্বের প্রসঙ্গে নজরুলের চিন্তা তাঁর সৃষ্টিপ্রবণ-তার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে। নজরুল লিখেছেন,

"সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এই রূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা। এই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন

---

১ Keats : Ode on a Grecian Urn

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে ২য় সং : কলকাতা ১৯৪৯ : পৃ ৫৫

৩ ঐ : পৃ ৫৭

জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আদরলাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।"[১]

দেশের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যে কোথাও কোথাও এই সর্বজনীনতার আকাঙ্ক্ষিত সুর বেজে উঠেছে। নজরুল-কাব্যের স্থায়ীভাব প্রেম। এই প্রেম কখনও মানবপ্রেমের মূর্তি ধরে পরাধীন সর্বহারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তাদের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, আবার কখনও তা নরনারীর হৃদয়-সম্পর্কের রূপে ব্যক্ত হয়েছে। মানবসমাজের লাঞ্ছনা অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটাবার জন্যে ও তার বৈষম্যজর্জরিত বুকে সাম্যবাদ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নজরুলের যে বিদ্রোহ তাতে যুগধর্ম ও চেতনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। নজরুল অনুভব করেছেন যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আয়ু নিঃশেষিত। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষকমজুরেরাই পাবে প্রাধান্য। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানবসমাজের হাল ধরবে তারাই। তাই নজরুল পৃথিবীব্যাপী শ্রমজীবী সমাজের উদ্বোধন করতে বিশেষ তৎপর। এই শ্রমজীবীরাই সভ্যতার নির্মাতা আর এরাই এবার হবে তার কর্ণধার। নজরুলের কাব্যে নিপীড়িত সর্বহারা ও প্রবঞ্চিত জনসমাজের ব্যথা যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের কাব্যে সর্বহারা মানব-গোষ্ঠীর আর্তি, তার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্য কিয়ৎ পরিমাণে রূপায়িত হলেও নজরুলের রচনায় সে সব যে গভীরতা বাস্তবতা ও একাত্মতা নিয়ে প্রকাশিত তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে মেলে না। বস্তুত নজরুল বাংলা সাহিত্যকে যতখানি জনগণের মনের কাছে এনে দিয়েছেন, ততখানি তাঁর পরে এখনো পর্যন্ত আর কেউ করতে পেরেছেন বলে জানা নেই। তাঁর কাব্যের এই অংশে যে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে চিরন্তনতার রাখীবন্ধন হয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। নরনারীর প্রেমসম্পর্ক চিরন্তন ও সর্বজনীন। এই সম্পর্ককে কাব্যে রূপদান করে শাশ্বতের সুরকে স্পর্শ করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দেশে ও বিদেশে এতো উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন নূতন

১ বাংলা সাহিত্যে মুসলমান ঃ

ভাবে এ সম্পর্ককে কাব্যায়িত করা খুবই শক্ত। বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কবিতার সুবিপুল ঐতিহ্যে নজরুল কোন নূতন সুর যোজনা করতে পারেন নি। শুধু দেহাত্মক প্রেমের উষ্ণতা-সঞ্চারের ক্ষেত্রে কাব্যপ্রসঙ্গের দিক দিয়ে কতকটা অভিনবত্ব দেখালেও প্রযুক্তির দৈন্যে তাঁর খুব স্বল্প সংখ্যক কবিতাই বিশেষ মূল্যে মূল্যবান ও কালোত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। নজরুলকাব্যের সাময়িকতা নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করেন। অনেক ক্ষেত্রে এ অভিযোগ যথার্থ হলেও সব ক্ষেত্রে যে ঠিক নয়, একথা নজরুলের উপর্যুক্ত বিদ্রোহীভাবব্যঞ্জক ও নরনারীর প্রেমমূলক কবিতাগুলির বিষয়ে যা বলা হল তা থেকেই বোঝা যাবে বলে বিশ্বাস।

দেশের স্বাধীনতার জন্যে নজরুলের বিদ্রোহ ও প্রাণশক্তির উদ্দাম তরঙ্গ একদিন দেশকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছিল। সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত তাঁর বহু কবিতা দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। আজ স্বাধীনতার লাভের পর এই সব কবিতার কোন কোনটির আবেদন নিষ্প্রভ হয়ে এলেও তাঁর কাব্যে সমগ্রভাবে যে পরাধীনতার জ্বালা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া আজও দুনিয়ায় ধনীর ও দরিদ্রের বৈষম্য, অত্যাচারীর উৎপীড়ন, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতের হাহাকার প্রভৃতির শেষ হয় নি। যতদিন না স্বাধীন সুস্থ, সুখী ও ধনবৈষম্যহীন বিশ্বসমাজ স্থাপিত হবে ততদিন পর্যন্ত নজরুল-কাব্যের এক অংশ--যেখানে তিনি বিশ্বের বিদ্রোহদীপ্ত বঞ্চিত সর্বহারা ও অত্যাচারিত মানবগোষ্ঠীর সপক্ষে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা এক সক্রিয় উদ্দীপনা, প্রেরণা, সাহস ও বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হ'য়ে থাকবে।

পূর্বেই বলেছি—নজরুল-কাব্যের এই বিদ্রোহাত্মক ভাবই পরবর্তী বাংলা-কাব্যে একটি বিশেষ ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী ধারণা-প্রচারে নজরুলের অবদান অবশ্যস্বীকার্য। একথা ঠিক যে, কমিউনিস্ট হতে গেলে আগে মার্ক্সবাদী হতে হয়। মার্ক্সীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হলে প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। নজরুল মার্ক্সবাদ ভাল ক'রে পাঠ করেন নি। তাঁর সাম্যবাদ অভিজ্ঞতাপ্রসূত হৃদয়লব্ধ জিনিস। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতি কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাহচর্য ও রুশ বিপ্লবের সাফল্যমণ্ডিত ঘটনাবলী তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাকে অনেক পরিমাণে উজ্জ্বল ও শাণিত করে তুলেছিল। বহু শিরোনামায় বিভক্ত 'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল সাম্যবাদের প্রতি যে

বিশ্বাস ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে প্রায় নেই বললেই চলে। সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে নজরুলের সাম্যবাদে ইতিহাসচেতনা, সমাজবোধ ও অভিজ্ঞতার উত্তাপ অনেক বেশী। বিশ্বের কমিউনিস্ট ও মজুরদের আন্তর্জাতিক সংগীতের যে তর্জমা ('অন্তর ন্যাশন্যাল সংগীত') তিনি করেছেন, তার তুল্য তর্জমা এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় খুব অল্পই হয়েছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের সাধারণ ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে রচিত নজরুলের 'যা শত্রু পরে পরে' শীর্ষক কবিতাটিতেও তাঁর গভীর ইতিহাসবোধ এবং শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি রূপায়িত। শেলীর ভাবাবলম্বনে প্রণীত তাঁর 'জাগরূ তূর্য' কবিতাতে শ্রমিকদের বন্দনাটি হৃদয়গ্রাহী। কৃষকমজুরদের বিষয়ে লেখা প্রায় প্রতিটি রচনাতেই নজরুলের দরদ বেদনা ও সহানুভূতি উথলে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চিয়াং কাইশেক ভারতে আগমন করলে গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধে ব্যধিগ্রস্ত কবি যে বন্দনা-গানটি রচনা করেন, তার মধ্যে চিয়াং কাইশেকের প্রশস্তির বদলে চীন ও ভারতের প্রবঞ্চিত অত্যাচারিত ও সর্বহারা মানবসমাজের জয়ধ্বনি ও মর্মবাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

"প্রাচীন চীনের প্রাচীর ও মহাভারতের হিমালয়
(আজ) এই কথা যেন কয়—

... ...

হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,
সুন্দর হবে, শান্তি লভিবে, নিপীড়িতা ধরাতল।
আমরা আনিব অভেদধর্ম নব বেদগাথা শ্লোক ॥
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক!"

পৃথিবী সুন্দর শান্ত ও পীড়নমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নজরুলের এই স্বপ্ন সফল হবে না।

নজরুলের আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তার ভিত্তির উপর রচিত। স্বদেশ তথা স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। নজরুল বুঝে-ছিলেন, যে এদেশের পরাধীনতার প্রধান কারণ হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য। তাঁর বহুসংখ্যক গানে কবিতায় ও প্রবন্ধে হিন্দু ও মুসলমানের সৌহার্দ্য ও প্রীতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। আমার মনে হয়—বর্তমান শতাব্দীতে যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের

মৈত্রীর বাণী সার্থকভাবে প্রচার করেছেন, তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যদের ভিতরে নজরুল অন্যতম। তাঁর সুবিখ্যাত ও সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'-এর মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাত্রের কথা উচ্চারিত হয়েছে।

" "হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, "ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !" "

হিন্দু ও মুসলমান যে একই দেশমাতার সন্তান একথা এই রকম দৃঢ়চিত্ত আবেগ ও দরদের সঙ্গে খুব স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ঘোষণা করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে নজরুলের 'হিন্দু-মুস্‌লিম যুদ্ধ', 'পথের দিশা' প্রভৃতি কবিতা এবং 'মন্দির ও মসজিদ', 'হিন্দু-মুসলমান' ইত্যাদি প্রবন্ধ বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এ দেশের মুসলিম তমুদ্দুন ও হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে বাংলা সংস্কৃতি জন্মলাভ করেছে নজরুল সেই জাতীয় সংস্কৃতির বরেণ্য কবি। মুসলমান ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁর কাব্যের অন্যতম মৌল সুর।

(পূর্বেই বলেছি যে, বিদ্রোহীভাবব্যঞ্জক কাব্য ছাড়াও দেহাত্মক প্রেমমূলক কাব্যে নজরুল যে স্বর ও সুরকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা পরবর্তী আধুনিক কাব্যান্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'র লেখকবৃন্দের সামনে নজরুলের দেহবাদী প্রেমের গান ও কবিতাগুলি রবীন্দ্র-অতীন্দ্রিয়তার বিপরীত কক্ষে এক নূতন পথের সংকেত এনে দিয়েছিল। সঞ্জয় ভাট্টাচার্য স্পষ্টই স্বীকার করেছেন,

"নজরুল যে নৈরাশ্য অনুভব করেছিলেন 'দোলন-চাঁপা'র কালে তার পেছনে ছিল প্রেম-কাতর চিত্ত। এই প্রেম-কাতরতা 'কল্লোল' ও 'প্রগতি'র কবিদের মানসিক গতিপথ প্রচুরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।"[১]

দেহবাদী প্রেমের যে কাতরতা ও অমৃতের আস্বাদনস্পৃহা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম সুর, তার সার্থক ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়দানের জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতা নজরুলের কাছে ঋণী।

নজরুলের প্রেমকাতরতা এবং প্রেমের সৌন্দর্য ও আনন্দের ভোগতৃষ্ণার মূলে রয়েছে একদিকে হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতি বিদেশী কবির প্রভাব, অপরদিকে বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিতার সুবিপুল ঐতিহ্যের অবদান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রেমাস্বাদনের ক্ষেত্রে নজরুল ওমর খৈয়ামের দ্বারা প্রভাবিত হলেও উভয়ের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ আলাদা।

১ সঞ্জয় ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রোত্তর কবিতা (গণবার্তা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬২)

ওমর খৈয়াম যেখানে ইহকালবাদী ও অনিত্যমতাবলম্বী, নজরুল সেখানে জীবনের অমরত্বে বিশ্বাসী ও নিত্যসত্যে আস্থাশীল। নজরুলের প্রেমতৃষ্ণা ঐহিক জীবনের সুরা ও সাকীর উষ্ণ আবেষ্টন অতিক্রম করে মৃত্যুহীন জীবনের মধ্যে বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই পার্থিব জীবনকে স্বীকার করে এর উপভোগের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। এই জাগতিক জীবন-সম্ভোগের বিষয়েই দেহাত্মক প্রেমের ক্ষেত্রে সর্বসংস্কারমুক্ত, বিদ্রোহী ও একনিষ্ঠ সাধক ওমর খৈয়ামের আকর্ষণে নজরুল ধরা না দিয়ে পারেন নি। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না হওয়ার দরুন নজরুলের উপর ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'র আধুনিক কবিবৃন্দের যাঁরা অগ্রগণ্য তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। এর ফলে নজরুলের দেহবাদী প্রেম তাঁদের হাতে ইংরেজী রোমান্টিসিজমের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে এক আশ্চর্য-সুন্দর রূপ ধারণ করেছিল।

কি বিদ্রোহের ব্যাপারে, কি প্রেমের ক্ষেত্রে অনেকে নজরুলের ভাব-চিন্তার অসংলগ্নতার অভিযোগ ক'রে থাকেন। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে নজরুলের কবিমানস বিচার করলে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। নজরুলের বিদ্রোহ প্রধানত সৃষ্টিকর্তা ভগবানের বিরুদ্ধে। কখনো তিনি বিদ্রোহী ভৃগু হ'য়ে ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চেয়েছেন, কখনো তিনি খেয়ালী বিধির বক্ষ ভিন্ন করতে অগ্রসর হয়েছেন, আবার কখনো তিনি শয়তানমিতারূপে ভগবানকে দগ্ধ করবার জন্য বুকে চিতা জেলেছেন। তিনি স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু। মহাবিপ্লবের জন্যে যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর কাছে ঈশ্বর ভুয়ো। সৃষ্টির চাতুরী তাঁর চোখে স্পষ্ট। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রচার করেন—

"ঐ বামন বিধি সে আমারে ধরিতে বাড়িয়েছিল রে হাত
মম অগ্নি-দাহনে জ'লে পুড়ে তাই ঠুঁটো সে জগন্নাথ!
আমি জানি জানি ঐ স্রষ্টার ফাঁকি, সৃষ্টির ঐ চাতুরী,
তাই বিধি ও নিয়মে লাথি মেরে, ঠুকি বিধাতার বুকে হাতুড়ি
আমি জানি জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে যা হয় নি তবে তা'ও।
আমি বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি, নেচে নেচে দিই গোঁফে তাও!"[১]

---

১ ধূমকেতু: অগ্নিবীণা

কোন ক্ষেত্রে নজরুল তাঁর বিদ্রোহকে 'দনুজ-দলনী অশিব-নাশিনী' চণ্ডী-রূপে আহ্বান করেছেন ধ্বংসের বুকে 'সৃষ্টির নবপূর্ণিমা'কে জাগিয়ে তুলতে। কখনও তাঁর দৃষ্টিতে সত্যদেবতা 'অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-সেনা'কে উচ্ছেদ করতে সংগ্রামে নেমেছেন। কখনও বা তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা ও তার উত্তর—

"কে ভগবান ?—

আত্ম-জ্ঞান !"[১]

তিনি স্বাগত জানিয়েছেন আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ বীরকে।

"এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর !

আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী-ঝলক ন্যায়-অসির !"[২]

কোন সময় তাঁর কাছে জীবন সত্য এবং মায়াবাদ ভীরুরই রচনা। কোন কোন স্থলে তাঁর বিদ্রোহ দেশপ্রেমের মূর্তিতে বিদেশী শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে নবযুগ ও রক্তযুগান্তরের গান রচনায় উদ্বুদ্ধ।

"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এলো ঐ
    এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর রে !
বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
    শোন্ অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে ॥
...   .
শোনা তোর বুক-ভরা গান,
জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
    দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে ॥"[৩]

শুধু বিদ্রোহের বিষয়ে নয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে আপাত বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে। কখনও কবি দেহাত্মক কামনায় আকুল।

"তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,

ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায় !"[৪]

১ আত্ম-শক্তি : বিষের বাঁশী
২ ঐ
৩ যুগান্তরের গান : বিষের বাঁশী
৪ অ-নামিকা : সিন্ধু-হিন্দোল

কোথাও এই প্রেম পরশ-পাথরের মত জীবনকে সুন্দরমধুর ক'রে তোলে। তখন কামনামুক্ত জীবন পুরাতন স্মৃতি ও বিরহের দীপ্তিতে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে।

"তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক!
নিশি-শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি' হইনু সুন্দর—
—তাহা তুমি জানিলে না!"[১]

এইভাবে দেখা যায় যে, নজরুল-কাব্যের অনেক জায়গায় বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ হয়েছে। কখনো তিনি বৈষ্ণবভাবাপন্ন কীর্তন রচনা করেছেন, কখনো শাক্তসংগীত-প্রণয়নে তাঁর ভক্তি উৎসারিত হয়েছে, আবার কখনো ইসলামী সংগীত রচনা করে তিনি ইসলাম ধর্মপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের ভক্তি-অর্ঘ্য ঢেলেছেন, কখনো আবার তিনি শয়তান-মিতা হয়ে ভগবানকে উচ্ছেদ করতে তৎপর। কোন জায়গায় তিনি সুন্দরকে বরণ করেছেন, কোথাও বা তাকে তিরস্কার করতে দ্বিধা করেন নি। অনেকের মতে তাঁর এই বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ব কাব্যভাবের অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু ভেবে দেখা দরকার। নজরুল যদিও বলেছেন, 'আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা' ' এবং 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে', তবুও কোন কবি-মানস সৃষ্টির ক্ষেত্র পাগলের মত আচরণ করতে পারে না। কবি-মানসের অবচেতনায় আপাত-বৈপরীত্য ও অসংলগ্নতার অভ্যন্তরে একটি ঐক্যসূত্র থাকতে বাধ্য।

নজরুল কিশোরকালে আউল, বাউল, দরবেশ, সুফী, সহজিয়া, শাক্ত, ফকীর ও সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন। তিনি পল্লীতে পল্লীতে মোল্লাগিরি ও পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজারের খাদেম-গিরি করেছেন। লেটোর দলে থাকাকালে হিন্দুধর্মমতের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি হিন্দুধর্মগ্রন্থ এবং কোরান প্রভৃতি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছেন। তিনি যোগচর্চা ক'রে আসন প্রাণায়ামাদির ভিতর দিয়ে অশান্ত মনকে শান্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুকে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা যাবার পথে স্টীমারে বলেছিলেন, 'I am the greatest Yogi

১ তুমি মোরে ভুলিয়াছ: চক্রবাক

in India." এ থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন [illegible] সঙ্গে নজরুলের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। সাধনা তো শক্র, মিত্র, ভক্ত, সন্তান প্রভৃতি যে কোনও ভাবেই করা যায়। সাধকের দৃষ্টিতে একই ভগবানের রূপ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে।

কবির কাব্যরচনাও একপ্রকার সাধনা বইত অন্য কিছু নয়। নজরুলের কবি-মানস বিভিন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছে। তাঁর অস্থির উদ্দাম বৈচিত্র্যপ্রবণ ও উল্লসিত কবিচিত্ত স্বাভাবিক কারণেই এক ভাবের সাধনায় তৃপ্ত থাকতে পারে নি। বস্তুত এই অতৃপ্তি তাঁর অফুরন্ত সজীবতার লক্ষণ। এই প্রাণোচ্ছলতা কোন রীতিনীতির বন্ধন মানে নি বলেই তার প্রকাশ কোন কোন ক্ষেত্রে অসংযম ও অসংলগ্নতায় আবিল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ত্রুটি স্বীকার করে নিলেও সমগ্রভাবে নজরুল-কাব্যের প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রবলতায় উদ্বুদ্ধ, মুগ্ধ ও চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না।

ছন্দের ক্ষেত্রে নজরুল প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হলেও আরবী প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী ছন্দ তিনি বাংলায় আমদানি করেন। ভাষার দিক দিয়ে আরবী ফারসী দেশী গ্রাম্য কথ্য ইত্যাদি নানা রকমের শব্দসম্ভার ব্যবহার করে নজরুল বাংলা ভাষাকে যে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও পৌরুষদীপ্ত রূপ দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল এ বিষয়ে নজরুলের পূর্বসূরী হলেও তিনি যে তাদের বহুলাংশে অতিক্রম করে গেছেন সে কথা অবশ্যস্বীকার্য। কোমলকান্ত ললিতমধুর বাংলা কবিতার ভাষা যে এত সংগ্রামশীল ও শক্তিশালী হতে পারে, তা নজরুলের কবিতা না পড়লে বোঝা যায় না। 'অগ্নি-বীণা'র প্রতিটি কবিতারই বহ্নিদীপ্ত ভাষার উন্মাদনায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। গদ্যের ক্ষেত্রেও নজরুলের কাব্যধর্মী ভাষা অফুরন্ত পৌরুষে প্রদীপ্ত। দুরন্ত আবেগ ও প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁর ভাষাকে ইস্পাতের মত কঠিন ও শাণিত করে তুলেছে। উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকের চেয়ে 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের কাব্যময় ভাষায় নজরুলের দার্ঢ্য ও পৌরুষের প্রকাশ হয়েছে বেশী। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের অভিমত এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে।

"'ধূমকেতু'র সে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত সাক্ষ্য থাকত বাংলা গদ্য কতটা কাব্য-গুণান্বিত হতে পারে, 'প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী' কি করে 'বিনিক্রান্তাসিধারিণী'

সংহারকর্ত্রী মহাকালী হতে পারে। "প্রসাদময়ী" ললিত ভাষায় কি করে উৎসারিত হতে পারে অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার।"[১]

মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করেছেন,

"সাহিত্য সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়েও আমি বলব, আমাদের বাংলা ভাষা চিরকাল নজরুল ইসলামের নিকটে ঋণী থাকবে। আমাদের ভাষা মিষ্ট। আমাদের ভাষা সুকোমল। শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা আমাদের ভাষায় রচিত হতে পারে, এই ছিল আমাদের ধারণা। আমাদের ভাষার জোর নেই, সংগ্রামশীলতা নেই, এই ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল বলেই আমরা স্লোগান দিতাম হিন্দুস্থানীতে। নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে আমরা বুঝেছি যে বাংলা ভাষাও জোরালো, সংগ্রামশীল ও অসীম শক্তিশালিনী। .... তারপরে বহু কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং সংগ্রামশীল ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু নজরুলই তার পথিকৃৎ একথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।"[২]

বুদ্ধদেব বসু কিন্তু নজরুলের গদ্যে কোন গুণই দেখতে পান নি। তিনি তাঁর গদ্যের বিষয়ে লিখেছেন,

"গদ্যলেখক হ'য়ে তিনি জন্মান নি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পাবে সে তো অনিবার্য।"[৩]

আবেগোচ্ছ্বাসে নজরুলের কাব্যধর্মী গদ্য কতকটা বিশৃঙ্খল হলেও তার পৌরুষ, উত্তাপ ও ওজস্বিতা যে উপেক্ষণীয় নয় এ কথা তাঁর গদ্যের অন্তরঙ্গ পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

নজরুল লোককান্ত কবি। তাঁর কবিতার বোধগম্যতা তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। নজরুল তাঁর সাহিত্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যকৌশলকে করতে হয়েছে সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সাহিত্যের সহজসরল রীতি অনেকক্ষেত্রে উৎকর্ষবিচারের ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতিমাত্রায় দুর্বোধ কবিতা যেমন পাঠকের

১অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ : পৃ ৪৭-৮

২ মুজফ্‌ফর আহমদ : কবি নজরুল ইস্‌লাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা (বিংশশতাব্দী : চৈত্র ১৮৮০ : পৃ ৯২১)

৩ বুদ্ধদেব বসু : নজরুল ইস্‌লাম (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৪১)

গ্রহণীয় হয় না, তেমনি খুব সহজ বোধগম্য কবিতার বিষয়েও সে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতে নারাজ। টি. এস. এলিঅট সত্যিই বলেছেন,

"………people are exasperated by poetry which they do not understand, and contemptuous of poetry which they understand without effort ;…"

নজরুল-কাব্যের সহজতা ও সরলতা তার মূল্যবিচারে অনেকক্ষেত্রেই প্রতিকূলতা করেছে সন্দেহ নাই।

নাজিম হিকমত আর্ট সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন নজরুল-সাহিত্যের বিষয়ে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

"Real art is the art that reflects life. One can find in it all the conflicts, struggles, inspirations, victories, defeats, and love of life, and all the aspects of human personality. Real art is the art that does not give false ideas about life."

নজরুলের কাব্য জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে দীপ্ত, যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনায় ভাস্বর এবং প্রেম-যৌবনের উদ্দাম প্রবলতায় প্রাণবন্ত অস্থির ও গতিশীল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ সাহিত্য-সভায় বিপিনচন্দ্র পাল নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

"এঁর কবিতার সাথে পরিচিত হয়ে দেখ্‌লাম,—এ-তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি থেকে উঠে এসেছে। আগেকার কবি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দোতলা প্রাসাদে থেকে কবিতা লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা থেকে নামেন নি কর্দমময় পিচ্ছিল পথের উপর পা পড়লে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিউরে উঠতেন। নজরুল ইস্‌লাম কোথায় জন্মেছেন জানি না; কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নূতন ভাব জন্মেছে তাঁর সুর তা-ই। তাতে পালিশ বেশী নেই, আছে লাঙলের গান, কৃষকের গান।……মানুষের একাত্মসাধন। এ অতি অল্প লোকেই করেছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম নূতন যুগের কবি।……শরৎবাবু ও নজরুল ইস্‌লাম ছাড়া গত দশবছরের মধ্যে কোন ভাবুক লেখকের উদয় হয় নি।……জাতির প্রাণে লাঙল এসেছে, নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝংকারে তা পাই।"[১]

১ কল্লোল: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

W. H. Auden ও John Garrett তাঁদের সম্পাদিত একটি বিখ্যাত কাব্যসংকলনের ভূমিকায় লিখেছেন,

"The test of a poet is the frequency and diversity of the occasions on which we remember his poetry."[১]

এই বিচারেও নজরুল-কাব্যের একটি বিশেষ মূল্য অনস্বীকার্য, কেননা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বিদ্রোহ বিক্ষোভ প্রেম প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নজরুলের কবিতার বহুপংক্তি লোকমুখে আবর্তিত হতে দেখা যায়।

॥ ৩ ॥

পূর্বেই বলেছি—নজরুল-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সংগীতে। গানের ক্ষেত্রেই নজরুল সবচেয়ে বেশী ক'রে নিজের সৃষ্টিক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যের বেশীর ভাগেই সাময়িকতার মাত্রা অত্যধিক বলে তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা খুবই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমগ্র কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা না গেলেও তার একটি সংকীর্ণ অংশই কালোত্তীর্ণ হবার স্পর্ধা রাখে। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে নজরুলের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হবার বিশেষ সম্ভাবনা। কেননা, তাঁর অনেক গান গ্রামোফোন কোম্পানি, সিনেমা, রেডিও প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের তাগাদায় কতকটা যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন হলেও তাদের অনেকের মধ্যেই চিরন্তন আবেদন উপস্থিত। অবশ্য তাঁর উপেক্ষণীয় নয় এমন বহুসংখ্যক গান রুচিবিকার, ভারসাম্য-হীনতা ও অযত্নশিথিলতার জন্যে স্থূল আবেদনের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধদেব বসু নজরুলের গান সম্পর্কে যা লিখেছেন তা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

"বীর্যব্যঞ্জক গানে—চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশী গান বলে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশী তৃপ্তিকর—গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারে নি—'বুলবুল',

১ Introduction : The Poets' Tongue (Edited by W. H. Auden and John Garrett) Impression of 1956 : London : p. VI

চোখের চাতকে কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে বেশী বলা হয় না। আরো বেশী গান যে অনিন্দ্য হয় নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ। কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চ'লে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোন-একটা অমার্জিত শব্দ-প্রয়োগে সমস্ত জিনিসটিই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল; কিন্তু তার রস আমাদের মনের মধ্যে ঘনীভূত হ'তে হ'তে হঠাৎ কোনো স্থূল স্পর্শ এসে প্রায়ই মনকে বিমুখ করে দেয়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিল—শুধু যদি এই দোষ না থাকত, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হ'ত, তাহলে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। কিন্তু একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হ'ল।"[১]

আমার মনে হয় সবদিক বিচার করলে বীর্যব্যঞ্জক গানে নজরুল দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়েও বড় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। যৌথচেতনা, ইতিহাসবোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্বালা তাঁর গানে যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। কোরাসে নজরুল কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং মার্চের সুরে অদ্বিতীয়। তাঁর 'অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোরকদম্ চল্ রে চল', 'অমর কানন মোদের অমর-কানন', 'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল', 'টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে', 'চল্—চল্—চল্', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার' প্রভৃতি জাতীয় বীর্যব্যঞ্জক সংগীতগুলি এককালে বাংলাদেশকে যেমন করে মাতিয়ে তুলেছিল তার নজির ইতিহাসে মোটেই বেশী নেই। পরাধীন বাংলার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তার বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ও মর্মজ্বালার তীব্রতম প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের গানে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগীতসাধনা প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে। সংঘবদ্ধ অনুভূতির প্রকাশ তাতে খুব বেশী ঘটে নি। গীত ও বাদ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংগীত প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ইদানীং ইওরোপীয় সংগীতের আদর্শে সম্মিলিত বাদনের রূপরচনার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠসংগীত এখনও মুখ্যত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাশ্রয়ী। এক্ষেত্রে কোরাস একটি নূতন যৌথচেতনার রূপ নিয়ে এসেছে। যে সমষ্টিবোধ বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ধর্ম, কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রকাশে নজরুল

[১] বুদ্ধদেব বসু: নজরুল ইস্‌লাম (কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১)

তাঁর পূর্বসূরীদের অতিক্রম করে গেছেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সংগীতের ইতিহাসে একটি শুভ ইঙ্গিত স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

প্রেমসংগীতে নজরুলের কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর গজল এককালে বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয় লুঠ করে নিয়েছিল। অতুলপ্রসাদ সেনের গজল বড় বেশী উর্দু-ঘেঁষা এবং তাতে বাংলাগানের চরিত্রমাহাত্ম্য প্রায় অপ্রকাশিত। নজরুলের গজলে বাংলাগানের রূপটি অবিকৃত থাকাতে তা বাংলার অন্তরের সম্পদ হ'তে পেরেছে। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস নে আজি দোল', 'কে বিদেশী বনউদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে', 'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায়-বেলায়', 'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, পরান পিয়া', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'এত জল ও-কাজল-চোখে পাষাণী, আনলে বল কে', 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', 'আসলো যখন ফুলের ফাগুন', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি', 'চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না' ইত্যাদি গজল অতুলনীয়। বাংলা দেশের প্রেমের গান প্রধানত দেহ থেকে দেহাতীতের পথে ধাবিত। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে মুখ্যত অতীন্দ্রিয় রহস্যবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু নজরুলের গানে যুগধর্মসম্মত দেহবাদ অধিকমাত্রায় প্রতিফলিত। তাঁর গানে দেহস্পর্শ-সুখবঞ্চিত বিরহের নিবিড় অশ্রু যেভাবে মুক্তা হ'য়ে উঠেছে তার তুলনা সত্যই দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে 'মুসাফির মোছ রে আঁখিজল', 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোঁয়ায়', 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি এ সমাধিতে মোর', 'সই লো আমার গঙ্গাজল', 'প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি করি হে', 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম নমো নম নমো নম' প্রভৃতি গান বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

ভক্তিমূলক ইসলামী সংগীতে নজরুল একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসংগীতের চেয়ে এ সংগীতের প্রভাব বিশেষ কম হয় নি। রামপ্রসাদের আদর্শে শ্যামাসংগীতেও নজরুল কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বাউল, কীর্তন প্রভৃতি গানগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। যে উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকবোধ থাকলে বিভিন্ন ধর্মধারায় অনায়াসে অবগাহন করা যায় নজরুল যে কিছু পরিমাণে সেই দুর্লভ আধ্যাত্মিকবোধের অধিকারী ছিলেন, একথা মনে করা অন্যায় হবে না। তাঁর ইসলামী সংগীতে যেমন ইসলাম ধর্মানুরক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি হিন্দুধর্মভক্তি রূপায়িত হয়েছে

কীর্তন, বাউল, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি গানে। এই সর্বধর্মের সমন্বয়চেতনা নবযুগের দান এবং নজরুল এই দানকে তাঁর সংগীতে স্বীকৃতি দিয়ে যুগধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছেন। হিন্দুইসলামধর্মের বিষয়ে তাঁর ঐক্যদৃষ্টি যুগচেতনার আশ্চর্য দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

প্রকৃতিপ্রেমগীতিতেও নজরুল পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশী যুগধর্মের প্রতিভূ। নজরুলের প্রকৃতিপ্রেমানুভূতি অপরের চেয়ে অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ভোগোন্মুখ। মানবিক প্রেমকে তিনি বিচিত্রভাবে প্রকৃতির মধ্যে আস্বাদন করেছেন। তাঁর মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রেম অনেক জায়গায় একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতিপ্রেমের গান হিসেবে 'পিউ পিউ বোলে পাপিয়া', 'চাঁদের পেয়ালাতে আজি', 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'কাজরী গাহিয়া এসো গোপললনা' প্রভৃতি গান বিশেষ উল্লেখের দাবি করে।

হাসির গানে নজরুলের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে নজরুলের যুগচেতনা, দেশপ্রীতি, হিন্দুমুসলমানের ঐক্যবোধ প্রভৃতি অধিকতর তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতায় অভিব্যক্ত। তাঁর 'প্যাক্ট', 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস', 'দে গরুর গা ধুইয়ে' ইত্যাদি গান প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির অভিনবত্বে মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। রঙ্গাত্মক হাসির গানগুলির কোন কোন স্থলে রুচিবিকৃতি চাপল্য ও লঘুতা থাকলেও তাদের হাসির অনাবিলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও বর্ণবৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করে।

ভালভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, বর্তমান কালে সাহিত্য, চিত্রশিল্প, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার কলার তুলনায় সংগীতের ক্ষেত্রে প্রগতি-লক্ষণের প্রকাশ খুবই সীমাবদ্ধ। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে রূপান্তরিত হতে সমর্থ হয় নি বলেই ভারতীয় সংগীত যেন পুরাতনেরই পুনারাবৃত্তি করে চলেছে। এর কারণ সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্যটি যুক্তিগ্রাহ্য।

"..... এখন পর্যন্ত ভারতীয় সংগীত যে-শ্রেণীর মানুষের করধৃত হয়ে রয়েছে তারা আধুনিক কালের মানুষ হলেও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাঁদেরকে কোনক্রমেই আধুনিক যুগের প্রতিভূ মনে করা যায় না। ভাবাদর্শ আর রুচির দিক দিয়ে তারা স্পষ্টতই কাল-বারিত পুরাতন যুগের মানুষ। এদের অনুশীলিত সংগীতের গায়ে প্রগতিলক্ষণ সূচিত হবে এটা আশা করা মূঢ়তা।"[১]

১ নারায়ণ চৌধুরী : ভারতীয় সংগীতে প্রগতিলক্ষণ (অগ্রণী, আশ্বিন ১৩৫৭)

রাজামহারাজা ও জমিদারশ্রেণীর দ্বারা অথবা তাদের প্রেরণা, সাহায্য ও প্রভাবেই ভারতীয় সংগীতের চর্চা হয়ে এসেছে। এর ফলে রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ অভিজাততন্ত্রের প্রভাবগণ্ডির বাইরে এসে সংগীতলক্ষ্মী জনসাধারণের মধ্যে তাঁর গীতদাক্ষিণ্য বর্ষণ করতেন সক্ষম হন নি। জনগণের সঙ্গে প্রায় যোগরহিত হয়ে থাকার দরুন সামন্ততান্ত্রিক ভাবচিন্তায় বন্দী ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যুগধর্মের প্রগতিচিহ্ন প্রকাশ পায় নি। আত্মকেন্দ্রিক ওস্তাদদের দল 'ঘরানা' গড়ে তুলেছেন। যুগের প্রগতিশীল ভাবাদর্শের সঙ্গে হাত মেলাতে এঁরা নারাজ। এঁদের হাতে সংগীতের উন্নতি হয় নি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু এঁদের অশিক্ষিতনৈপুণ্য, অতীতের প্রতি অকারণ মোহ এবং সর্বোপরি যুগধর্মবিমুখতাই ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে প্রগতিচিহ্ন প্রকাশের পথে দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ওস্তাদদের সংগীতনৈপুণ্যের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রক্ষণশীল ও অনমনীয় মনোভাবকে নিন্দা করেছিলেন বলে অনেকের অপ্রীতি-ভাজন হয়েছিলেন।

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, ওস্তাদদের দল ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে গায়কের স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেবার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাঁদের কাছে, সংগীতের মধ্যে রাগের মৌল রূপটি অবিকৃত রাখাই নিয়ম। একথা ঠিক যে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবার জন্যে সংযম-বন্ধন থাকা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার্য যে সেই সংযমবন্ধনের মধ্যে কতকটা স্বাধীনতা না থাকলে শিল্পের সজীবতা শুকিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ওস্তাদদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর কাছে গানকে প্রাণবন্ত করে তোলাই শিল্পীর মুখ্য ধর্ম বলে বিবেচিত হত। তিনি গানকে সজীবতা দান করবার ব্রত নিয়ে ওস্তাদী শাসনতন্ত্রকে উপেক্ষা করে ভাবপরিকল্পনা অনুযায়ী নানা সুরের মিশ্রণ ও ভাঙাগড়া করতে ভয় পান নি।

তিনি শুধু ভারতীয় রাগসংগীতকেই গ্রহণ করেন নি। ইংরেজী, ইতালীয় প্রভৃতি বিদেশী সংগীতের সুর ব্যবহারের ব্যাপারেও তাঁর স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া বাংলার অনাদৃত লোকসংগীত, যেমন—বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গানের ক্ষেত্রে গায়কের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বহুদিনকার 'গায়কী' পদ্ধতির

প্রবর্তন ক'রে বলেন যে, সুরকারের সৃষ্টিকে বিন্দুমাত্র অদলবদল করার স্বাধীনতা কোন গায়কেরই নেই।

রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই নজরুল বাংলা গানের জগতে এক নূতন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। নজরুল গানকে সার্থকভাবে জনজীবনের কাছে পৌছে দিতে পেরেছেন। সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর গানকে উপভোগ করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর গানে গায়কের স্বাধীনতা থাকাতে তা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে এবং নূতন পরীক্ষানিরীক্ষার এক প্রেরণাময় ক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানত তাঁর গানই বহুকথিত আধুনিক গানের সৃষ্টিকে সম্ভবপর করে তুলেছে। অবশ্য এর একটা অন্ধকার দিকও দেখা গেছে। গায়কের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হওয়াতে যে বস্তু জন্মলাভ করেছে তা আর যাই হোক অন্তত গান নয়। কিন্তু যে কোন সৃষ্টির পথে কিছু অপচয়কে স্বীকার না করে উপায় নেই। নজরুলের গান সিনেমার গানের জগতেও পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে। রঙ্গমঞ্চের গানের রূপান্তরে নজরুলের অবদান অস্বীকার করা যায় না। অভিজাততন্ত্রের বন্দীশালা থেকে গানকে মুক্তি দান করে নজরুল তাকে জনসাধারণের অবারিত আঙিনায় পৌছে দিয়েছেন। সংগীতের বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর নাম স্মরণীয়তায় জলজল করবে বহুকাল। নজরুলের গানের প্রেরণা সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন,

"জনগণের ভিতরে সে মানুষ হয়েছে। জনগণের নিকট হতেই সে প্রেরণা লাভ করেছে। লেটোর দলে সে গান গেয়েছে, তাদের জন্যে গান রচনা করেছে। এই গান শুনে আনন্দ পেয়েছে কৃষক ও মজুরেরা। রুটির কারখানায় সে মজুরি করেছে, আবার গার্ড সাহেবের বাড়িতে ভাতও রেঁধেছে।"[১]

শুধু তাই নয়। নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের, বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রের বেদনা ব্যর্থতা উৎকণ্ঠা ইত্যাদিও তাঁর গানের প্রেরণা যুগিয়েছে সন্দেহ নেই। অভিজ্ঞতার আলোকে দীপ্ত বলে তাঁর অধিকাংশ সংগীতই স্বাভাবিকতার গুণে মর্মস্পর্শী।

এছাড়া তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সংগীতকারের উত্তরাধিকার।

বৈচিত্র্য স্বতঃস্ফূর্ততা ও সজীবতা নজরুলের গানের বৈশিষ্ট্য। রাগ-

১ বিংশশতাব্দী, চৈত্র ১৮৮০ শক : পৃ ৯২১

সংগীতের সুর যেমন তাঁর গানে স্থান পেয়েছে, তেমনি বাংলার লোকসংগীতের সুরও উপেক্ষিত হয় নি। তিনি আরব পারস্য প্রভৃতি দেশের সুর বাংলা গানে যুক্ত করেছেন। নানা রাগরাগিণীর মিশ্রণ ও ভাঙাগড়া করতেও তিনি ভয় পান নি। শুদ্ধ রাগের কাঠামোতে অন্য রাগের সুর ঢুকিয়ে গানে নূতন স্বাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি। এই সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর উপর কাজ করলেও নজরুলের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। তিনি নিজে কয়েকটি সুর সৃষ্টি করেছেন। সুগভীর ও অকৃত্রিম যৌথচেতনা ও ইতিহাসবোধ তাঁর কোরাসগুলিকে বিস্ময় মণ্ডিত বিশিষ্টতায় করেছে। তাঁর ব্যঞ্জক মার্চের সুর অনবদ্য। সমষ্টিচেতনার কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই কারণেই বর্তমান সংগীতপ্রগতির তিনি অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর গানের বাণী ও সুর পুরনো সাংগীতিক ধারা থেকে বিচ্যুত না হয়েও যুগধর্মের উজ্জ্বল চেতনায় বিশিষ্ট। তাঁর গান যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে রঞ্জিত, তেমনি তা সমষ্টি চেতনায় স্পন্দিত। এই জন্যেই নজরুলের গান একটি বিশিষ্ট চরিত্রগৌরবের অধিকারী হতে পেরেছে। 'নজরুল-গীতিকা'র উৎসর্গ-পত্রে নজরুল লিখেছেন,

"আমার গানের বুলবুলিয়া,
আমার বনের কুহু-কেকা!
পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে
মোর কাননের কুসুম-লেখা।
তোমাদেরি সুর-সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে।
তোমাদের নজ্‌রানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি।"

জনজীবনের সঙ্গে গানকে যুক্ত করতে পারায় নজরুলের এই আকাঙ্ক্ষা যে অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

লোকবল্লভ হওয়ার মত সহজ ও সরল গুণে ভূষিত হয়েও তাঁর অনেক গানই মহত্বমণ্ডিত হতে পেরেছে এবং এইখানেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

রবীন্দ্র-সংগীতের মত নজরুল-সংগীতও আজ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পদ।

নজরুল নিজেও তাঁর কাব্যের চেয়ে সংগীতের উপর বেশী আস্থা রাখতেন। তাঁর সংগীতের উৎকর্ষ সম্পর্কে তাঁর প্রতিভা প্রথম থেকেই অবহিত ছিল। এ বিষয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁহার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন,

"নজরুল আসলে শুরু হতেই সংগীত-অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল। আমার মতো তার অরসিক বন্ধুরা তা বুঝতে পারত না। আমরা না বুঝে তাকে অনেক সময়ে আঘাত দিতাম। আমার মনে আছে, একদিন শ্রীভূপতি মজুমদার বলেছিলেন,—"নজরুল, কী তুমি এত ভালো গান গাও যে পান পেলেই মেতে ওঠ।" সেদিন নজরুল খুব আহত হয়েছিল। সে বলেছিল, "ভূপতিদা, আমার কবিতার যত খুশি সমালোচনা করুন, কিন্তু আমার গানের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না।" পরে বুঝেছিলাম নিজের ওপরে তার অনেক প্রত্যয় ছিল ব'লেই সে শ্রীমজুমদারকে ওই রকম বলতে পেরেছিল।"[১]

এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সমধর্মিতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথও জানতেন যে তাঁর সাহিত্য যত মহিমান্বিতই হোক না কেন, তাঁর সংগীতের উৎকর্ষ তার চেয়েও বেশী। একদা বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের অধ্যক্ষ হেমেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতা মেঘেন্দ্রলাল রায়কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে আহরণ করা যেতে পারে।

"রবীন্দ্রনাথ নিজে আমায় বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমায় কবি টবি যা ব'লো ব'ল্‌তে পারো, কিন্তু গানেই আমি বড়।"[২]

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদারও বলতেন যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের চেয়ে রবীন্দ্র-সংগীত অনেক বেশী উন্নত এবং তার স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও বেশী। নজরুলের সংগীত সম্পর্কেও এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

১ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ: কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা (বিংশশতাব্দী, ১৮৮০ শক: পৃ ৮৭৬)

২ মেঘেন্দ্রলাল রায়: রবীন্দ্র-সংগীত (বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪: পৃ ৫১৭

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের উত্তরসাধক

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল এই তিনজন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ের সব চেয়ে স্মরণীয় কবি—এ কথা আগেই বলেছি। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবিবৃন্দ হলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে। নজরুল উপন্যাস, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করলেও সাহিত্যের মধ্যে প্রধানত কাব্যের ক্ষেত্রেই তিনি উত্তরসূরীদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রভাব যতটা ভাববস্তুর দিক দিয়ে ততটা আঙ্গিকের দিক দিয়ে নয়। এই সূত্রে বর্তমান গ্রন্থ-লেখকের 'নজরুল কাব্যের ভূমিকা'[১] প্রবন্ধটি পঠনীয়। ভাববস্তুর মধ্যে নজরুলের বিদ্রোহীভাব, সাম্যবাদ, সমাজজিজ্ঞাসা, মানবপ্রেম প্রভৃতি পরবর্তীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নজরুল-চিহ্নিত পথরেখার অস্তিত্ব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবির কাব্যে।

এখনও পর্যন্ত নজরুল-সংগীতের কোন সার্থক উত্তরসাধকের আবির্ভাব হয় নি। বর্তমান আধুনিক গানের উপর নজরুল-সংগীতের একটা সাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের পরীক্ষানিরীক্ষা আধুনিক গানের সৃষ্টিকে নানা ভাবে সাহায্য করছে, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। ইদানীং বাংলা গানের ক্ষেত্রে নজরুলের মত কোন বিশেষ স্মরণীয় প্রতিভার উদয় হয় নি। তবে নজরুলের পরে কয়েকজন জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকারকে আমরা পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে গীতিকার হিসেবে অজয় ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, প্রণব রায় প্রভৃতি এবং সুরকাররূপে হিমাংশুকুমার দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীনকুমার দেববর্মন, সলিল চৌধুরী ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই কমবেশী-নজরুলের কাছে ঋণী।

১ সুশীলকুমার গুপ্ত : নজরুল-কাব্যের ভূমিকা (শারদীয় মধুরাংশ, ১৩৬৬ : পৃ ৩০৫-১২)

॥ ২ ॥

পূর্বেই বলেছি—'কল্লোল' [প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৩০ সাল (১৯২৩)], 'কালি-কলম' [প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৩৩ সাল (১৯২৬)] এবং 'প্রগতি' [প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)]—এই তিনটি মাসিকপত্রকে কেন্দ্র ক'রে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাদের মধ্য থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকাংশ বিশিষ্ট কবির আবির্ভাব ঘটেছে। এই তিনটি পত্রের মধ্যে 'কল্লোল'-এরই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল সর্বাধিক। 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'র অধিকাংশ লেখকই 'কল্লোল'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'কল্লোল' প্রায় সাত বছর চলেছিল।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিক কবি বলতে যে স্বল্পকয়েকজনকে বোঝাত, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' ১৯৩২ সালে আত্মপ্রকাশ করলেও এই গ্রন্থে সংকলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতাগুলি ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে 'কল্লোল', 'বিজলী', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিজীবনের প্রথম দিকে শ্রমজীবী, হতভাগা, অসমর্থ, নির্বাসিত ও নিপীড়িতদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা বোধ করেছিলেন তার মূলে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং বিশেষ করে নজরুলের প্রভাব অনুভূত হয়। অবশ্য নজরুলের চেয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক বেশী সংযতবাক্ ও সূক্ষ্ম। কিন্তু নজরুলের অকৃত্রিম ভাবাবেগের প্রাবল্য ও জনজীবনের সঙ্গে সহবেদনার অনুভূতি প্রেমেন্দ্র-কাব্যের অনেকস্থলেই অনুপস্থিত। তার ফলে তাঁর কাব্যের কোন কোন জায়গাতে সর্বহারা জনসমাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার অভীপ্সা একটা চমক-লাগানো ভঙ্গিমা বা ভাববিলাসিতা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নিপীড়িত শ্রমার্ত ও দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে তাঁর কাব্যকে নামিয়ে আনার মূলে কাজ করেছে অতিসচেতন রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রয়াস। পরবর্তীকালে কবি যতই আত্মস্থ হয়ে মৌলিক ভাববৃত্তে সঞ্চারণ করেছেন ততই তাঁর কাব্যচিন্তা অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে এবং শোষিত জনসমাজের সঙ্গে তাঁর হার্দিক যোগাযোগও ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। এর ফলে 'সম্রাট' (১৯৪০),

'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮) ও 'সাগর থেকে ফেরা'(১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থে উৎকৃষ্ট কাব্যের ফসল ফললেও তাদের মধ্যে সমাজজীবনের অন্বীক্ষা অনেক ক্ষীণ। এসব গ্রন্থে জনজীবনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের যেটুকু আগ্রহ তা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেরণালব্ধ মানবতার সজ্ঞান প্রসারোন্মুখতায় নিঃশেষিত। প্রেমেন্দ্র কাব্যের গতিশীলতা ও প্রাণধর্ম নজরুলকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মননশীলতা ও জীবন-জিজ্ঞাসার গভীরতায় তিনি নজরুল থেকে স্বতন্ত্রতাসমৃদ্ধ।

নজরুলকাব্যের ভাবৈতিহ্যের পথেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘোষণা শোনা যায়—

"আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।"[১]

কিংবা

"মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়!"[২]

কবি বিক্ষুব্ধ চিত্তে জীবন-দেবতাকে যে ভক্তিহীন প্রণাম জানাচ্ছেন তা ভগবানের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহেরই আর এক নূতন রূপ।

"জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা-বারি
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দনবিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত।"[৩]

১ কবি : প্রথমা
২ বেনামী বন্দর : প্রথমা
৩ নমস্কার : প্রথমা

সমাজসচেতন হৃদয়ে নজরুলের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রও নূতন জনজাগরণ ও মানবতার গেয়েছেন তাঁর মিতভাষী স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ বাগ্‌ভঙ্গিতে

" 'দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী !'
—কেঁদে কয় হতভাগ্য নিঃসম্বল মানবের দল,
কেঁদে কয় দিকে দিকে নিযুত জীবন।

হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে,—
যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক্
বেদনার উষ্ণ রক্তধারে ;
রক্ত-পারাবার হতে উদ্বোধন হোক্ আজ নূতন উষার।"[১]

নূতন যন্ত্রযুগের বিশ্বকর্মা মেহনতী জনতার সঙ্গে কবি যোগ দিতে ডেকেছেন জরাজর্জর আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ও ভোগী মানুষদের।

"পাল্কি চড়ে কার পা পঙ্গু হয়ে গেছে,—
আজ ওই নগ্ন সবল পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল।
মাথায় পা দিয়ে দিয়ে কার পা ভারী হ'ল
পাপের ভারে—
ওই পুণ্য পথের ধূলায় নামাও সে ভার।
আজ পাঁওদল, চলে নবজাগ্রত ভয়মুক্ত মানবের দল,
তার সাথে পাঁওদল, চলেছেন মানবের দেবতা।"[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নজরুল তাঁর অকৃত্রিম বোহেমিয়ানিজম, দারিদ্র্যবিলাস, দুঃখলীলা, মৃত্যুবিহার, ওমর খৈয়াম সুলভ ইহবাদী ভোগবাদ এবং সর্বোপরি মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ মমতা ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিলেন। কাব্যরীতির চেয়ে কাব্যভাবনাতেই তাঁর প্রভাব বিশেষ ক'রে অনুভূত হয়েছিল। আরবী ফারসী প্রভৃতি শব্দের আমদানি গ্রাম্য ও কথ্যভাষার ব্যবহার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরবী ফারসী সংস্কৃত প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ তাঁর রবীন্দ্রানুসারী কাব্যরীতিকে একটি বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছিল। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কেউ কেউ তাঁর কাব্য-প্রণালীকে কোন কোন ক্ষেত্রে আশ্রয় করেছেন দেখা যায়।

১ দ্বার খোল : প্রথমা
২ পাঁওদল : প্রথমা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ইহবাদী' কাব্যটির কাব্যরীতি ও বক্তব্য নজরুলের 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে', 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়' প্রভৃতি কবিতাকে স্বতঃই মনে করিয়ে দেয়।

"এই ভুবনের মধুর দিনের পথিক যত,
আস্‌ল যারা
হাস্‌ল যারা
ক্ষণেক ভাল বাসল যারা,
আজকে তারা সন্ধ্যা তোমার
পাকা সোনার
গলার হারে
গগন পারে
যে কথাটি গেল থুয়ে,
কপোল ছুঁয়ে
গেল চলে
যাহা বলে,
হায়রে হায়,
হারিয়ে যায়
সকল কথা আসন্ন ঐ অন্ধকারে!

আজ দরজায়
তাই ত কবি ডাক দিয়ে যায়—
ফাগুন ফুরায়—
আগুন জুড়ায়—
মধু-মাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুটবি কে আয়।
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই—
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায়?"[১]

আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যতম বিশিষ্ট হৃদয়বান কবি জীবনানন্দ দাশের উপরেও নজরুলের প্রাণধর্ম ও বিদ্রোহীসত্তার প্রভাব পড়েছিল। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালকে'র মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও

১ ইহবাদী : প্রথমা

নজরুলের স্বাক্ষর অনেক ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে নিস্তেজ সমাজজীবনে দুরন্ত অনুভূতির যে উদ্দাম ভাববন্যা নেমে এল, সত্যেন্দ্রনাথ তাকে তাঁর সৌখীন মন ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দিয়ে পুরোপুরি ধারণ করতে পারলেন না। তখন দেশ খুঁজতে লাগল অন্য এক প্রাণবন্ত পৌরুষকে। সেই পৌরুষেরই প্রকাশ ঘটল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের মধ্যে। দুর্বার আপোসহীন ও যুক্তিরহিত যৌবনের বিদ্রোহ ও লীলাচাঞ্চল্যের স্রোতকে অস্থির ও উদ্দাম নজরুল তাঁর কাব্যে ধারণ করলেন। সেইজন্যে নজরুলের সহায়তা ব্যতীত বাংলার কোন তরুণ কবিচিত্ত প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলে না। জীবনানন্দের আবেগস্পন্দিত চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই নজরুলের ভাবাবেশের পথে এসে দাঁড়াল। 'ঝরাপালকে'র মধ্যে 'বিবেকানন্দ', 'পতিতা', 'হিন্দুমুসলমান', 'নাবিক', 'দেশবন্ধু', 'সেদিন এ-ধরণীর' প্রভৃতি কবিতায় নজরুলের মোহরাঙ্কন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

"নৃত্য-গীত হাসি-অশ্রু-উৎসবের ফাঁদে
হে দুরন্ত দুর্নিবার—প্রাণ তব কাঁদে!
ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর-বেষ্টন,
সমুদ্রের যৌবন-গর্জন
তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর-শের
টাইফুন ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের
হে জলধি পাখী!"[১]

যে ভাবস্রোত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রবাহমানতা জীবনানন্দীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য, তার পরিচয়ও নজরুল-কাব্যে পাওয়া যায়। তবে নজরুল এই ধরনের কাব্য খুব বেশী রচনা করেন নি। এই প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠবে 'বিষের বাঁশী'র 'মুক্ত-পিঞ্জর' ও 'ঝড়' (পশ্চিম তরঙ্গ) কবিতা দুটির অন্তরঙ্গ পাঠে। জীবনানন্দের কবিতার পংক্তিতে যতিচিহ্নের বিশেষ সংস্থাপন-রীতিও এই কবিতা দুটিতে উপস্থিত। নজরুল লিখেছেন,

"কোথা কার আঁখি হ'তে সরিল পাষাণ যবনিকা,
তারি আঁখি-দীপ্তি-শিখা, রক্ত-রবি-রূপে হেরি ভরিল উদয় ললাটিকা।

১ নাবিক : ঝরাপালক

পড়িল গগন-ঢাকে কাঠি,

জ্যোতির্লোক হ'তে ঝরা করুণা ধারায়—

ডুবে গেল ধরা মা'র।

পাষাণ-পিঞ্জর ভেদি, ছেদি নভ-নীল—

বাহিরিল কোন বার্তা নিয়া পুন মুক্তপক্ষ অগ্নি-জিব্রাইল !

... ...

উড়িবারে চাই যত জ্যোতির্দীপ্ত মুক্ত নভ-পানে,

অবসাদ-ভগ্ন ডানা ততই আমারে যেন মাটি পানে টানে !

মা আমার ! মা আমার ! একি হ'ল হায় !

কে আমারে টানে মাগো উচ্চ হতে ধরার ধূলায় ?"[১]

এবার জীবনানন্দের একটি কাব্যাংশ আহরণ করা যাক।

"আমার এ শিরা-উপশিরা

চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,

শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন—

মোর তরে পিছুডাক মাটি-মা—তোমার ;

ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড়,

আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ—

শ্মশানের খেয়াঘাট আসি,..."[২]

উভয় কবিতাংশের মূলগত ভাব ও ছন্দের একাত্মতা কি অনুভূতিগ্রাহ্য নয় ?

'ঝরা পালকে'র কাব্যরীতিই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এক বিলক্ষণ পরিণতি লাভ করেছে। পুনরায় নজরুলের ও জীবনানন্দের দুটি কাব্যাংশ নেওয়া যেতে পারে।

"ঝড়—ঝড়—ঝড় আমি—আমি ঝড়—

শন্—শন্—শনশন শন্—কড়কড় কড়্

কাঁদে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে।

জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরি-শিরে,

যাত্রা মোর জন্মি আচম্বিতে

প্রাচী'র অলক্ষ্য পথ-পানে।

১ মুক্ত-পিঞ্জর : বিষের বাঁশী
২ সেদিন এ-ধরণীর : ঝরাপালক

মায়াবী দৈত্য-শিশু আমি
ছুটে চলি অনির্দেশ অনর্থ-সন্ধানে।"[১]

এরপর জীবনানন্দের একটি কবিতাংশ পড়া যাক।

"আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত।—
যে-নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মত মনের আবেগে
জেগে আছো,—
জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছো নিশ্চয়।"[২]

প্রথম দিকে কাব্য-নির্মিতির এইরকম কতকটা সাদৃশ্য থাকলেও জীবনানন্দের কবিতা অনেক বেশী মার্জিত ও পরিণত। সময়ের গতির সঙ্গে তাঁর কবি-মানসের বিবর্তন ও সেই সঙ্গে পরিপক্কতা ঘটেছে। কিন্তু নজরুল-প্রতিভা কালের অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষ কোন পরিণতি লাভ করে নি। সাম্প্রতিক কবিদের উপর জীবনানন্দের প্রভাব সর্বাধিক। এই প্রভাব বিশেষ করে কাব্যভাষা রূপকল্প প্রভৃতির সৃষ্টিকৌশলের ক্ষেত্রে। বলতে গেলে একমাত্র তিনিই একটি 'স্কুল' তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকেই জীবনানন্দ তাঁর বহুলাংশে নিজস্ব ভাবকল্পনা ও বাণীভঙ্গিকে খুঁজে পেয়েছেন। এই অগ্রগণ্য কবিকে বিশেষ করে 'ঝরা পালকে'র যুগে নজরুল-কাব্য নিজস্ব পথ বেছে নিতে সহায়তা করেছিল, এ কথা মনে রাখলে নজরুল-কাব্যের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যকে স্বীকার করতেই হবে।

আগেই বলেছি—নজরুল আঙ্গিকের দিক দিয়ে বাংলা কবিতার উত্তর-সূরীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি। যতদূর জানা যায়—তিনি গদ্যকবিতা লিখেছেন মোটে একটি। খাঁটি সনেট তিনি জীবনে একটিও লেখেন নি। যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আধুনিক বাংলা কবিতায় বিভিন্নভাবে এবং সবচেয়ে অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে, নজরুল তার কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য চর্চা করেছেন—এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নজরুলের বহু কবিতাই

১ ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ) : বিষের বাঁশী
২ নির্জন স্বাক্ষর : ধূসর পাণ্ডুলিপি

স্বরবৃত্ত মুক্তক ও মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দে লেখা। আধুনিক বাংলা কবিতায় ইদানীং এই দুই ছন্দের ব্যবহার অক্ষরবৃত্তের তুলনায় বেশ কম। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা লঘু রসের পরিবেশনে স্বরবৃত্ত এবং গীতিধর্মী ভাবপ্রকাশে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উপযোগিতা বেশী। এই দুই ছন্দে নজরুল যে অসামান্য পৌরুষ ও দীপ্তি সঞ্চার করেছিলেন তাতে এই দুই ছন্দ একটি বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথই নজরুলের অগ্রজ। নজরুলের ভাষার বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা পরবর্তীদের উপর বড় বেশী পড়ে নি। পূর্বেই বলেছি—নজরুল উত্তরসাধকদের প্রভাবিত করেছেন মুখ্যত তাঁর আপোসহীন ও সর্ববাধামুক্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। মানবধর্মের রক্ষায় তাঁর সংগ্রামশীল চরিত্রের ভাবরূপই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারার সৃষ্টি করেছে। অতিআধুনিক কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যেই নজরুল-প্রবর্তিত ধারার সার্থক অবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

নজরুল-ঐতিহ্যের সমর্থ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যই সবচেয়ে উল্লেখ্য। বিমলচন্দ্র নজরুলের মতই প্রধানত হৃদয়নির্ভর কবি। নজরুলোত্তর বাংলা কাব্যে বিমলচন্দ্র ও সুকান্তের মধ্যে নজরুলসুলভ স্বভাবকবিত্ব ও চারণকবিসুলভ কাব্যলক্ষণ দেখা যায়। এই কারণেই ভাবপ্রবণ বাংলার সাধারণ জনসমাজে নজরুলের পরে বোধহয় সবচেয়ে পরিচিত কবি বিমলচন্দ্র ও সুকান্ত। অকাল মৃত্যুর জন্যে সুকান্তের কাব্যবৃত্ত বিস্তৃত হতে পারে নি। কিন্তু তা যেটুকু প্রসার লাভ করেছিল সেটুকুই জীবননিবিড়, বিশ্বাসোজ্জ্বল ও সমাজঘনিষ্ঠ। বিমলচন্দ্রের কাব্যপরিধি মোটামুটি বিস্তৃত। নজরুলের পরে বোধহয় এতো কবিতা আর কোন কবি লিখতে সমর্থ হন নি। চেহারায় যেমন নজরুলের সঙ্গে বিমলচন্দ্রের কতকটা মিল আছে, তেমনি উভয়ের লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে রচনার স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে। নজরুলের মত বিমলচন্দ্রও সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্মাতা উপেক্ষিত মেহনতী জনসমাজের আত্মার আত্মীয় হতে চেয়েছেন। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, দুঃখপীড়িত, ক্ষুধিত ও প্রবঞ্চিত জনসাধারণের কবি বলে তিনি নিজেকে প্রচার করতে দ্বিধা করেন নি।

"গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা জন্মেছে এই মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি।

চোখের জলের সাগরে সাঁতার কাটিছে যাহারা অসীম দুখে
আঁকি তাহাদের ছবি।
আমায় তোমরা চেনো বা না-চেনো গ্রাহ্য করি না চেনা ও জানা
স্বার্থের কালো-আকাশে ওড়াও হরষে মেলিয়া দম্ভ-ডানা
তোমাদের দেওয়া কবিযশ নিতে ঘৃণায় আত্মা উঠিছে রুখে
ভাগ্যের খেলা সবি!
ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত যারা ধুঁকিয়া মরিছে মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি॥"[১]

যখন কবি লেখেন,

"আমি তাহাদের বুকের শোণিতে গৌরবটিকা ললাটে পরি
তোমাদের পানে তীব্র ঘৃণায় ক্রূর বীভৎস ব্যঙ্গ করি
বিধাতার বুকে পদাঘাত করি' মরিব শূন্যে ঝঞ্ঝারাতে
চূর্ণ করিয়া বাধা।
আমার কাব্য ভোজবাজি সম মিলাবে রিক্ত কুটিল-রাতে
বেসুরো ছন্দে বাঁধা॥"[২]

তখন স্বভাবতই নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি কবিতার স্পিরিট মনে উদিত হয়।

সমসাময়িক ঘটনা ও বস্তু-বিষয়ক এবং মহাপুরুষদের চরিত্রপূজামূলক কাব্যরচনায় বিমলচন্দ্র নজরুলের সমগোত্রীয়। অনন্তবীর্যরূপিণী স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির প্রতি বিমলচন্দ্রের প্রদীপ্ত প্রেমচেতনাও নজরুলের বিদ্রোহী দেশপ্রেমেরই আর এক রূপ।

"হে ভারত,
আমি তোমার যুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বর,
আমি তোমার যুগযুগান্তরিত রক্ত-সমুদ্রের সৃজনোল্লাস!"[৩]

বিমলচন্দ্রের কাব্যের কোন কোন স্থলে নজরুলের বিদ্রোহীসত্তারই এক যুগোচিত বজ্রনির্ঘোষ শুনি—

---

১ আমি তাহাদের কবি : উদাত্ত ভারত
২ ঐ
৩ অকুণ্ঠ ভারত : উদাত্ত ভারত

"আচম্বিত ঈশানের কালঝঞ্ঝাবেগে আমার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
সুসংগঠিত অভ্যুত্থানের অব্যর্থতায় ;
আমি বিপ্লব
আমি জয়শ্রীমণ্ডিত আগামীকালের শঙ্খনির্ঘোষ !
হে সংসার, আমাকে ভয় কোরো না,
আমি তোমার বন্ধু
আমি তোমার অনিবার্য-সংকটমোচনের বৈজয়ন্তী গান।"[১]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে জনজীবনের কল্লোলধ্বনি শোনা যায়। তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য ধনিক সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা, মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য এবং মেহনতী জনসমাজের শক্তির উপর অবিচল আস্থা। তাঁর কবিপ্রকৃতিতে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা বুদ্ধির প্রাবল্যই বেশী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যশিল্পের তির্যকব্যঙ্গপ্রধান ও গদ্যভঙ্গিময় বাগ্‌রীতি মনকে চমকে দিলেও চমৎকৃত করে না। কবিতার বাণীরূপগঠনে তাঁর অতিসচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে এত উচ্চকিত যে, পাঠকের মন কোন অকৃত্রিম কাব্যানন্দে উল্লসিত হতে পারে না। যেখানে তিনি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-নৈরাশ্যকে নিয়ে নির্বাধ ও স্বচ্ছন্দভাবে কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন, সেখানে তিনি নজরুল-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত নন।

'পদাতিক' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের 'সকলের গান-'এ নজরুলের যৌথজীবন-চেতনা ও পলায়নী মনোবৃত্তির প্রতি ধিক্কারের রেশ কি পাওয়া যায় না ?

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
... ...
আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলিতে চাই না এরোপ্লেনে ;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি,
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে ॥"[২]

নতুন সভ্যতার জন্মদাতা কৃষকমজুরদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে অন্তরঙ্গতা বোধ করেন তাতেও নজরুল-ঐতিহ্য উপস্থিত।

---

১ বিপ্লব : উদাত্ত ভারত
২ সকলের গান : পদাতিক

"কৃষক, মজুর! তোমরা স্মরণ—
জানি, আজ নেই অন্যগতি;
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।"[১]

'চিরকুট' (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', 'ঘোষণা' প্রভৃতি কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহীসত্তার বজ্রকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন—

"এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।"[২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথমদিককার কবিতাবলীতে যে সাম্যবাদী ভাবনা একটা রোমান্টিক কাব্যাদর্শরূপে বর্তমান ছিল তাই পরবর্তী কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের ('অগ্নিকোণ' ও 'ফুল ফুটুক) মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ তাঁর মার্ক্সীয় দর্শনে বিশেষ দীক্ষা এবং দেশের জনসমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগজনিত অভিজ্ঞতা। মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্যবাদী কাব্যচিন্তা নজরুলের হৃদয়লব্ধ সাম্যবাদী ধারণার চেয়ে যথার্থ। কিন্তু নজরুলের প্রাণবন্ত প্রবলতা ও দুর্বার গতিশীলতা, যা তাঁকে জাতির মুক্তিসংগ্রামে চারণ-কবির সার্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছিল, তা বুদ্ধির কাঠিন্যে ও আঙ্গিকের সচেতন শাসনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

নজরুলের মত দিনেশ দাসের কবিতাও সরবে পঠনীয়। উভয়ের কবিতাতেই বর্ণগৌরবের চাইতে ধ্বনিসমারোহের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের তুলনায় তিনি সংযতবাক্। কিন্তু নজরুলের বহু ভাষণের মূলে যে প্রাণপ্রাবল্য ছিল, পরবর্তী কোন কবির মধ্যেই তা লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত নয়, দিনেশ দাসের মধ্যেও নয়। এই প্রাণপ্রাবল্যের জোরেই নজরুল দেশের হৃদয়কে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনায় ভরে দিয়েছিলেন। দিনেশ দাসের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ঋজুসরল প্রকাশভঙ্গির স্বাভাবিকতা

১ কানামাছির গান : পদাতিক
২ ঘোষণা : চিরকুট

নজরুলকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও দিনেশ দাস নজরুলের চাইতে আবেগকে কিছু পরিমাণে কঠিনতর শাসনে বাঁধতে সমর্থ হয়েছেন, তবুও তাঁর 'কাস্তে', 'যুদ্ধ', 'নতুন মানুষের গান', '১৯৪২', 'ভুখমিছিল', 'স্বর্ণভস্ম' প্রভৃতি কবিতা নজরুল-ঐতিহ্য থেকে আলাদা বলে বোধ হয় না। নজরুলের মত তাঁর কবিতায় গভীরতার চেয়ে সাময়িকতার লীলাচাঞ্চল্যই বেশী। দিনেশ দাসের এই নতুন মানুষের বন্দনা-গানে কি নজরুলের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না?

"নতুন মানুষ তোমরা কারা?
তোমরা এলে ছন্নছাড়া।
পাথর-পাতা সড়ক ধরে
কখন এলে লালচে ভোরে
রক্তপথের সঙ্গী হবার দাও ইশারা
তোমরা কারা?"[১]

নজরুল চাঁদকে চাষার কাস্তের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন।

"আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ!
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দেখে মনে রেখো।"[২]

দিনেশ দাসও তাঁর বহুপঠিত 'কাস্তে' কবিতায় লিখেছেন, 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে।'

উভয় কবির চিত্রকল্পের সমধর্মিতা লক্ষণীয়।

দিনেশ দাসের কাছে সভ্যতার যেরূপ ধরা পড়েছে তার সঙ্গে যে নজরুলের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

"এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা
মহাপ্রভু! সবই তোমার তৈরী তা।

১ নতুন মানুষের গান : দিনেশ দাসের কবিতা
২ ঈদের চাঁদ : নতুন চাঁদ

দেখছি বসে দূরবানে

তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।"[১]

নজরুল-ঐতিহ্যের অন্যতম এবং বোধহয় সবচেয়ে সার্থক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। নজরুলের উত্তরসূরীদের মধ্যে সাম্যবাদী কাব্যরচনায় এই কিশোর কবিকেই সবচেয়ে আন্তরিকতায় অভিষিক্ত বলে মনে হয়। তাঁর কবিতায় কোন নিষ্প্রাণ কারুকলা নেই, প্রক্রিয়াপ্রকরণের জটিলতা নেই, বিকলাঙ্গ মননবিলাস নেই। তাঁর কবিতা সুস্থ সজীবতায় প্রদীপ্ত, অভিজ্ঞতায় আন্তরিক ও ঋজুসারল্যে অব্যর্থ।

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"[২]

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরেও অতিআধুনিক কবিবৃন্দের অনেকের কাব্যেই নজরুল-ঐতিহ্যের স্রোত বয়ে চলেছে।

১ ডাস্টবিন : দিনেশ দাসের কবিতা
২ হে মহাজীবন : ছাড়পত্র

পরিশিষ্ট—ক

নজরুল গ্রন্থপঞ্জী

সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

কবিতা

(১) অগ্নি-বীণা ॥ প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩২৯ সাল (১৯২২)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩০ সাল (১৯২৩)।

(২) দোলন-চাঁপা ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)।

(৩) বিষের বাঁশী ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল (১৯৪৫)।

(৪) ভাঙার গান ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(৫) ছায়ানট ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩১ সাল (১৯২৪)।

(৬) পূবের হাওয়া ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৭) সাম্যবাদী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৮) চিত্তনামা ॥ প্রথম প্রকাশ—সম্ভবত শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৯) সর্বহারা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।

(১০) ফণি-মনসা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১১) সিন্ধু-হিন্দোল ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১২) জিঞ্জির ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।

(১৩) সঞ্চিতা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)। 'অগ্নিবীণা', 'ঝিঙে ফুল', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'ছায়ানট', 'দোলন চাঁপা', 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে কবিতা বাছাই করে বর্মন পাবলিশিং হাউস প্রথমে

'সঞ্চিতা'র একটি সংস্করণ বের করেন (২রা অক্টোবর, ১৯২৮)। ঐ বৎসরের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক 'সঞ্চিতার' যে অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি ছাড়াও 'জিঞ্জির' ও 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা স্থান পায়। এই সংস্করণটিই এখন বাজারে চলেছে এবং এতে অন্য কয়েকটি গ্রন্থের কবিতা সংযুক্ত হয়েছে।

(১৪) চক্রবাক ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(১৫) সন্ধ্যা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(১৬) প্রলয়-শিখা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।

(১৭) নতুন চাঁদ ॥ প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৫১ (১৯৪৫)।

(১৮) সঞ্চয়ন ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬২ সাল (১৯৫৫)।

(১৯) মরু-ভাস্কর ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬৪ সাল (১৯৫৭)।

(২০) শেষ সওগাত ॥ প্রথম প্রকাশ—২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫ সাল (১৯৫৮)।

কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ

(১) রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ॥ প্রথম প্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।

(২) কাব্য আমপারা ॥ প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।

(৩) রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের কবিতা

(১) ঝিঙে ফুল ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) সাতভাই চম্পা ॥

উপন্যাস

(১) বাঁধন-হারা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(২) মৃত্যু-ক্ষুধা ॥ প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল (১৯৩০)।

(৩) কুহেলিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল (জুলাই, ১৯৩১)।

গল্প

(১) ব্যথার দান ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩২৯ সাল (১৯২২)।

(২) রিক্তের বেদন ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

(৩) শিউলি-মালা ॥ প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

নাটক

(১) ঝিলিমিলি ॥ প্রথম প্রকাশ – নবেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) আলেয়া ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।

(৩) মধুমালা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের নাটক

(১) পুতুলের বিয়ে ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল লেখা নেই।

প্রবন্ধ

(১) যুগবাণী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।

(২) রাজবন্দীর জবানবন্দী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।

(৩) রুদ্রমঙ্গল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই।

(৪) দুর্দিনের যাত্রী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।

সম্পাদিত পত্রিকা

(১) নবযুগ ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।

(২) ধূমকেতু ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অগস্ট।

পরিচালিত পত্রিকা

(১) লাঙল ॥ প্রথম প্রকাশ—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সাপ্তাহিক 'লাঙলে'র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর তার নাম পরিবর্তন ক'রে 'গণবাণী' রাখা হয়। 'গণবাণী'র প্রথমসংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট তারিখে।

সংগীত-গ্রন্থাবলী

(১) বুলবুল (প্রথম খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।

(২) চোখের চাতক ॥ প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(৩) চন্দ্রবিন্দু ॥ প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫২ সাল (১৯৪৬)।

(৪) নজরুল-গীতিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।

(৫) নজরুল-স্বরলিপি ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।

(৬) সুরসাকী ॥ প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।

(৭) জুলফিকার ॥ প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।

(৮) বন-গীতি ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।

(৯) গুলবাগিচা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।

(১০) গীতি-শতদল ॥ প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৪১ সাল (১৯৩৪)।

(১১) সুরলিপি ॥ প্রথম প্রকাশ—অগস্ট, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২) সুর-মুকুর ॥ প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১৩) গানের মালা ॥ প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১৪) বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সাল (১৯৫২)।

পরিশিষ্ট—খ

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

['নজরুল-চরিতমানস'-এর মুদ্রণকার্য দ্রুত সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় যে কয়টি ভুল চোখে পড়েছে সেগুলির একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু ছাপার ভুল থেকে যাওয়া সম্ভবপর।]

পৃষ্ঠাসংখ্যা	পংক্তিসংখ্যা	বর্তমান পাঠ	সংশোধিত পাঠ
২০	১৫	মাজারুল হক	মজ্‌হারুল হক্
২৩	২৪	আবদুল্লা রসুল	আব্দুর রসুল
২৮	২৩	যামিনীকুমার ভট্টাচার্য	কামিনীকুমার ভট্টাচার্য
৩৯	১৬	নরোত্তম সিংহের	নরোত্তমের
৮১	২২	২৪শে অগস্ট	২৬শে অগস্ট
	১২	১ই ডিসেম্বর	১৪ই ডিসেম্বর
১০৬	২১	ামাজিক	সামাজিক
১১১	১	'Childe Harold'	'Childe Harold's Pilgrimage'
১৬০	১২	১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ	১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ
২০০	১৬	৯৩০ সালে	১৯৩০ সালে